প্রেমের গল্প

প্রেমের গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা — ৯

প্রকাশক: শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

মুদ্রক : শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র শীল
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
১এ ঠাকুর ক্যাসল স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

বেঁধেছেন: জি. রায় এন্ড কোং
২২ বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট অংকন: পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক প্রস্তুতকারক ও মুদ্রণ: ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৬

মূল্য : চার টাকা

এক রাত্রি	- - - -	১
মগের মুল্লুক	- - - -	১২
ধরা বিয়ে	- - - -	৩৮
খিল	- - - -	৫৭
দোলনা	- - - -	৭১
যশোমতী	- - - -	৯১
ঘৃণা	- - - -	১০৩
সরবাণু ও রোস্তম	- - - -	১১৯
জমি	- - - -	১২৯
নুরবানু	- - - -	১৪১
দাঙ্গা	- - - -	১৫২
তিরশ্চী	- - - -	১৫৯
হুইসল্	- - - -	১৭৫
প্রাসাদশিখর	- - - -	১৯১

এক রাত্রি

রাত এখন ক'টা? গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে একটা মোটর চলে গেল পশ্চিমে। যত রাতেই হোক, দাঁড়াও এসে জানালার সামনে, দেখতে পাবে একটা মোটর সাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোথায় যায়, কোথায় থামে কে জানে।

ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। শীতের শেষে বসন্তের বৃষ্টি। শীতকে মনে করিয়ে দেওয়ার বৃষ্টি। আকাশের করুণা। সবাই ঘুমুবে শান্ত হয়ে। বৃষ্টির শব্দে পায়ের শব্দটি শোনা যাবে না।

যদি আসে নিশ্চয়ই খালি পায়ে আসবে। অনেক রাতে হঠাৎ-ওঠা চাঁদের হাসিটির মত আসবে। কিংবা গহন অরণ্যে ভয়-পাওয়া কৃষ্ণসার হরিণীর মত।

কিন্তু আসবে কি? কেউ আসে?

আজ যদি না আসে তবে আর আসবে কবে? এমন শুভরাত্রি বিধাতা ফরমায়েস দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। জামাইবাবুর মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দিদি আর জামাইবাবু চলে গিয়েছেন কলকাতা। পরাশরবাবু হাসপাতালে। তার স্ত্রী কাছাকাছি কাকার বাড়িতে। উপরে শুধু ও আর ওর মা। মাকে একটু ফাঁকি দিতে পারবে না তো মেয়ে হয়েছে কেন?

প্রথম দিনের ঝগড়ার কথাটাই মনে পড়ছে ভবদেবের।

একটা গাছ এসে পড়েছিল ভবদেবের এলেকায়। গোলাপ গাছ। আর ধরবি তো ধর সেই গাছেই ফুল ধরল।

সেই ফুলই নৃশংস হাতে ছিঁড়ে নিয়েছিল ক্ষণিকা। ভেবেছিল কেউ দেখতে পাবে না বুঝি। তাড়াতাড়িতে ছিঁড়তে গিয়ে নরম ডালটাকে জখম করে ছেড়েছে।

'ও কি, ও ফুল ছিঁড়লেন যে?' চকিতে সামনে এসে হুমকে উঠেছিল ভবদেব।

'এ গাছ আপনাদের ভাড়া দেওয়া হয়নি।' রূঢ় উপেক্ষায় পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল ক্ষণিকা।

'সে কি কথা! ঘরের সামনের এ ফালিজমিটুকু যদি আমাদের, জমির

উপরকার এ ফুল গাছও আমাদের। একেবারে আমার ঘর ঘেঁষে এই গাছ—হাত বাড়ালেই ধরা যায় রীতিমত।'

কি অপূর্ব যুক্তি। মনে-মনে হেসেছিল নিশ্চয়ই ক্ষণিকা। যেহেতু হাত বাড়ালেই ধরা যায় সেহেতু আমার অধিকার! বাঁকা ভুরু সঙ্কুচিত করে বলেছিল ক্ষণিকা, 'কিন্তু এগাছ আপনারা পোঁতেননি, আমরা পুঁতেছি—'

'আপনারা তো আরো অনেক পুঁতেছেন। বাগান সাজিয়ে বিলিতি তারের বেড়া দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ফুল হয়েছে একটাতেও? গাছ পোঁতা আর তাতে ফুল ফোটানো এক কথা নয়। পুকুর অনেকেই কাটে কিন্তু পুণ্য না থাকলে তাতে জল হয় না।'

কি অপূর্ব উপমা! উপেক্ষার ভঙ্গিতে আবার পিঠ ঘুরিয়েছিল ক্ষণিকা। দীর্ঘবৃন্ত ফুলটা খোঁপায় গুঁজতে-গুঁজতে বলেছিল, 'ফুল যদি ফুটে থাকে তবে ভাড়াটেদের পুণ্যে ফোটেনি, যাদের বাড়ি তাদের পুণ্যেই ফুটেছে।'

'কিন্তু ছিঁড়ে নেবার সময় তো পুণ্যবানের ভঙ্গি বিশেষ ছিল না হাতে-চোখে। যেন কেউ দেখতে না পায় এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে চোরের মত পালিয়ে যাওয়ার মতলব।'

'নিজের পাঁঠা যে ভাবে খুশি সে ভাবে কাটব তাতে অন্য লোকের কি।'

'কী হয়েছে রে ক্ষণু?' আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল সুনয়নী।

এক মুহূর্ত দেরি হয়নি বুঝে নিতে। কতদিন বহু যত্নে দুই চোখের ভালোবাসা দিয়ে যে ফুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ভবদেব, তা আর নেই। মোচড় খেয়ে ডালটাও হেলে পড়েছে। কতবার বলেছে সুনয়নী. ফুলটিকে তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দে। উত্তরে বলেছে, তেমন কেউ যদি থাকত দেবার মত তার জন্যে তুলে আনতুম। তেমন যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তখন গাছের ফুল গাছেই থাক।

'আমিই ফুলটা ছিঁড়েছি দিদি।' পিঠ ঘুরিয়ে খোঁপাটা দেখিয়েছিল ক্ষণিকা। ঘষা-ঘষা ওড়া-ওড়া চুলের শুকনো খোঁপার মধ্যে টাটকা একটা রক্ত গোলাপ।

'বা, চমৎকার।' গাল ভরে হেসে উঠেছিল সুনয়নী। বলেছিল, 'কেশবতী রাজকন্যের মাথায় উঠেছে. ফুলের আর কি চাই।'

সুন্দর করে হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বিজয়িনীর ভঙ্গিতে মাথা উদ্ধত করে চলে গিয়েছিল সমুখ থেকে।

কোথায় যাবে! অহঙ্কারে মাথা চাড়া দিয়ে চলতে গেলে আলতো খোঁপায় থাকবে কেন গোলাপ! খসে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

যাক পড়ে। নেব না কুড়িয়ে। পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখব না।

সোজা চলে গিয়েছিল গরবিনী—সকালের রোদ্দুরে সারা গায়ে যৌবনের ঝলক দিয়ে।

ছিন্নবৃন্ত বিধ্বস্ত গোলাপটার দিকে তাকিয়ে ছিল ভবদেব। বিহ্বল বৃন্তাশ্রয় ছেড়ে মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকলেও কম সুন্দর নয় গোলাপ।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। এখনো ঘুমুতে যায়নি ভবদেব। চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। পরিপাটি করে বিছানা পাতা। একটিও ভাঁজ নেই, রেখা নেই। উচ্ছ্বসিত কোমলতায় প্রসারিত হয়ে আছে। সমস্ত ঘর অন্ধকার। খানিক আগে একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছিল ভবদেব। পরে কি ভেবে নিবিয়ে দিয়েছে ফুঁ দিয়ে।

অন্ধকারেই আসুক পথ চিনে। আকাঙ্ক্ষার তাপ লেগে-লেগে অন্ধকারই তার মূর্তিতে দীপায়িত হোক।

কিন্তু সত্যি কি আসবে? বলে গেলেও আসা কি সম্ভব? আসা কি মুখের কথা?

এখনো বৃষ্টি চলেছে ঝিরঝির। এলোমেলো হাওয়া উঠেছে। দুদিকের দু দরজাই ভেজানো ছিল এতক্ষণ। হাওয়ায় শব্দ হতে পারে ভেবে ছিটকিনি লাগাল ভবদেব। কথা আছে, ঠেলে যদি বোঝে দরজা বন্ধ, আঙুলের টোকা মারবে। তার দরকার হবে না। এ অঞ্চলে চলে এলেই অনায়াসে বুঝতে পারবে ভবদেব। হাওয়ায় পাবে তার গায়ের গন্ধ, শুনবে তার শাড়ির খসখস।

হয়তো ঘুমিসে পড়েছে আলগোছে। মা আর মেয়ে এক ঘরে শোয়, হয়তো মা-ই এখনো আচ্ছন্ন হয়নি। অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ক্ষণিকা। প্রতীক্ষা করছে। এদিকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মোমবাতি।

নিয়তির পরিহাসের কথা কে না শুনেছে। হাতের পেয়ালা মুখে তোলবার আগে হাত থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে আরেকটা সিগারেট ধরাল ভবদেব।

ফুলটাকে মাটিতে অমনি ফেলে যাবার পর, মনে আছে সুনয়নী তেলে-বেগুনে

জ্বলে উঠেছিল ঃ দে ঐ গাছের নির্বংশ করে একেবারে শেকড় উপড়ে। কদিনের চেষ্টায় কত কষ্ট করে ফুল ফোটানো হল। এখন বলে কিনা বাড়ির মালিক বাড়িউলি। এর পর হাটে-মাঠে-ঘাটে যেখানেই থাকি না কেন, মাথার উপরে বাড়িওলা নিয়ে যেন না বাস করতে হয়।

কি সব দিনই গিয়েছে! নিচের তলার ভাড়াটে, বাড়িওলার ভাব, সব রকমেই যেন নিচের তলায়। কুয়োর থেকে পাম্প করে জল দিত, তা ভাড়াটেরা সব শেষে। পাঁচ মিনিট হতে না হতেই সুইচ-অফ। কী ব্যাপার? ঝামা-মারা টান জায়গা মশাই, কুয়ো শুকিয়ে এসেছে। এমনি নিত্যি। ভর-গ্রীষ্মের দিনে কলসী-কুঁজোও ভরাট হয়নি; বর্ষায় যখন সচ্ছল জল তখনও বড়জোর দশ মিনিট। সট করে সুইচ অফ করে দিয়ে বলেছে, মফস্বলে ইলেকট্রিক কারেন্টের দাম কত।

প্রথম সরকারী ঝগড়া হয়েছিল চাকর রামলখনকে নিয়ে। নিচে আলাদা-মতন একটা ফালতু ঘর ছিল, ভাড়া দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, ওটা চাকরের ঘর, ভাড়াটেদের এজমালি। কিন্তু থাকবার বেলায় বাড়িওলার ড্রাইভার আর দারোয়ান। চলবে না কথার ঘোর-ফের, চাকরের জায়গা দিতে হবে। মুখে হার মেনেছিল পরাশর, কিন্তু টিপে দিয়েছিল দারোয়ানকে! তার দাপটে সাধ্য কি রামলখন শোয় সেই ঘরের মধ্যে। তার জায়গা বারান্দায়।

সত্যি রামলখন আজ বারান্দায় শোয়নি তো? ভবদেব বলে দিয়েছে বাইরের ঘরে শুতে। কিন্তু বলা যায় না, যেমন বুদ্ধি হয়তো প্রভুর নিরাপত্তার কথা ভেবে একেবারে বাইরের দরজা ঘেঁষে শুয়েছে। কে জানে সেইটেই হয়তো মস্ত বাধা হবে ক্ষণিকার।

খুট করে ছিটকিনি খুলে দরজা ফাঁক করে তাকাল একবার বাইরে। না, বারান্দা ফাঁকা। আশপাশ নিঝুম। দূরে ষ্টেশনের লাল-শাদা-সবুজ আলোর পিণ্ডগুলি জ্বলছে স্থির হয়ে। আপ দুন আর ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস চলে গিয়েছে এতক্ষণে। আরো কত ট্রেন আসবে যাবে। যে ট্রেনের অবধারিত ষ্টেশন এই ঘর সেই আর এসে পৌঁছুল না!

যা অবধারিত তার জন্যে কেন এই অধীরতা?

চোখের উপরে একটা তারা জ্বলছে দেখতে পেল। যা অবধারিত তাতে সুখ নেই যা অভাবনীয় তাতেই সুখ। মেঘলা আকাশ দেখবে ভেবেছিল দেখল একটা তারা! অত্যাশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠল মন।

এমনি একটা অত্যাশ্চর্যের জন্য প্রতীক্ষা করছে ভবদেব। অবধারিতের জন্যে নয়।

চরম ঝগড়া হয়েছিল সেদিন।

উপর থেকে ভিজে কাপড় ঝোলায় এই নিয়ে ভবদেবরা আপত্তি করেছে বহুদিন—বারান্দায় উঠতে-নামতে ঠিক নাকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়, মাথার উপরে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ে। শোনেনি বাড়িওলারা। বলেছে, ও ছাড়া জায়গা নেই কাপড় মেলবার। মুখের প্রতিবাদে কাজ হয়নি, তাই গেরো মেরে ভিজে কাপড়ের কুণ্ডলী পাকিয়েছে নিচে থেকে। ঢিল বা অন্য কিছু ধুলো-বালি বেঁধে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন অন্যরকম হয়েছিল। শুকিয়ে এসেছে একটা শাড়ি, খসে পড়েছিল নিচে, নিচের বারান্দায় সিঁড়ির উপর। বিকেলের ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল রামলখন, চোখে পড়তেই কুড়িয়ে নিয়েছিল ব্যস্ত হাতে। ভবদেব সেইমাত্র ফিরেছে আপিস থেকে, চোখোচোখি হতেই বলেছিল, 'রেখে দে।'

গুটিয়ে-পাকিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল রামলখন।

আর তক্ষুনিই তরতরিয়ে নিচে নেমে এসেছিল ক্ষণিকা।

সুনয়নীকে জিগগেস করেছিল, 'আমাদের একটা শাড়ি পড়েছে দিদি?'

'কই না তো!' সুনয়নী ভিতরের বারান্দায় চা করছিল, অবাক মানল। 'কি রকম শাড়ি? কার শাড়ি?'

'বৌদির শাড়ি। তেমন দামি কিছু নয়। কিন্তু নিচে পড়লেই যদি তা আর ফেরৎ না পাওয়া যায়—'

'বা, সে কি কথা? রামলখন তো এইমাত্র ঝাঁট দিচ্ছিল বাইরে। হ্যাঁ রে, রামলখন, বাইরে শাড়ি দেখেছিস একটা?'

মাটি-লেপা উনুনের মত মুখ করে রামলখন বললে, 'আমরা দেখতে যাব কেন?'

'বেশিক্ষণ হয়নি। আমিই তুলছিলুম, গেরো খুলতে পড়ে গিয়েছে—'

'হাওয়ায়ও তো উড়ে যেতে পারে—' ভিতর থেকে টিপ্পনি কেটেছিল ভবদেব।

উড়নতুবড়ির মত ঝলসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'মাপ করবেন দিদি, আমি সার্চ করব।'

'সার্চ করবে!' প্রথমটা থমকে গিয়েছিল সুনয়নী। পরে মুখে হাসি টেনে বলেছিল, 'এই দেখনা আমাকে।' বলে আঁচল ঝাড়া দিয়েছিল।

'বডি-সার্চ নয়, বাড়ি-সার্চ।'

'আপনি মেয়ে-পুলিশ নাকি?' ভবদেব এবার এসেছিল মারমুখো হয়েঃ 'সঙ্গে ওয়ারেণ্ট আছে?'

'ও সব চোর ধবতে ওয়ারেণ্ট লাগে না। কলকাতার বাসে-ট্রামে পকেট মারা গেলে প্যাসেঞ্জারদের পকেট সার্চ করার রীতি আছে।'

'এ একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ক্ষণু?' আপত্তি করেছিল সুনয়নী।

'হয়তো হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই।'

'উপায় নেই?' আবার ঝাঁজিয়ে উঠেছিল ভবদেব: 'আপনি কাউকে দেখেছেন চুরি করতে?'

'চোখে দেখিনি, কিন্তু কানে শুনেছি। শুনেছি, শাড়িটা নিচে পড়ামাত্রই একজন বলছেন আরেক জনকে, রেখে দে। পরের জিনিস জেনে তা ছলনা করে রেখে দেওয়াটাও অসাধুতা।'

'এতই যখন জানেন তখন সোজাসুজি এসে ভালোমানুষের মতন চাইলেই হত!'

'ভিক্ষে করে নেওয়ার চাইতে দাবি করে নেওয়ার মধ্যে গৌরব আছে।' যৌবনের অহঙ্কারে সারা গায়ে ঝঙ্কার তুলেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'দিয়ে দিন।'

রামলখনকে ভবদেব বলেছিল দিয়ে দিতে।

শাড়িটা পেয়ে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। মনে হয়েছিল যেন তার গায়ের অঞ্চল থেকে শূন্যে একঝাঁক বক উড়িয়ে দিল।

অবাক যত না হয়েছিল তার চেয়ে বেশি রেগে উঠেছিল সুনয়নী। 'তুই দিতে গেলি কেন? সার্চ করা বার করে দিতাম।'

'তুমিই তো নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ! নইলে ও কোন সুবাদে তোমাকে দিদি বলে? মাসি না, পিসি না, বৌদি না—'

'মনে হচ্ছে তোর সুবাদে।' ঠাট্টা করেছিল সুনয়নী।

'আমার সুবাদে! দেখি আজ থেকে সমস্ত সু বাদ দিলাম দিদি। বাসাড়ে যখন হয়েছি তখন চাষাড়েই হব ঠিকঠাক।'

লজ্ঝর একটা ফ্যান ভাড়া করে এনেছিল ভবদেব। এ-সি কারেণ্টের পাখা, বাটি-সুদ্ধ ঘোরে। পুরো দমে চালালে প্রলয়ঙ্কর শব্দ হয়, ঘর-দোর কাঁপে, মনে হয় সিলিং বুঝি ফেটে পড়বে। সেই শব্দ উপরে যায়, উপর থেকে

ফেরাফিরতি বল খেলে, দুপ-দাপ চালায়, কিন্তু কতক্ষণ চালাবে, এদিকে পাখা ঘুরছে দিন-রাত।

শুধু তাই নয়, শুরু করেছিল দেয়ালে পেরেক ঠুকতে, শার্সি ভাঙতে, মেঝেতে হাতুড়ি পিটতে। আর কি করা, উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল বাড়িওলা। উলটে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের কাছে নালিশ করল ভাড়াটে। জল বন্ধ, আলো বন্ধ।

লাগ ভেলকি লাগ।

এমনি যখন জলদতালে বাজনা বাজছে, তখন খবর এল ভবদেবের চাকরি স্থায়ী হয়েছে। প্রমোশন পেয়েছে ইউরোপিয়ান গ্রেডে। কিছুকাল পরেই কোয়ার্টার্স দেবে কোম্পানি।

দেখতে-দেখতে একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। খারিজ হয়ে গেল সমস্ত মালিমামলা। আকাশ-বাতাসের বদলে গেল চেহারা। নিচের ঘরে আলো জ্বলল শুধু নয়, নতুন পয়েণ্ট বসাল পরাশর। জল দিতে লাগল চৌবাচ্চা ছাপিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল উপরের দুপদাপ। কাপড় শুকোতে লাগল ছাদের উপরে প্রসারিত হয়ে। শুধু তাই নয়, পরাশর নতুন একটা নিঃশব্দ পাখা দিলে ভবদেবকে। ভাড়া? ভাড়ার জন্যে কি।

আশ্চর্য, সময়ে অসময়ে নিচে নামতে লাগল ক্ষণিকা। সুনয়নীর কাজ-কর্মে হাত মেলাতে লাগল। দু-একটা রান্নাও নাড়ল-চাড়ল। কখনো-সখনো হাত রাখতে লাগল ভবদেবের টেবিলে। ভবদেবেরও ঘন-ঘন নেমন্তন্ন হতে লাগল উপরে। পরামশরের মা আর বৌদিও চলে এল সামনে, নতুনতরো আত্মীয়তার আলো ফেলে।

পরাশরের মা বললেন, গায়ের রং একটু কালো হলে কি হবে, দিব্যি স্বাস্থ্য।

আর লেখাপড়া? ফোড়ন দিল বৌদি।

সব জানা আছে। মনে-মনে হেসেছিল ভবদেব। আসলে চাকরি, বড় বাহালি চাকরি। আসলে টাকা। আসলে কোয়ার্টার্স।

হাল ঠিক ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু মুষ্টিটা একটু শিথিল করেছিল ভবদেব। দেখি হাওয়ার টানে কোথায় গিয়ে উঠি, কোন রোমাঞ্চের বন্দরে। দেখি উদ্ধত কি করে বিগলিত হয়। দুরূহ-দুর্জ্ঞেয় কি করে সরল হয়ে আসে।

দক্ষিণের আকাশ অনেকখানি জুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। বার্ণপুরের ফার্নেস। যেন উদ্যত বজ্রের মতো জ্বলছে কোথায় মহাভয়ঙ্কর। দাহের ওপারে নির্দয় শাসনের মত। যেন বলছে রূঢ়ভাবে, তর্জনী আস্ফালন করে,

কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না, কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, নেই কোনো বিচ্যুতির নিষ্কৃতি।

তাই, ভয় পেয়ে গিয়েছে ক্ষণিকা। কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ভয়ের কুণ্ডলীর মধ্যে অভ্যাসের জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

যদি এই ভয়টুকু না থাকে তবে কিসের জয়! এই ভয়টুকু আছে বলেই তো নির্জন গিরিশিখরের ডাক। ডাক সেই পথ-হারানো গহন অরণ্যের। সঙ্গলেশ-হীন সমুদ্রতীরের। সেই ডাকটি কি এই মহান রাত্রি পৌঁছে দিতে পারেনি ক্ষণিকার কানে-কানে?

বটেই তো। সেও নুন-নেবু মেশানো ফিকে জল-বার্লি। একটি অভ্যস্ত জীবনের জীর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। রাত্রির ক্লান্তির প্রতিটি প্রভাতকে মলিন দেখবার বাসনায়। নেই তার মধ্যে সেই আনন্দোদ্ভব উদ্ঘাটনের স্বপ্ন। সর্ব-অর্পণের ব্যাকুলতা! রাজকন্যার ভিখারিণী সাজবার তাপসশ্রী! তাহলে তাকে দিয়ে আর কি হবে? যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে মহারাত্রির মৌনে, সমস্ত হিসেব-কিতেবের বাইরে. কোনো রকম কৃত্রিম মীমাংসা না মেনে—এই উজ্জ্বলতাটুকু এই নবীনতাটুকু যদি সে উপহার দিতে না পারে, তবে তার দাম কি, তবে তার মহত্ত্ব কোথায়!

ভালোবাসা না ছাই! মোটা জাঁকালো চাকরি। টাকা। স্ববাসের কাছে কোয়ার্টার্স।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে দিয়েছিল পরাশর। চলুন যাই কল্যাণেশ্বরী, বরাকরের ডাকবাংলো। ওবার তোপচাঁচি। এবার চলুন আরো দূরে, পরেশনাথ।

কেমন একটা ঘোর-ঘোর নতুন দৃষ্টি এসেছিল ভবদেবের চোখে। রক্তে নতুনতরো আস্বাদ। হঠাৎ ঘুম-ভেঙে যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মনে-পড়ে-যাওয়ার সুগন্ধ। নতুন দৃষ্টির সঙ্গে নতুন দৃষ্টির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সমস্তই যেন চক্ষুময় হয়ে ওঠে। অলক্ষ্য একটি নিমন্ত্রণের ভাষা নীরবে গুঞ্জরণ করতে থাকে। আশ্চর্য, যে চোখে আগে চকমকি পাথর ছিল তাতে এখন একটি লজ্জা একটি গম্ভীর কোমলতা দেখা দিয়েছে। একটি ধরা-পড়ার প্রস্তুতির লাবণ্য। কি করে এ সম্ভব হতে পারে ভেবে পায়নি ভবদেব। কে রচনা করল এই রুক্ষ মাটির শ্যামায়ন! নিষ্পাদপের দেশে অজানা পক্ষিকাকলী।

কিন্তু ঐখানেই শেষ। আর কোনো ঐশ্বর্য নেই। শুধু একটি দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমাপ্তি পাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

সুনয়নীকে বলেছিলেন পরাশরের মা : 'তুমিই তো কর্ত্রী। এখন বলো কি তোমার দাবিদাওয়া!'

'দাবিদাওয়া যে কিছু নেই তা আমি জানি।' সুনয়নী বলেছিল হেসে হেসে, 'কিন্তু আমিই কর্ত্রী কিনা তাই জানি না।'

সেই দাবিদাওয়া জানাবার জন্যেই সেদিন এসেছিল ক্ষণিকা। ছুটির দ্বিপ্রহরে। সুনয়নীর সুতো ধরে ভবদেবের নির্জনতায়।

ভবদেব বলেছিল, 'একদিন মধ্যরাত্রে আসতে পারো?'

দু চোখে অন্ধকার দেখেছিল ক্ষণিকা। ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিল।

'চার দিকে এত ভিড়, কোনো সম্ভাবনা নেই, তা আমি জানি।' রাজনীতিকের নিরুদ্বেগ গলায় বলেছিল ভবদেব : 'কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের ষড়যন্ত্রে যদি কোনো দিন সেই মসৃণ মহারাত্রি আসে, আসবে?'

মুচকে হেসে সম্মতির ঘাড় নেড়েছিল ক্ষণিকা।

সেই মহারাত্রি সমাগত। কিন্তু ক্ষণিকার সাড়া নেই। আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতির নিচে আত্মদানের স্বাক্ষরটি ছিল না। পরিমিত জীবনের অপ্রমত্ত শান্তির কূপে তৃষানিবৃত্তির অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রির মঞ্জুষায় দিল না তাকে একটি উজ্জ্বলতম দিনের উপহার। দিল না তাকে একটি বাঙ্ময়ী নিস্তব্ধতা। তার পৌরুষকে মহিমান্বিত করল না একটি বলবান বিশ্বাসে।

সত্যিই তো, বিশ্বাস কি। যদি অবশেষে ছিন্নসূত্র মালার মত ধুলোয় ফেলে দেয় ভবদেব! কে না জানে অবিবেকী পুরুষের খামখেয়াল! যদি তার কাছে সহসা সমস্ত মূল্য খুইয়ে বসে! যদি এক লহমায় সমস্ত রহস্যের অবসান হয়! যদি শেষ ছত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই কবিতাটি থেমে যায়, সমস্ত কথা, সমস্ত সুর যায় ফুরিয়ে।

তার চেয়ে নিষ্পত্তির দৃঢ়ভূমি অনেক ভালো। অনেক ভালো ধৈর্যের ফুলশয্যা।

সে তো শুধু একটা নিয়মপালনের রাত্রি। সে সব ফুল তো বাজারে কেনা। কিন্তু সে ফুলশয্যার চেয়ে এ তৃণশয্যার অনেক ঐশ্বর্য। আকাশের অনাবৃতির নিচে শ্যামলতার উন্মুক্তি।

তবে তাই হোক, এখানেই ইতি পড়ুক। তোমার অক্ষত অন্তরের

পুণ্যস্থানে ফটক এ'টে দাও। তুমি থাকো তোমার অক্ষোভে অক্ষুণ্ণ হয়ে। আমি এবার শুয়ে পড়ি। ভবদেব বিছানার দিকে তাকালো। এবার শুয়ে পড়ি। বৃষ্টিটি আর নেই।

অন্যায্য অভিমান করে লাভ কি। বাধাবিঘ্নগুলোও বুঝতে হয়। বড় বন্ধনগুলো নেই বটে কিন্তু ছোট কণ্টক অনেকগুলি।

'বিমলাকেই আমার বেশি ভয়।' বলেছিল ক্ষণিকা। 'ওর দুটো রোগ, দুটোই সাংঘাতিক! এক হিংসে, দুই অনিদ্রা।'

'দুটো বড়ি দিচ্ছি, খাইয়ে দিয়ো চালাকি করে।' বলেছিল ভবদেব।

এটুকু এলেকার মধ্যে চার-চার ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে পরাশর। সাধে কি আর ভবদেব তাকে হাড়কিপ্পন চশমখোর বলে! গ্যারাজের উপরে দুখানা ঘর তুলে ভাড়া দিয়েছে বিমলা আর বিমলার মাকে। বিমলার মা ধাইগিরি করে। রাত্রে যদি কল আসে তবে বিমলাকে ক্ষণিকার কাছে শুতে পাঠায়। তেমন যদি কিছু ঘটে আজ অঘটন তাহলেই তো বিপদ! একে পাশে শোবে তায় আবার ঘুম নেই!

কিন্তু ভবদেবের নিজের ভয় নাগমশাইকে। ভাড়াটে বসাবার আগে আর বাছবিচার করেনি পরাশর। কোথাকার এক বিপত্নীক নিঃসন্তান ঠিকেদারকে ঘর দিয়েছে একখানা। জীবনে দুটি মাত্র ব্যসন, রাতে চোর ধরা ও দিনে নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে ইতি-উতি উঁকিঝুঁকি মারা। পাড়ার রক্ষীদলের সর্দার। জানলা দিয়ে কোন চোর হাত বাড়াল কোন মশারির মধ্যে, কোথায় গার্ডে-ড্রাইভারে ষড় করে ট্রেন থামিয়ে ওয়্যাগন ভাঙল—এই সবেরই ফিরিস্তি করে। বাড়ির আনাচে-কানাচে, কখনো বা ট্রেনের লাইনের ধারে-ধারে টহল দেয়। যখন ঘরে থাকে, জানলার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁকে চশমা ঠেকিয়ে চেয়ে থাকে।

শুধু নাগ নয়, কালনাগ। দুপেয়ে সাপ। তার উদ্যত ফণা ডিঙিয়ে আসা কি সহজ কথা?

তারপর ওদিককার একতলার সেডের খগেন মিত্তির। সে আবার যোগধ্যান করে। করবি তো কর ঘরে বসে কর। তা নয়, ঘরের বাইরে এজমালি গেটের কাছে আম গাছটার তলায় চেয়ার পেতে বসে থাকে। চোখ বুজে শিরদাঁড়া খাড়া করে। সত্যিকার হলে ভাবনা ছিল না, টের পেত না কিছু। ভণ্ড বলেই ভয়। চোখ চেয়ে দেখে ফেলবে ঠিক সময়।

বিষ্টিতে উপকার করেছে। যোগীবর ঘরে গেছেন। কিন্তু নাগমশায়ের খড়খড়িটির কি দৃশ্য কে জানে। কে জানে বড়ি খেয়ে কেমন আছে বিমলা! কে জানে তার মা কোথায়!

ভুল করে না ইচ্ছে করে নিজেই বড়ি খেয়ে ফেলেছে কিনা তার ঠিক কি।

বাধা হয়তো আর কোথায়ও নয়, বাধা তার মনে। সে আত্মীয় হতে চায়, আপন হতে চায় না। সংহত তুষারপিণ্ড হয়ে থাকবে, হবে না সীমাতিক্রান্তা নির্ঝরিণী। এও একরকম অহঙ্কার। আমি পবিত্র, আমি অব্যাহত, আমি অপ্রমত্ত এই অহঙ্কার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ভবদেব। বি-এন-আরের রাত্রের ট্রেনটাও চলে গেল এতক্ষণে। আর কি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক গ্লাশ। এবার পরাভূত শয্যায় গিয়ে লজ্জিত ঘুমটুকু সেরে নি।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক!

হৃৎপিণ্ড শব্দ করে উঠল নাকি? রুদ্ধদ্বার দেবমন্দিরে কি আপনা থেকেই ঘণ্টা বেজে উঠল!

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক!

কোন দিকের দরজা? ভিতর বারান্দার, না, বাহির বারান্দার? কোন সিঁড়ি দিয়ে নামল? বিমলা কি ঘুমিয়েছে? তার মার আর কল আসেনি? নাগমশায়ের খড়খড়ি কি বুজে গেছে? ছাড়া চেয়ারে আবার এসে বসেনি তো যোগীবর?

ও কি, কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে? দরজা বন্ধ দেখে ও আবাব ফিরে যাবে নাকি?

খুট করে ছিটকিনি টানল ভবদেব। দরজাটা একটু ফাঁক করল। সুট করে ঢুকে পড়ল ক্ষণিকা। নিয়তির পরিহাস নয়, সত্যিসত্যি ক্ষণিকা।

কাঁপছে, লতার মত কাঁপছে। যত ঠাণ্ডায় নয় তত ভয়ে। যত উচ্ছ্বাসে নয় তত উৎকণ্ঠায়। শুধু বললে, অস্ফুট নম্রস্বরে বললে, আমি এসেছি।

মাধুর্যসিন্ধুর দুটি তরঙ্গের মত মনে হল শব্দ দুটোকে। আমি এসেছি। হে গুহাহিত গোপন পুরুষ, আমি এসেছি। হে আকর্ষী বংশী, আমি শুনেছি তোমার ডাক, চিনেছি তোমার পথ। তুমি এবার আমাকে ধরো, আমাকে নাও, আমাকে ভাঙো। আমাকে শূন্য করে পূর্ণ করো।

কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারল না ভবদেব। হাত ধরে টেনে আনল

না কাছে, বসতে বলল না বিছানায়. কি আশ্চর্য, দরজায় ছিটকিনি লাগাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

ইলেকট্রিক লাইট নয়, মোমবাতি জ্বালাল ভবদেব। স্নিগ্ধ আলোতে দেখল ক্ষণিকার ক্ষণকরুণ মুখখানি। ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনীর মুখ।

বললে, 'তুমি এসেছ। এর উত্তরে আমি কী বলতে পারি? বলতে পারি, আমি আছি। একজন আছে, আরেকজন আসে। এ আছে বলেই তো সে আসে। আর সে আসবে বলেই তো এ বসে আছে অন্ধকারে। তাই নয়?'

অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল ক্ষণিকা।

'তোমাকে কী দিই বলো তো?' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ভবদেব। খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়াতেই পেল সেই গোলাপ গাছ। বৃন্তাশ্রয়ে বিহ্বল একটি গোলাপ জেগে আছে। ঘ্রাণে-বর্ণে গদ্‌গদ হয়ে। শুষ্ক গর্বরূপে নয়, সুধাসরস প্রেমরূপে। নিবেদনের বেদনায় আনন্দময় হয়ে।

সন্তর্পণে ফুলটি ছিঁড়ল ভবদেব। ক্ষণিকার স্তূপীকৃত চুলের মধ্যে গুঁজে দিলে।

দরজা খুলে এগিয়ে দিতে গেল ক্ষণিকাকে।

ক্ষণিকার চোখে জলের ছোঁয়া লেগেছে। ছোঁয়া লেগেছে কণ্ঠস্বরে। আর্তস্বরে বললে. 'এ কি. আপনি চললেন কোথা?'

'বা, সে কি কথা? তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি?' দেয়ালের পাশে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা। ছায়া হয়ে মিশে যেতে চাইল। বললে 'যদি কেউ দেখে ফেলে, সব বুঝে নেবে।'

'যাতে ভুল না বোঝে তাই তো আমি চাই। বলো কোন সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলে? বিমলাকে কটা বড়ি দিয়েছ? নাগমশায়ের খড়খড়ির ফাঁক ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করেছ নাকি? আর যোগীবরের কি খবর? যোগনিদ্রার চেয়ে সুখনিদ্রা অনেক আরামের। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে। কোনো ভয় নেই—'

পরিত্যক্ত বিছানায় এসে শুলো ক্ষণিকা। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

মগের মুলুক

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। ধূ-ধূ করছে ধান খেত।

টঙের ঘরে জানলার ধারে বসে আছে পঞ্চমা। ফাঁপানো খোঁপায় ফুল গোঁজা! গলায় রূপোর শিকলি, হাতে খাড়ু। কচি গোলপাতা দিয়ে বাঁধা বিড়ি টানছে বসে-বসে। সরু-সরু ভাসা-ভাসা চোখে চেয়ে আছে খেতের দিকে।

কেউ যেন আসবে, অথচ আসছে না!

জ্যোৎস্নায় কেমন ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছে খেতগুলো। তেমনি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা নধর-নরম ভাব তার শরীরে। কুড়ি বছর হতে পঞ্চমার এখনো দু-তিন বছর বাকি।

জানলার বাইরে কার পায়ের খসখস। শিস দিচ্ছে কে মিঠি-মিঠি।

কই, পাড়ার কুকুরগুলো সমস্বরে খেঁকিয়ে উঠছে না তো? তবে নিশ্চয়ই কোনো চেনা লোক। পাড়ারই কোনো পয়মন্ত ছোকরা।

পাশের ঘরে কান খাড়া করে বসে আছে চাজা। আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ মঞ্চিন মগনী।

'সিঁড়ি দিয়ে উঠল টঙে?' স্ত্রীকে জিগগেস করলে চাজা।

'উঠছে। পা টিপে-টিপে উঠছে।' প্রায় দম বন্ধ করে বললে মঞ্চিন।

সুঁদরির খুঁটির উপরে টং। মাটি থেকে খাড়া এক মানুষের সমান উঁচু। টঙের নিচে তাঁত। টঙের নিচেই ঢেঁকি।

পাড়দেওয়া ঢেঁকি নয়। ঘানির মতন হাতে ঘোরানো।

টঙের মেঝেয় সুঁদরি কাঠের পাটাতন। যেখানটায় কাঠে কুলোয়নি সেখানটায় শুপুরি গাছের চেরা। আগন্তুকের জুতোর শব্দ জেগে উঠল পাটাতনে।

পঞ্চমার ঘরের দরজা খোলা। সটান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক। মিঠি-মিঠি শিস দিতে লাগল।

চিনতে পেরেছে পঞ্চমা। মোচা মগের ছেলে লাফরা মগ। তেইশ-চব্বিশ বছরের জোয়ান ছোকরা। দেখতে-শুনতে দিব্যি।

শুধু দেখতে-শুনতে? অবস্থা কি প্রকাণ্ড মোচা মগের! প্রায় পঞ্চাশ

কানি জমি। অগুনতি মোষ। পাড়ার মাতব্বর মোচা। তার নামেই পাড়ার নাম। মোচা পাড়া।

লাফরার পরনে লুঙ্গি নয়—লুংসি। মোটা বুনটের হলে লুঙ্গি বলে। চিকণ বুনটের হলে লুংসি। লাফরা বড়লোক। অন্তত বড়লোকের ছেলে। তার উপরে বড় ছেলে, প্রথম সন্তান। মগী আইনে যাকে বলে ওরাসা। বাপ-মায়ের একজন কেউ মরলেই যে সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ আদায় করে নিতে পারবে। পরে হবে আরো এক চৌথের হকদার। আর, যাকে বিয়ে করলেই আধাআধি সরিক হবে পঞ্চমা।

গা তুলবে না কি পঞ্চমা? মুচকে হেসে দাঁড়াবে না কি কাছে গিয়ে? দেবে না কি একটা চুমু খেতে?

যেন অতিকষ্টে ঘাড় ফেরাল পঞ্চমা। চোখ দুটো তেরছা করল। শক্ত করে বাঁকালো ঠোঁট দুটো।

'ও কি, চলে গেল না কি? দরজা বন্ধ করল না?' চাজা ঝাঁজিয়ে উঠল।

'তাই তো। ফিরে যাবার শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে।' মঞ্চিন হতাশের মতন বললে। 'আহা, মুখে আর শিস নেই—'

কি সর্বনাশ! এমন পাত্র ফিরিয়ে দিল পঞ্চমা? ধনে-মানে এমন যে তাক-লাগানো ছেলে। এমন যে হাতবাড়িয়ে-লুফে-নেবার মতন! দরজায় খিল লাগাতে যেখানে এক পলকও দ্বিধা করার কথা নয়। তাকে, পুরো একটা নিশ্বাস ফেলবার আগেই, হাতের হাওয়ায় তাড়িয়ে দিলে! মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেছে?

'নষ্ট হয়ে গেছে।' মদের ভাঁড়ে চুমুক দিল মঞ্চিন।

'হারামজাদি।' দাঁত কিড়মিড় করে শক্ত একটা গাল দিলে চাজা। এত মিঠা মদ, তেতো হয়ে উঠল।

আবার কেউ এসেছে বুঝি। হ্যাঁ, শিস দিচ্ছে। কুকুর যখন ঘেয়োচ্ছে না, তখন এ পাড়ারই কেউ বাসিন্দে। চেনা লোক।

মুখ বাড়িয়ে দেখ তো একবার চেয়ে।

মদে থলথল করছে মঞ্চিন। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, থানডান।

মন্দ কি। একটু বয়স হয়েছে, এই যা। তা বেটাছেলের আবার বয়স কি!

কি, ঢুকেছে ঘরের মধ্যে?

ঢুকেছে।

মনের মিল হল না বলে বউয়ের সঙ্গে ছাড়াবিড়া হয়ে গেছে থানডানের। কাজিয়া-কোন্দল কিছু হয়নি। বলেছে বউকে, তোর মনের মানুষের কাছে তুই যা। আমি আমার মনের মানুষ খুঁজে নিই। দলিল হয়নি, আদালত হয়নি, শুধু মনে-মনেই বোঝাপড়া। আর, সেইটেই সমাজের কাছে আইনের কাছে সরল প্রমাণ। সুস্থ ব্যবস্থা। মন মানে তো থাকো, না মানে তো পথ দ্যাখো। রোচে-পোচে তো খা, না রোচে তো যা।

যেমন কটাক্ষে বিয়ে তেমনি কটাক্ষে তালাক।

নতুন বউ খুঁজতে বেরিয়েছে থানডান। পঞ্চমাকে পছন্দ হয়েছে।

কিন্তু পঞ্চমা?

'দেখ তো দরজায় খিল পড়ল কি না—' মণ্ডিনের গায়ে ঠেলা মারল চাজা।

'কে জানে! যখন দেরি হচ্ছে তখন খিল পড়েছে বোধ হয়।' মণ্ডিনের সাধ্য নেই উঠে দাঁড়ায়। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে, 'কিন্তু অমন ছোকরা ছেড়ে দিয়ে শেষে এই আধ-বয়সীকে ধরবে?'

কিছুই বলা যায় না। মনের মামলা এলোমেলো। কিসে ডিক্রি কিসে ডিসমিস কে বলবে!

ওস্তাদ বাজিয়ে, সুর-বাঁধা বীণা কোলের উপর বসানো, তবু গান জমে না। বৃষ্টি পড়ে ঠাণ্ডা হয়েছে দশ দিক, ফিটফাট নরম বিছানা, তবু ঘুম কই!

'থানডানও বুঝি চলে গেল।' মণ্ডিন ঢুলতে-ঢুলতে বললে।

'চলে গেল? খিল পড়ল না?' লাফিয়ে উঠল চাজা। 'আর পাত্র কই এ অঞ্চলে?'

জানলা খুলে বসে থাক সারা রাত।

যদি কেউ না-ই আসে শেষ পর্যন্ত। দোরে যদি খিল না চাপায় পঞ্চমা!

চাপাবেই না তো! কুড়ি বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যেই কুড়িতে পা দেবে অমনি পাখা গজিয়ে পালিয়ে যাবে এক দিকে।

মণ্ডিন আর বসে থাকতে পারছে না। গা ছেড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে কাদা পাকিয়ে। বললে, 'আমি আর বসতে পাচ্ছি না। আর মদ নেই।'

পাটাতনের উপরেই শুয়ে পড়ল মণ্ডিন।

কিন্তু চাজাকে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। টোপ ফেলেছে সে, ফাতনার দিকে চেয়ে তাকে পাড়ে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু কই ,শিস কই? হাততালি কই? . পাটাতনর উপর জুতোর মসমস কই? শব্দ কই দরজায় খিল দেবার?

বোশেখী পূর্ণিমার রাতটা বৃথাই যাবে নাকি?

কান ভোঁ-ভোঁ করছে চাজার। শিস শুনতে পাবে না। হাততালিও নয়। হয়তো খালি পায়েই উঠে আসবে। আসুক। আসতে দাও। দরজায় যদি খিল পড়েই, ভাবনা কি, ভোরে উঠে মত দেবে চাজা।

তাকাল একবার বাইরের দিকে। ঝিম-ঝিম করছে জ্যোৎস্না।

ঢুলতে-ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল কাৎ হয়ে।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল কুকুরের দল। বেপাড়ার কেউ এসে পড়েছে বোধ হয়। ধড়মড় করে উঠে বসল চাজা।

'কে রে? কে রে?' ছেনির জন্যে হাত বাড়াল।

রাত তখন অনেক। চাঁদ জানলার কাছে চলে এসেছে। একটু উঁকি মেরে দেখল, পণ্ডমা তখনো জেগে। তেমনি জানলার কাছে ব'সে।

দরজায় খিল পড়েনি। বুদ্ধের ছবির কাছে জ্বলছে একটি নতুন মোম।

কিন্তু কুকুরের ডাক থেমে গেল কেন? যদি চেঁচালি তবে থামলি কেন? খেতে পেল না কি কিছু?

পা টিপে-টিপে টং থেকে নেমে এল চাজা। শুনতে পেল চাপা গলার ফিসফিসানি। জানলার নিচে দাঁড়িয়ে কে কথা কইছে পণ্ডমার সঙ্গে।

'হ্যাঁ, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।' ঝাপসা গলায় বলছে পণ্ডমা : 'উঠে এস চুপি-চুপি। কুকুরগুলোকে খেতে দিয়েছি আফিং-মাখানো মিষ্টি। কিছু ভয় নেই। লগ্ন এখনো কাবার হয়নি আমার বিয়ের। একের পর এক মোম জ্বালিয়ে রাখছি আমি। আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরও জেগে আছেন—'

বুদ্ধদেবকে ঠাকুর বলে মগেরা। বলে, "ফারাতারা"।

তবু কি দ্বিধা করছে রূপা!

'চলে এস সটান, দরজা খোলা আছে। তুমি ঘরে এসে ঢুকলেই দরজায় খিল দেব। দরজায় একবার খিল চাপাতে পারলেই পাকা হয়ে গেল বিয়ে।'

একটি মাত্র মুহূর্ত। ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকা আর দরজায় খিল লাগানো। তার পরে ঘর আর ঘর নয়, অন্ধকার নয় আর অন্ধকার।

'কিন্তু যদি এমন-তেমন কিছু হয়?'

কী হবে! বাবার ইচ্ছেয় আমি স্বয়ম্বরে বসেছি। আমার বয়েস যদি কুড়ি

হত আমি পথে-ঘাটে হাটে-মাঠে বেরিয়ে আমার বর ধরে আনতে পারতাম। কুড়িতে এখনো পা দিইনি বলে আমার এই দুর্দশা। বাবার মত লাগবে। কিন্তু কুড়ি না হলেও একেবারে কুঁড়িটি নই আর। সেয়ান-শক্ত হয়েছি। তাই আমারো একটা মত আছে। আমিও রাজী-বেরাজী হতে পারি। তাই ঠিক হয়েছে স্বয়ম্বর হবে। কুড়ি বছরের কম বয়সের মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে সমাজে। যেখানে গাইয়ে-বাছুরে ভাব থাকে সেখানে বনে গিয়েও দুধ দেয়। কিন্তু এখানে বাপে-ঝিয়ে অবনিবনা। তাই, সবটা যেমন মেয়ের হাতে নেই তেমনি বাপের হাতেও নেই। ঠিক হয়েছে, সদরে বসে বাপ প্রথমে বাছাই করে দেবে, আর মেয়ে—এখানে একটু হাসল পঞ্চমা—মেয়ে করবে ছাঁটাই। কিন্তু যদি মনের মতন লোক একবার পায় এই চৌকাঠের এপারে, অমনি ক্ষিপ্র হাতে খিল এ'টে দেবে সজোরে। একবার খিল দিতে পারলেই অখিলের রানি হয়ে গেল পঞ্চমা। দরজায় কপাট পড়ল বটে, কিন্তু মনের কপাট খুলে গেল।

আর কোনো উপায় নেই?

হাতে-হাতে কিছু নেই। এক উপায় তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া।

'তাই চলো না।' জানলার কাছে আরো বুঝি একটু এগিয়ে এল রূপা। বললে, 'খালের ঘাটে, নৌকো বাঁধা আছে। জোয়ার এসেছে মাঝ রাতে।'

কিন্তু লাভ নেই। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া—কোথায় যাবে তুমি মুলুক ছেড়ে? বাবা আবার ঠিক ধরে নিয়ে আসবে।

'তবু, এইবার নিয়ে তিনবার পালানো হবে। আরেক বার— চার বার পালানো হলেই—'

জানে তা পঞ্চমা। কুড়ি বছরের মেয়ে স্বাধীন ইচ্ছায় যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে—একসঙ্গে বসে এক থালায় ভাত খেলেই বিয়ে সিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কুড়ির নিচে হলেই যত ফ্যাচাং। বাপের মত লাগবে। তবে মেয়ে যদি কুড়ির নিচে অথচ ষোলোর উপরে হয় আর পর-পর চার বার বাপের আশ্রয় থেকে পালিয়ে যেতে পারে কারু সঙ্গে, তবে তারই সঙ্গে পাকা হয়ে যায় তার বিয়ে। এক জনকে অবলম্বন করে এত নিদারুণ যার অধ্যবসায় তাকে চার বারের শেষে সমাজ আর শাসন করতে চায় না। বিয়েটা মেনে নেয়।

কিন্তু ও-পথে বড় নটখটি। কতটুকুই বা তোমার মুলুক, কতটুকুই বা মহল্লা। এ-পাড়া নয় ও-পাড়া, এ-বন্দর নয় তো ও-বন্দর। কোথায়, কত দূর বা তুমি যাবে! সুদূর আরাকানে তো আর যেতে পারবে না। আর এ অঞ্চলের

বাইরে কোথাও তোমার আড্ডা-আস্তানা নেই। সুতরাং লোক-জানাজানি হয়ে যাবে। বাবা কান ধরে মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। সে যেমন লজ্জা, তেমনি কেলেঙ্কার।

'তবু তিন বার হবে। তারপর আরেক বার— আরেক ফাঁকে— কোনো রকমে দু'জনে কোথাও একটু গা-ঢাকা দিতে পারলেই— ব্যস্, তখন আর আমাদের পায় কে!'

কিন্তু চার বার তো চূড়ান্ত হবে না এক্ষুনি। এ রুপোর রাত, এ সোনার সুযোগ কি নষ্ট করে দেবে? এক্ষুনি-এক্ষুনি যা হয়, তা কি কেউ ফেলে রাখে? দু' পা হেঁটে ঘরে এলে যেখানে ষোলো আনা হয় সেখানে বারো আনা পাবার জন্যে কে বিশ পা হেঁটে ঘাটে যায়?

'কিন্তু তোমার বাবা তো পথ আটকাবে। ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

'ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা। এখন রাত কত খেয়াল করো? চলে এস গুটি-গুটি।'

আমি এগিয়ে যাচ্ছি দরজার দিকে। চৌকাঠ পেরুবে আর অমনি, নিশ্বাস পড়তে না-পড়তে দরজা বন্ধ করে দেব। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে সকল কুচ্ছাকচাল।

গলির মুখে টঙের সিঁড়ির দিকে এগুলো রুপা। যা এক্ষুনি-এক্ষুনি হয় তার জন্যে কে বসে থাকে? ঘরেই যাকে পাওয়া যায় তার জন্যে কে নদীতে ভাসে?

আরেক পা এগিয়েছে, কাঁধের কাছে ছেনির কোপ পড়ল। মাতালের গলায় খলখল করে হেসে উঠল চাজা। ঝিমন্ত কুকুরগুলো খেঁকিয়ে উঠল।

টলে পড়ে গেল না রুপা। মার খেয়ে সোজা পালিয়ে গেল মাঠ ভেঙে।

শূন্যে ঘরে দরজায় খিল দিল পঞ্চমা। বিয়ের লগ্ন কাবার করে দিল। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল মোমবাতি।

আর, চাজা ভাবতে লাগল, এক কোপ বসিয়েই ক্ষান্ত হল কেন? মদের নেশায় গা-হাত-পা টলছে, জুৎ মত বসাতে পারেনি কোপটা। এখনো অনেকগুলি কোপ বাকি থেকে গেছে। নিসপিস করছে হাত। মদের নেশার মতো পেয়েছে এবার রক্তের নেশা।

ঐ পালিয়ে যাচ্ছে রুপা? হ্যাঁ ওকে আর পাওয়া যাবে না নাগালের মধ্যে। তবে— কাকে, কাকে ঘা বসাবে? কোথায়, কে আছে তার দুষমন?

হঠাৎ কলিমদ্দি সাহেবের মুখটা মনে পড়ল।

হাতের মুঠ শিথিল হয়ে এল আস্তে আস্তে। মনে পড়ল দরজার কাছে দেয়ালে টাঙানো জুতোর পাটিটা। বেত আর হাণ্টার। নেপথ্যে হয়তো বা বন্দুক।

দরকার নেই মারামারির স্বপ্ন দেখে। ঘাসে ঘসে ছেনির গায়ের রক্ত মুছে ফেলল চাজা।

কলিমদ্দি খাসমহল অফিসর।

দরজা দিয়ে তার আপিসে ঢুকেই রাজা-রানির ছবি চোখে পড়বে না। চোখে পড়বে একপাটি জুতো। দেয়ালে পেরেক ঠুকে তার মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

'আরেক পাটি কই?' জিগ্‌গেস করেছিল কে একজন বন্ধুস্থানীয় আগন্তুক।

জুতোটার আকার-প্রকার দেখেছ? ক' ইঞ্চি লম্বা মনে হয়? এ জুতো কি পরবার জন্যে?

তবে?

একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে হয়। প্রহার করবার জন্যে। মার না দিলে খাজনা আদায় হবে কি করে?

বেত-বিছুটি দিয়ে মারা যায়। জুতোর চেয়ে কম জোরালো নয়। তবু জুতোয় যেমন কাজ হয় তেমনটি আর কিছুতে হয় না। আর সব হাতিয়ারে শুধু মারই থাকে, জুতোয় থাকে তার চেয়ে আর একটু বেশি। জুতোয় মাখা থাকে অপমান।

মারের সঙ্গে অপমান মানে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

একটা সামান্য চাপরাশি আর চৌকিদার চাজাকে ধরে নিয়ে এল কাছারিতে।

চৌকিদার কোমরে দড়ি বাঁধতে চেয়েছিল। চাপরাশিই ধমকে উঠল, কেন, ও তো ফৌজদারি করেনি. দড়ি-কড়া দেবে কেন? তেরিমেরি করে তখন দেখা যাবে।

না, চাজা তেমন অবাধ্য-দুরন্ত নয়। কাছারিতে তলব হয়েছে. সে যাবে ঠিক পিছু-পিছু। খাজনা দেয়নি, সেটা আবার এমন কি অপরাধ!

অপরাধ যাই হোক, শাস্তি আছে প্রশস্ত।

খাজনা কই? হুমকে উঠল খাসমহলের হাকিম।

খাজনা কিসের? মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল চাজার। ঠিক রাগ করে বলছে না, যেন অবাক হয়ে বলছে।

সত্যিই তো, অবাক হবারই তো কথা! কোন কাণা সমুদ্র পেরিয়ে দূর আরাকান থেকে এসেছে তারা দল বেঁধে। জঙ্গল উঠিত করে আবাদ ফলাবার জন্যে। আর, একেকটা চরে কী নিফাঁক জঙ্গল, ঝোপের আড়ালে বাঘের নড়া-চড়া, সাপের কিলিবিলি। হাতে সেই ছেনি, যাকে দেখে জঙ্গল পথ করে দেবার জন্যে সরে-সরে যাচ্ছে আশে পাশে। জঙ্গল কাটতে-কাটতে টঙ বানিয়েছে গাছের ডালে। বাঘের ভয়ে গাছের উপরেই তাদের বাস ঘর। জঙ্গল একটু সাফ-সুতরা হয়ে যেই জমি বেরিয়েছে, অমনি দেশী কামারের থেকে লাঙল কিনে এনেছে। বনের থেকেই ধরে নিয়েছে মোষ। মাটিতে ফাল ঢুকিয়েছে। দীর্ণ রেখায় রস এসেছে মাটির। এসেছে কাজল-কালো ধান।

একেকটা কালি জঙ্গল এমনি করে আবাদী ধানের মাঠ হয়ে উঠেছে। শুধু সাহসে আর পরিশ্রমে। রক্তের বিনিময়ে। কেউ গিয়েছে বাঘের পেটে. কেউ কুমীরের। কাউকে সাপে কেটেছে। কেউ বা মরেছে ম্যালেরিয়ায়। তবু দমেনি তারা। জঙ্গলকে পরাভূত করেছে। জঙ্গলের গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছে মাটিকে। শুধু উদ্ধারই করেনি, ফলবতী করেছে।

এত ঘাম আর রক্ত দিলাম, তার আবার খাজনা কি!

বা, বেশ কথা! মাটিকে মাঠ বানালি কিন্তু সেই মাটি কি তোর? তোর বাপুতি সম্পত্তি? মাটি যদি তোর না হয়, তবে মাঠও তোর নয়। পরিশ্রম করে জঙ্গল উঠিত করেছিস. তার বাবদ খাজনা মকুব পেয়েছিস দু' সন। এখন আস্তে-আস্তে খাজনা বসছে সইয়ে-সইয়ে। যেমন তোর জমির মোট, তেমনি তোর খাজনার নিরিখ। নামমাত্র খাজনা। জমির একুন বেশি বলে খাজনাটা মোটা দেখায়। তাও এক লাফে চাপছে না, ধাপে-ধাপে উঠে আসছে। নইলে, তোরা ভেবেছিস যার যা খুশি দু'-তিনখানা মাঠ নিয়ে বসে পড়বি আর এন্তার ফসল তুলবি—কেউ কিছু বলতে পাবে না!

তা ছাড়া আবার কি।

শোন যদিও তোরা মগেরা এসে এখানে বসেছিস আস্তানা গেড়ে. এটা মগের মুলুক নয়, এটা কোম্পানির এলেকা। লুটপাট করে জমি খাবি, এ জঙ্গীবাজি সরকার বরদাস্ত করতে পারবে না। তাই একটা বিধি-ব্যবস্থা. বিলি-ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দু'-সন লাখেরাজ— শেষে— ক্রমে-ক্রমে—

খুব খোলসা করে বোঝেনি কিছু চাজা। জঙ্গল কেটে চাষ করে মাটির মুখের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে বলেই না এই জুলুমদারি। বেশ, তবে আচষা মাটি আগাছা গজিয়ে ফের জঙ্গলে ফিরে যাক।

তার আর উপায় নেই। তুমি ফেলে রাখো, তোমার জমি খাস হয়ে অন্যত্র বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এসব খাসমহলের খামখেয়ালি। আর, জমি জঙ্গলে ফিরে গেলেও, তুমি আর ফিরে যেতে পারো না—

তুমি বাসা বেঁধেছ। সংসার করেছ। ফিরে যে যাবে, খাবে কি? জমি কই?

আর যেখানেই যাও না কেন, কোথাও আর সেই মগের মুলুক নেই।

সুতরাং—

খাজনার ব্যবস্থা করো। খোরাকির জন্যে ধান রেখে বাড়তি ধান বেচে খাজনা জোগাও।

অত হিসাব-কিতাব করতে পারব না। হাতে যখন টাকা হবে তখন দেব। বাস্তব্য যখন করছি তখন আর পালিয়ে যাচ্ছি না।

কিন্তু টাকা এসে হাতে লাগে কই? থাকে কই? যেই ধান ওঠে খলেনে, নানান দিক থেকে বিদেশী বেপারীর নৌকো এসে জোটে। নানা রকম মনিহারি জিনিসের দোকান খোলে। যা পারে নেয় ফেরাই করে।

বিদেশী বেপারী লাগবে কেন? আছে দেশী জুয়োর আড্ডা। 'কো' খেলা। কিংবা 'ফেকজাতি'। এক রকম তাসের হাত-সাফাই। তাতেই সব খুইয়ে আসে। তার উপর আছে আবার মদ— খাঁটি হ'লে চলবে না, চাই বিলিতি মাল। আর যদি সমস্ত কাজের বার হয়ে যেতে চাও, আফিং ধরো, চোখ দু'টোকে সূক্ষ্ম একটা রেখায় নিয়ে গিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকো।

খাজনা কই? হুমকে ওঠে খাসমহলের হাকিম।

হাত একেবারে খালি— দু'হাত চিৎ করে অসহায়ের মত হাসল চাজা।

কিন্তু তাই বলে পিঠ খালি যাবার তো কোনো অর্থ নেই। খাজনা-আদায়ী জুতোর এক ঘা বসিয়ে দিলে পিঠের উপর। আরো এক ঘা। ভাগ্যিস ডেলা পাকিয়ে আফিং খেয়ে এসেছিল। তাই আবার নির্লিপ্তের মত হাসতে পারল চাজা।

জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার চেয়ে মার অনেক ভাল। মারের একটা শেষ আছে, কিন্তু জলে একবার ডোবালে কখন যে ফের পার পাবে ঠিক-ঠিকানা নেই।

ঘটি-বাটি, তাঁত-ঘানি ক্রোক করে কী পাওয়া যাবে? জমি ধরো। জমি ধরবার আগে আরেকবার নিয়ে এসো কাছারিতে। জুতোর ডগার দিক ছেড়ে এবার গোড়ালির দিক দিয়ে চেষ্টা করো। পিঠে না মেরে গালে মারলে কেমন হয়?

মগ ছাড়া মগের জমি ধরা যায় না। যদি একটু মন-জানাজানি থাকে তবে একে অন্যের জমি ধরবে না বলে এককাট্টা হওয়া যায়। কিন্তু আইনের ঘরে ষড় করে আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে মকিমালি। আগে বাড়ি-ঘরের নিশান ছিল না, এখন অনেক টাকার মালগুজারি করে। পাশের গাঁয়ের জোরদার জোতদার। মনের সাধ, মগেব মুলুকের জমি কিছু হাতিয়ে নেয়। তাই আগেই হাত করেছে খাসমহলের কেরানিকে। ভুয়ো ফেরেবী এক মগ খাড়া করে নিলেমী জমি কিনে নিয়েছে। দিয়েছে হয়তো তাকে এক দলা আফিং কিংবা দু' বোতল বিলিতি জল— তাতেই নাম ভাড়া দিয়েছে স্বচ্ছন্দে। নাম চলছে হয়তো নাথু মগ, ধান উঠছে মকিমালির খলেনে। এমনি আছে আরো একজন ফেরেববাজ। হরিশ্চন্দ্র কাউর। মগেরা গোপনে তাদের বর্গাদার হয়ে থাকে এই তাদের মতলোব। শুধু দেখাক মাঠের উপরে তারা, আর খাটের উপর হরিশ্চন্দ্র আর মকিমালি।

এমনি করে জমি একবার বেরিয়ে গেছে হাতের থেকে আবার চাজা তা নিয়ে এসেছে কবজায়। আগের পরিবার তার বুঝদার ছিল। নৌকো বাইত মাছ ধরত লাকড়ি ফাড়ত তাঁত বুনত। নিজে খেটে খাটাত চাজাকে। ভুঁই রুইত পর্যন্ত। জমি যখন পাতলা হয়ে আসত, বন্ধ করে দিত আফিং, কমিয়ে দিত মদের মাত্রা, জুয়ার আড্ডায় না পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিত— ঠাকুরবাড়ি—ঠাকুর-বাড়ি মানে "ফাবাতারার" ঘরে। সৎ পথে থাকলেই "বুদ্ধু মানু" দয়া করে, হাতে পয়সা হয়। হাতে পয়সা হলে জমি হতে কতক্ষণ। আর জমি যদি পাই তবে রাজত্বের আর বাকি কি!

এমনি করে তেরো-চৌদ্দ বছর গেছে একে-একে। অনেক হাকিম বদল হল কিন্তু খাজনা আদায়ী জুতোর বদল নেই। নাল বসিয়ে তলা মজবুত করা হয়েছে, এখানে-ওখানে পড়েছে ক'টা তালির প্রহসন। চলেছে সেই পিটুনির রেওয়াজ। আফিং-মদের বিনিময়ে বেনামীতে জমি ফুসলানো।

এক জনই শুধু নেই। চাজার পরিবার, পঞ্চমার মা। খাটনির তুলনায়

খাওয়া না পেয়ে হলদে রোগে ধরল। হলদে থেকে শাদা হয়ে গেল আস্তে-আস্তে।

প্রথম-প্রথম অতটা কষ্ট হয়নি চাজার। মরল বলেই তারাও-মগের তালাকী পরিবারকে, মণিনকে, নিকে করতে পেল। তারাও-মগের জেনানাকে দেখে যে না বলতে পারে সে মরদ জন্মায়নি মগের এলেকায়।

'তারাও তোমাকে তাড়াল কেন?'

'একটু রং-ঢং বেশি তো আমার। তাই সন্দেহ করলে মিছিমিছি—'

যাকে সন্দেহ করা যায় অথচ প্রমাণ পাওয়া যায় না—চাজার মনে হল তার মধ্যে নতুন রকমের স্বাদ। তার সঙ্গে বসে মদ খাওয়ায় নতুন রকম আনন্দ! নতুন রকম আলস্য!

এবার যখন চাজাকে বাকি-বকেয়ার তাগাদায় কাছারিতে ধরে নিয়ে এল, তখন, আশ্চর্য, সে কাঁদলে। মনে-মনে কাঁদলে। কাঁদলে পঞ্চমার মা'র জন্যে। পিঠে যখন জুতো পড়ল মনে হল বুকের উপর মারলে। মনে হল, জমি নিলেম হয়ে যাবার পর আবার নতুন জমি ধরবার আর তার শক্তি নেই।

পঞ্চমার মা মরেছে, কিন্তু পঞ্চমা আছে। পঞ্চমা ফিরিয়ে দিতে পারে অবস্থা। কিছু খাটা-খাটনি করতে হবে না তার, শুধু একটি শাঁসালো দেখে বর বাছতে হবে। এমন বর যার ধানের মরাইয়ে হাত ঢোকাতে পারে সহজে। সম্পত্তিতে ভাগ নিতে পারে আট আনা।

যদি বাকি এ আধকানি জমিটাও যায় তা হলে চাজাকে গাবুর খাটতে হবে। পরের জমিতে কিরষানি। খাই-খোরাকিতে হালিয়া।

আর বউ?

বউ নয় তো নাই-দিনের কুটুম। মদ জুটবে না তো মনও উঠবে না। যে লবণ-ভাত খেয়ে গেছে সেই ছিল বউ—পঞ্চমার মা। পঞ্চমা তার মেয়ে হয়ে কেন এমন দিকদারি করছে! কেন বুঝছে না বাপের অবস্থা!

ও পঞ্চমা, মুখ তুলে চা, বেপারীর পসরা তোর ঘাটের দরজায়। বুঝে নে তোর জায়-জিনিস।

পঞ্চমার চোখ বাজে সওদার দিকে।

তালতলির ভাঙা হাটে দু'জনের দেখা— পঞ্চমার আর রূপার।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করে পঞ্চমা বললে, 'পালাব।'

'পালাবে?' রূপার ভাসা-ভাসা চোখ উলসে উঠল : 'তা হলে এই নিয়ে হবে তিন বার।'

বাইশতলির ঘাটে দু'জনে দু' রাস্তা দিয়ে এসে হাজির হল। চোখের পলকে কথা, চোখের পলকে মন-জানাজানি। কথার পিঠে কথা লাগে না, না লাগে সল্লা-পরামর্শ— একটু মাত্র চোখের চাউনিতেই মুক্ত আকাশের সংবাদ।

'যদি এবার ধরা পড়ি?' ভয়ে-ভয়ে বলল পঞ্চমা।

'তা হলে কোপ এবার পিঠে না পড়ে ঘাড়ে পড়বে।' হাসল রূপা : 'তবু তিনবার তো হবে! আর একবার হলেই তুই আমার বউ। আমার ঘরে-ওঠা পাকা ঘুঁটি—'

কেমন ভয়-ভয় করছে পঞ্চমার। কেবলই মনে হচ্ছে, ধরা পড়ে যাবে!

বা, ধরা তো পড়বই। ধরা তো পড়তেই হবে। ধরা না পড়লে লোকে বুঝবে কি করে যে, দু'জনে পালিয়েছিলাম একসঙ্গে। ধরা পড়াই তো আমাদের জিৎ। আমাদের টেক্কা।

তবে বেশি দূর না ঘুরে পাশের ঘাটে গিয়েই ধরা দিই। ডাকাডাকি করে লোক জানাই। জড়ো করি হাট-ঘাটের মানুষদের। বলবে, কে যায় রে নৌকোয়? চাজা মগের মেয়ে পঞ্চমা আর ফাওনা মগের ছেলে রূপা নয়? আবার কে! পালিয়ে যাচ্ছে বুঝি সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে? কেলেঙ্কারির কারসাজিতে? ধর ধর দুটোকে। হাসতে-হাসতে ধরা দেব আমরা। আমাদের অন্তরে কূট-কপট নেই। চিরকালের জন্যে ধরা পড়তে চাই বলেই ধরা দিতে চাই।

তোমার আজ দিক ভুল হয়ে যাচ্ছে, পঞ্চমা। এক রাত্রি একসঙ্গে বাস না করলে পালানো হয় কি করে? দু'জনে নৌকোয় করে একসঙ্গে একলা একটু বেড়ালুম, তাকে কি আর পালানো বলে? তাকে বলে হাওয়া-খাওয়া। এক রাত্রি ঘর আর পাড়া থেকে একসঙ্গে গরহাজির থাকতে পারলেই পালানোটা সিদ্ধ হল— ভুলে গেলে তুমি? একসঙ্গে এক রাত্রি— আর তা পাড়ার বাইরে। পাড়ার বাইরে মানেই গাঁয়ের বাইরে। মগেদের এক পাড়াতেই এক গাঁ। মগেদের গাঁ নেই— পাড়া। এক চাপে এক বসতি— খালের পাড়ে। আর যা খাল তাই নদী, এপার ওপার দেখা যায় না— আর বাকিটা ধান খেত, ঢালা ধান খেত। আর উই দূরে আরেক বসতি— আরেক পাড়া।

প্রথম দু'বারের কথা মনে আছে বৈ কি পঞ্চমার। দু'-দুবারই পাড়ার বাইরে রাত কাটিয়েছিল তারা। প্রথম বারটা তো কাটিয়েছিল এক অঘোর

জঙ্গলে। কোথা দিয়ে যে কোথায় চলে এসেছিল কিছুই খেয়াল করতে পারেনি। অসম্ভব শীত ছিল সেবার। কাঠ-পাতা জড়ো করে আগুন করেছিল রাতভোর। শুধু শীতের ভয়ে নয়, বাঘের ভয়েও। সর্বক্ষণ ভয় থাকলে কি ভালো লাগে? এ তো আগুনে বন পোড়ানো নয়, মন পোড়ানো। একবার মুখ ফুটে বলেছিল পঞ্চমা, আর কত আগুন পোয়াবো? ঘুম পায় না বুঝি?

'বেশ তো, ঘুমোও না। আমি জেগে পাহারা দেব সারা রাত।' চোখে একটু হাসির ঝিলিক দিয়েছিল রূপা : 'বাঘকে ভয় হ'তে পারে, কিন্তু আমাকে তো তোমার ভয় নেই।'

'ঠান্ডা মাটিতে বুঝি শোয়া যায়?'

ফাঁপানো খোঁপায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছিল রূপা : 'তোকে বুকে জড়িয়ে রাত কাটাবার দিন এখনো আসে নি। ধৈর্য ধরো, স্মরণ করো 'বুদ্ধ মানু'কে। ভেবে দেখ, আমাদের কত বড় পরীক্ষা। এমনিতে যদি বাপের মত থাকত, কিংবা যদি তুমি কুড়ি-বছরের হতে, তা হলে তো জল-ভাত ছিল। কিন্তু আমাদের তো বিয়ে নয়, আমাদের ভালবাসা। আমাদের আরো কঠিন নিয়ম। আগুনের কাছে আরো সরে এস। ভয় কি, আগুনই আমাদের রক্ষে করবে।'

দ্বিতীয় বার ছিল অঘোর বৃষ্টি। থমথমে কালো রাত, বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। সেদিন নৌকো ছিল এক গাছের এক কোশ এবারের মত ছইতোলা ডিঙি নৌকো নয়। সাধ্য ছিল না জলের থেকে আত্মরক্ষা করে। ফাঁড়ির মুখে শর-বনের মধ্যে নৌকোটা ঢুকিয়ে রেখেছিল সারা রাত। ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিল। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কেঁপেছিল হি-হি করে। তবু মনে-মনে তারিফ করেছিল বৃষ্টিকে। বৃষ্টিই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাদের।

যতই এগুচ্ছে ততই কঠিন হচ্ছে পরীক্ষা। তাই এবারে. তিন বারের বার, ফিনফিনে জ্যোৎস্না উঠছে। আর, নৌকোও জুটেছে কোশ নয়, দস্তুরমত টপ্পর-দেওয়া ডিঙি নৌকো। শান্ত নদীর উপর দিয়ে হেলে-দুলে বেয়ে চলেছে।

নিশুতি রাত জ্যোৎস্নায় খাঁ খাঁ করছে। শুধু নদীর কলকল। কোথায় ঝুরঝুরে মাটি ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

আজ রাতে তাদের কিসের ভয়? বাঘের, না, ঝড়ের? না, উদ্যত ছেনির? না, এই জলের উপরকার স্তব্ধতার?

'তোমার পিঠের ঘা কেমন আছে?'

'সেরে গেছে। বেশি বসাতে পারেনি। নেশার হাতে জোর কই?'

'শহরের হাসপাতালে গিয়েছিলে?'

'কি হবে হাসপাতালে গিয়ে? ওখানে গেলেই পুলিশের খপ্পরে পড়ব। পুলিশ আর পিঠের ঘা শুকোতে দেবে না—'

এমনি যত আজে-বাজে কথা।

হঠাৎ হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল পঞ্চমা। বললে, 'মুলুক-ছাড়া এমন জায়গা নেই যেখানে দুজনে চলে যেতে পারি এক জোয়ারে? এ নদী কি টানা পথে চলে না, না কেবলই এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে মগ-পাড়াতেই ফিরে আসে?'

মগ-পাড়াতেই ফিরে আসে। মগের মুলুক ছাড়া আর কোথায় বাস্তব্য করবে? কলকাতায় কি থাকতে পারি আমরা? না, আর কোনো শহরে? যাই আমাদের আইন-কানুন হোক, যাই আমাদের বিধি-ব্যাপার, আমাদের মুলুক আমাদেরই রাজত্ব। হয় এ-পাড়া নয় ও-পাড়া। যেমন মনের মানুষ চাই তেমনি আবার চাই দলের মানুষ।

'কত রাত হল এখন?' চোখ বুজে আরেকটা হাই তুলল পঞ্চমা।

'মাঝ রাত।' ঝোপঝাড় দেখে পাড়ে নৌকো লাগাল রূপা। বললে, 'ঘুম পাচ্ছে? হাল ছেড়ে দাও এবার। ঘুমোও।'

'ঘুম পাচ্ছে না।' পঞ্চমার কথা অভিমানে ভরা।

'তবে বাইব আরো নৌকো?'

'না।'

'তবে?'

'এবার তোমাকে ধরা দেব—'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রূপা। বললে, 'না। এখনো আরো এক কিস্তি বাকি আছে। যা নিয়ম তাই মানতে হবে। নিয়ম না মানলে শান্তি নেই। সকলের চেয়ে দামী হচ্ছে শান্তি—'

কবে সেই শেষ কিস্তি আসবে কে জানে? নিয়মের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। পরের রাত কবে আসবে তাই ভেবে আজকের এই রাত উড়িয়ে দিতে হবে? না দিলে কি হয়? কে জানতে আসছে?

'বুদ্ধু মানু' সব জানছেন। সব দেখছেন। হিসাব রাখছেন।

'ঘুম যদি না পায়, তবে নাও বিড়ি খাও।' পিরানের পকেট থেকে রূপা

গোলপাতার বিড়ি আর দেশলাই বের করে দিল। বললে, 'ফারাতারার দয়ায় রাত দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

দেখতে দেখতে কাটল না। দু'-দুটো ছিপ নৌকো ছিপ-ছিপ করে দাঁড় ফেলে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল তাদের।

একটা শোরা সর্দারের ছিপ, আরেকটা চাজার। সঙ্গে কতগুলো মর্দ-মাতব্বর।

'এবার আমি মেয়েটাকেই কেটে ফেলব।' হামলে উঠল চাজা। 'চিঁড়ে করবার জন্যে নয়া ধান কিনতে হাটে পাঠিয়েছিলাম— সেই ফাঁকে—'

ছেনি সঙ্গে আনতে দেয়নি শোরা। মাঝে পড়ে নিরস্ত করলে চাজাকে। বললে, 'উঃ, মারবি কেন? পালানোটা ভেস্তে দিলি, তাইতেই তো কাজ হল।'

পরে রূপাকে শাসন করলে। 'এত হন্যে হওয়া কেন? আর দেড়-দুই বছর অপেক্ষা করতে পারিস না?'

মাথা হেঁট করল রূপা। যেন ওদের কাছে নয়, নিজের কাছে পরাজয়ে। সত্যি, এত সংযম দেখাতে পারে সে, আর এটুকু পারে না? ঘন হয়ে কাছে বসে স্থির থাকতে পারে, আর ফারাক হয়ে দূরে বসে স্থির থাকতে পারে না? সান্নিধ্যে শান্তি আর অদর্শনে উৎকণ্ঠা?

আর, দেড় কি দু'বছর! এইটুকু সময় একটু ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেই তো সর্বসিদ্ধি। সত্যিই তো! এত সয়, আর এটুকু সইবে না?

ওদের সঙ্গে সঙ্গে সময়কেও তার শত্রু মনে হয়। মনে হয়, যত শিগগির পেঁছুনো যায় মন্দিরে। পঞ্চমার কথা মনে হলে সময়ের আর দিশপাশ থাকে না। মনে হয়, আর কাউকে নয়, এই সময়কেই জয় করি। এই সময়কে জয় করবার জন্যেই ফারাতারা বেরিয়েছিল ঘর ছেড়ে।

বাইশতলির মোড়ে এসে পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

ডাকবাংলো ঘুরে যে রাস্তা সেই পথ ধরলে চাজা। পঞ্চমার বাঁ-হাত মুঠ করে চেপে ধরা ডান হাতে।

'ছেনি সঙ্গে নিতে দেযনি শোরা সর্দার। কিন্তু বাড়িতে আছে। কাটা-কোটা সব এই ছেনিতে। এই ছেনি দিয়েই আজ কাটব তোকে বাড়িতে গিয়ে। আজ মদ খাওয়া নেই যে, হাত পিছলে যাবে। কেটে পুঁতে রাখব তোকে মাটির তলায়। কুমিরের মুখে ধরে দিয়ে আসব নদীতে।'

পঞ্চমার মুখে রা-শব্দ নেই। কোন সনের কোন তারিখে তার জন্ম, বাপের

শোনা কথায় তারই হিসেব করে মনে-মনে। মা নেই যে মনের দুঃখটা বুঝবে। জন্মের তারিখটা ঠেলে পেছিয়ে দেবে এক কথায়।

'তোকে নিয়ে আমার প্রচণ্ড কলঙ্ক! জাত-জ্ঞাতের মজলিশে মুখ দেখানো অসম্ভব। তোকে আমি আর বাড়িতে তুলবো না, দেব না খেতে-পরতে। তাই বলে ওই শুয়োর মুখোটার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেব ভাবছিস? কখনো না। তোকে আমি কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব। যে মেয়ে সংসারের সুসারে আসে না, তাকে দিয়ে কী কাজ?'

কতদূর যেতেই মারফৎ সেখের সঙ্গে দেখা। মারফৎ সেখ ডাকবাংলার চৌকিদার।

কিন্তু অমন গোঁজ হয়ে বসে আছে কেন গাছতলায়?

'কি মিয়া, বইয়া আছে ক্যান?'

মুসলমানদের বাঙালি বলে মগেরা। এই বাঙালিদের প্রতিবেশিতায় বাস করে-করেই কিছু কিছু শিখেছে ভাঙ্গা বাংলা।

মুখ তুলে তাকাল মারফৎ। চাঁদের বাসরে এ সে দেখছে কি চোখের কাছে? এ যে হুরকুমারী।

'কাঁদিছে না কি? এত রাতে বাইরে আসিছে ক্যান? কী অইছে?'

চৌকিদার সংক্ষেপে বললে তার বিবরণ। তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘর থেকে।

এই মাঝরাতে? কেমন খটকা লাগল চাজার। অপরাধ?

অপরাধ সাংঘাতিক। জেলার লালমুখো বড় কর্তা এসেছে। উঠেছে ডাকবাংলায়। দুপুরে শিকার করেছে পাখি-পাখাল, এখন মাঝ রাতে তার অন্য রকম শিকার চাই। সন্ধে হতেই লাল জল খাচ্ছে বোতলে-বোতলে। এখন একেবারে লেলিয়ে উঠেছে। বলছে, যদি না আনতে পারিস গুলি করব।

এখানে এ সব মিলবে কোথা? যারা এখানে এ-মর্মে আসে তারা নিয়ে আসে খুশিমত। এখানে যা দু'-একটা আছে ইধার-উধার তারা আঘাটের মড়া। এমনিতে গুলি করে মারবে, আর ও এনে সামনে ধরলে মারবে কুপিয়ে-কুপিয়ে।

'কয় কি, মগনি চাই। আমি এত বড় করিয়া জিব্‌ভা কাডি। তোবা করি। কই, মগেগো মদ্যে এমুন বেচাল নাই। হ্যা গো মাতারিরা যদি এদিক-সেদিক কাণ্ডও কিছু করে সমাজের বাইর অইয়া যায় না বিয়া পায়। তাও নিজেগো মদ্যে কাণ্ড— এমুন অচরিত কাণ্ড নয়—'

কে শোনো কার কথা! বলে বারো জঙ্গল তেরো ভুঁই খুঁজে আনো। নইলে খুলি উড়িয়ে দেব। যাও, রাত বারোটা পর্যন্ত তামাদি।

'আমারো বারোটা বাজল। কই পামু কও? পান লইয়াই বইয়া থাকো ছায়েব, ভান্ডে চুন নাই। কইতে গেছি অপারগের কথা, বন্দুকের ডগা দিয়া না মারিয়া কুন্দা দিয়া মারছ্যে। একই অবোস্থা আমার— খুলিটা আর আস্তা নাই। বাড়ির থিক্যা বাইর করিয়া দিছে। চাকরিডা শ্যাষ করছে এক কলমে—'

হঠাৎ গলা নামাল চাজা—খাদ্য-খরচ কত?

লাফিয়ে উঠল মারফৎ। তেমন জিনিস হলে ইনাম-- সে একটা প্রকান্ড টাকা। কানে-কানে বলল মারফৎ। দালাদালির ভাগ নেবে না সে। তার চাকরিটি বজায় থাকে, এই তার যথেষ্ট দালালি।

ফারাক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে পণ্ডমা। চাজা একবার তাকালো তার দিকে। এই অলপ্পেয়ে অলক্ষ্মী মেয়ে দিয়ে তার কি হবে? এক পয়সার সাশ্রয় করতে পারল না! শুধু উড়নচড়ে হয়ে ঘুরে বেড়ানো।

এমনিতেও খাস্ত, অমনিতেও খাস্ত। তবে মিছিমিছি শস্তায় বিকোনো কেন?

চাজা রাজি হয়ে গেল।

ভাঁওতা দিয়ে পণ্ডমাকে নিয়ে আসা হল ডাকবাংলায়। কঠিন একটা কিছু শাস্তি তাকে নিতে হবে, এমনি একটা কিছু আঁচ করেছিল সে। পাকা-পোক্ত কোনো ঘরে চিরকালের জন্যে আটকে রাখবে হয়তো। হয়তো কুড়ি পেরোবার আগে আর ছাড়া পাবে না।

কিন্তু এমন ভীষণ একটা কিছু হবে, এ সে কল্পনাও করতে পারেনি। এর চেয়ে জ্যান্ত বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া ভালো ছিল। ঢের ভালো ছিল খন্ডখন্ড করে কেটে ফেলা।

এমন কান্ড সাহেব পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেনি।

প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে উঠল পণ্ডমা। কিন্তু অত দূরে, বসতির বাইরে নির্জন নদীর নিরালায় কে শোনে সেই আর্তনাদ?

কিন্তু কান খাড়া করে চাজা তো একবার শুনল।

ধমকে উঠল মারফৎ সেখ: 'তুই আর দাঁড়াচ্ছিস কেন? মুঠ ভরে টাকা পেয়েছিস, একটা বোতল পেয়েছিস আস্ত, সটান বাড়ি চলে যা। ফজরে পাঠিয়ে দেব মেয়েকে।'

সেই রাত কখন পোহালো খোঁজ রাখেনি চাজা।

পঞ্চমা আর বাড়ি ফিরতে পেল না। লঞ্চে করে সাহেব তাকে নিয়ে এল সদরে। সেখানে লুঙ্গি ছাড়িয়ে ফ্রক পরালে, জুতো পরালে—এমন এক পিঠ সোনার চুল—তাও ছাঁটালে ঘাড় ঘেঁসিয়ে। মেমসাহেব বানালে। অবশেষে চালান করে দিলে কলকাতায়।

আর এই কলকাতায়, ওয়েলেসলির ওদিকে, একটা কুচ্ছিত গলিতে গুমসা বাড়ির মধ্যে সতীশ কাউরের সঙ্গে তার দেখা হল।

সতীশ তালাপাড়ার হরিশ কাউরের ছেলে। মগপাড়ার বন্দরে নতুন মনিহারী দোকান দিয়েছে, তাই সওদায় এসেছিল কলকাতায়। উঠতি বড়লোক হয়েছে, তাই এখন ওড়বার সখ। একটু না বখলে যেন বড়লোকির মানে হয় না। আর বড়লোকিটাও বেশ উঁচু জাতের। দেশী জিনিসে মন ওঠে না, তাই বিলিতির খোঁজে এসেছে এ-পাড়ায়।

ঠিক ষোল আনা হবে না। ছ-সাত আনা হতে পারে।

কি, ট্যাঁস ফিরিঙ্গি?

না, বর্মী।

মন্দ কি, মনে-মনে হিসেব করল সতীশ। যা নতুন না-জানা তাই ষোল আনা।

ঘরে ঢুকেই সতীশ বললে, 'তুমি তো বর্মী নও, তুমি মগনি। তাই না?'

পঞ্চমা হাসল করুণ করে। বললে, 'উঃ, কেমন করিয়া বুঝিছে!'

আহা, সেই মগী বাংলার টান! সেই অপরূপ মিঠানি! বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল সতীশের। হাত বাড়িয়ে হাত ধরল পঞ্চমার। 'আরে, তুমি যে দেখি আমাগো দেশদেশী মানুষ। কও এখানে আইলা কেমনে?'

'সেই কস্তের কথা হুনলে তোমরা কাঁদিবে।' দু'চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল পঞ্চমার। যেন কত কালের চিন-পরিচয়ের লোক এমনি ভাবে অকপটে বলতে লাগল তার দুঃখের কথা, তার অপমানের কাহিনী—

আর সেই ভাঙা-ভাঙা মগী বাংলায় চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মেঘলা আকাশ, ফণা-তোলা নদী, ঢেউ-খেলানো অঢেল ধানখেত।

ঝাপসা গল্প-কথা যা শুনেছিল সতীশ, তাই এখন এই ঘরের দেয়ালে স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ ইতিহাস!

যে মেয়েকে নিয়ে সমস্ত মগ-মুলুকে কলঙ্কের আগুন জ্বলেছিল সেই এখন একটি মলিন বাতি হয়ে মিট-মিট করছে!

হঠাৎ সতীশ পঞ্চমার দুই হাত আঁকড়ে ধরল : 'এই ইট-ইমারতের দেশ ছাড়িয়া যাইবা সেই নিজের দ্যাশে?'

পঞ্চমা হাসল।

ছিলাম রাজকন্যা এখন হয়েছি জলার পেত্নি. আমাকে কে জায়গা দেবে?

'আমি জায়গা দিমু। আমার লগে থাকবা—'

পঞ্চমা মাথা হেঁট করে রইল।

কিন্তু এমন কীর্তি করতে পারলে কত উঁচু মাথা সতীশের! কত নাম-ডাক! কত বড় কেরামতি! জেলার ইংরেজ কলেক্টর যাকে এক দিন গুম করেছিল তাকে সে উদ্ধার করে এনেছে! উদ্ধার করে এনেছে তার নিজের দেশে, নিজের এলেকায়। আর কেউ জায়গা দেবে না, সে দেবে। রাখবে তার নিটুট হেপাজতে। থাকবে বুক ফুলিয়ে, ডঙ্কা মেরে।

কত বড় সুনাম! দুর্নামের সুনাম! দুর্নাম না হলে বড়লোক হবার মাহাত্ম্য কি!

'কি, কথা কও না দেখি। ডর করে না কি আমারে?'

না, পঞ্চমার আবার ভয়-ডর কি। সে বাঘের সঙ্গে লড়েছে, কালকেউটেদের সঙ্গে। মানুষের কোনো বিশ্বাসঘাতকতায়ই তার আর ভয় নেই।

'তবে? নিজের দ্যাশে ফিরতে সাধ হয় না?'

আথাল-পাথাল করে। এত দিন কেউই শোনায়নি তাকে তার দেশের কথা। তার যে একটা গত জীবন ছিল তার আনন্দের কথা। সেই সুতো ধরে আবার কি তার সেই আশার রাজ্যে স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে যেতে পারে? তা কি সম্ভব?

টলটলে ভাসা-ভাসা চোখ তুলে তাকাল পঞ্চমা। বললে, 'আমরা লইতে মনা আছে?'

কি বলো! মন নেই তো তোমার কাছে এসেছি কেন? কেন বসে আছি এতক্ষণ?

'আমরা বিয়া লইবে তোমরা?'

এ আর বেশি কথা কি! এ তো আরো জমকালো হবে! একসঙ্গে থাকতে পারব, আর ঐ একটা ঘটা করতে পারব না? বরং ঐ ঘটাটা হলেই তো ঘটনাটা আরো চমকদার হবে।

'করমু, বিয়া করমু তোমারে।'

বিয়ের নামে গলে গেল পঙ্গমা। বুকটা ভরে উঠল। কত দিন থেকেই তার একটা বিয়ে পাওয়ার সাধ। কতদিন থেকে!

বিদেশীর হাতে তার জাত ভেঙেছে। কোনো মগের সঙ্গে আর তার এলাকা চলবে না। এখন যদি আর কেউ বিদেশী তাকে আশ্রয় দেয়, তবেই সে ছাড়া পায় এ দেশ থেকে।

সতীশ বিদেশী কোথায়? এক ভাষায় কথা বলে তারা। থাকে পাশাপাশি গাঁ-গেরামে। হাল-চাল সব জানাশোনার মধ্যে। ও তো বান্ধব!

এক দিনেই তো আর বিশ্বাস হয় না! ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে লাগল সতীশ।

'এত আওন-যাওনে কাম কি! আজিকালিই লইয়া চল।'

পোশাক পালটাল পঙ্গমা। ফ্রক ছেড়ে লুঙ্গি পরেছিল ফের, এবার লুঙ্গি ছেড়ে শাড়ি পরলে। কপালে-মাথায় সিঁদুর দিলে। পায়ে আলতা।

'আমরা তো আর তোমাগো দ্যাশের বাঙালী না. আমরা হিঁদু। আমাগো সিঁদুর পরলেই বিয়া।'

'হে আমরা জানিছে—' আহ্লাদ আর ধরে না পঙ্গমার।

পতিত ছিল এক নিমিষে হাসিল হয়ে উঠল।

ফিরে চলল দক্ষিণের চরে। তার নতুন সংসারে।

যে বন্দরে সতীশের মনিহারী দোকান সেই বন্দরে সে আলাদা ঘর ভাড়া নিলে। চার চৌহদ্দির বেড়া উঁচু করে তুলে দিলে। মেরামত করালে ফাঁক-ফোকর। অন্দরের বউ করে রাখল পঙ্গমাকে।

চার দিকে ডামাডোল পড়ে গেল। সেই পঙ্গমা শহর ঘুরে সরম খুইয়ে বউ সেজেছে।

মগ-পাড়ার মাতব্বররা ফরমান ঝাড়ল যদি কোনো পাড়ায় এসে সে ঢোকে তবে তাকে 'দাওয়া দিয়া কাটা করিব।'

তবু হাটে-ঘাটে এদিক-ওদিক সবাই উঁকিঝুঁকি মারে—যদি একটি বার দেখতে পায় পঙ্গমাকে। কেমন তার দশা হয়েছে দেখি। বিবি থেকে বউ হলে তাকে কেমন দেখায়!

কিন্তু, সূর্য্যিই তার মুখ দেখে না, বাইরের মানুষে দেখবে কি! ঘরের ছুটুলে বউয়ের মতই সে পর্দার জিম্মায় বন্দী আছে।

চাষাভুষোর মেয়েছেলে তবু কেউ আসে দুপুরে। বলে, আমাদের কি। বিয়ে যখন হয়েছে বলছে, তখন এ তো গেরস্থ-বাড়ি। গেরস্থ-বাড়িতে ঢুকতে আপত্তি নেই। আলগা হয়ে বসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প বলা শুধু।

কিন্তু কি গল্প করবে! পণ্ডমার কিছু বলবারও নেই, জানবারও নেই। একতরফা কতক্ষণ চোপা চালানো যায়!

না, বলবার কিছু না থাক, জানবার আছে। সেদিন অনুভব করল পণ্ডমা। যেদিন, মগ-পাড়ার আর কোনো জননা নয় মণ্ডিন এল দেখা করতে।

'রূপা কোথায় আছে? বিয়ে করেছে?' সব কথা থুয়ে প্রথমে এই প্রশ্নই জিগগেস করলে পণ্ডমা।

রূপা? না, বিয়ে-থা করেনি। ফুঙ্গি হয়েছে। ঠিক গেরুয়া তো নয়, হলদে নিয়েছে। আফিং খায় আর ও-পাড়ার ঠাকুরবাড়িতে পড়ে থাকে।

খাওয়া-দাওয়া চলে কোথায়?

যেমন চলে ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ির পাঠশালাতে ছেলে পড়াতে হয় বৈ কি। তারা ফুঙ্গির জন্যে বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসে। ছুটির দিন কাঠের কৌটো করে ভাত ভিক্ষে করে বেড়ায়।

ও সংসার ত্যাগ করলে কেন?

কে জানে!

ঠাকুরবাড়ি খালি পেল কি করে? আগের ফুঙ্গির হল কি? মরেছে?

না। ফুঙ্গি ভেঙে সংসারী হয়েছে। মিলেছে না কি মনের মতন মাতারি। হোক বুড়ি-ঝুড়ি, তবু মনের মতন!

কিন্তু তাই বলে তার জায়গায় ও বসতে গেল কেন? সংসারের সুখ ওর উঠে গেছে না কি? কেন এল ও এই কঠিন কষ্টের মধ্যে? ওর কিসের অভাব? কিসের অশান্তি?

'ওর কথা তোর কাছে কে বলতে এসেছে?' মণ্ডিন বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠল। পরে আবার স্নেহের ভঙ্গীতে নরম হয়ে বলল, 'শোন, আমি যার জন্যে এসেছি,—'

তোর বাপ তোকে ডেকেছে। নিশ্চয়ই ঘরে নেবে বৈ কি। মেয়েকে ফেলবে কোথায়?

তবে সেই ঘর-দুয়ার আর নেই।

'কি হল?' শুকনো চোখে তাকিয়ে রইল পণ্ডমা।

দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হয়ে গেছে। জোত-জমিটুকু আগেই গিয়েছিল— এখন ঘর-দুয়ার গেল।

'তোমরা তবে এখন আছ কোথায়?'

সেই কথাই তো তোকে বলতে এসেছি। তোর বাপ ডাক-বাংলার চৌকিদার হয়েছে। এক রকম তোর জন্যেই হল। তোর আশাতেই হল। বরাবরই বলে এসেছে, ফিরে আসবে পঞ্চমা। বাপ-মায়ের টান না থাক, মাটির টান থাকবেই—

দু' কানে দুই আঙুল দিল পঞ্চমা।

'তুই আয়। বাপের উপর রাগ করতে নেই। এখন আর রাগের আছে কি! চল, স্বাধীন মতো থাকবি। তোকে ছাড়া চলবে না। আমাদের কি আর রূপ আছে, না বয়স আছে?'

এমন কুকথা মুখে এনো না। আমি এখন বিয়ে বসেছি। স্বামী পেয়েছি। আমার ঘর-বাড়ি হয়েছে। যাও, নিজের পথ দেখ— আমার ঘরের মানুষ এখুনি এসে পড়বে।

বলে ঘরে গিয়ে কপাট দিল পঞ্চমা।

মণ্ডিন চলে গেলে আয়না নিয়ে বসল চুল বাঁধতে। সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দিলে। কপালে বসালে মস্ত এক ভাঁটা।

তার পরে ঘরের এক কোণে যে ছোট্ট একটু পূজার আসন বসিয়েছে তার সামনে বসল সে শান্ত হয়ে। আর-আর দিন ঢিপ করে একটা প্রণাম করেই সে উঠে পড়ত। আজ, কেন কে জানে চুপচাপ একটু বসল চোখ বুজে।

সে যে নতুন স্থান পেয়েছে, নতুন ধর্ম, তাই মনে-প্রাণে প্রমাণিত করতে সে ব্যস্ত।

সতীশকে বলেছিল, ঠাকুর নিয়ে আসতে হাট থেকে। সতীশ এক মাটির শিবমূর্তি নিয়ে এসেছে। বেশ, নাদুস-নুদুস আত্মভোলা মূর্তি। বেশ শান্ত সুস্থির মুখের ভাবটি। চেয়ে থাকতে-থাকতে প্রাণের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। কিছু না-চাওয়ার না-পাওয়ার শান্তিতে ভরে যায়। মনে হয় এও যা, ফারাতারাও তাই।

এক দিন তাই জিগগেস করলে সতীশকে: 'উঃ, আমরা ফারাতারাকে তোমরা মানিছে?'

সব মানি। আবার কিছুই মানি না।

'না মানলে তোমাকে ঘরে আনলাম কেন? আর, যদি মানবই ষোল আনা—'

কোথাও শান্তি নেই।

যুদ্ধ বাধলো।

দিকে-বিদিকে সৈন্য বেরিয়ে পড়ল দলে-দলে। শহরে-গাঁয়ে, চরে-বন্দরে। বাড়ি-দখলের হিড়িক পড়ে গেল।

বেশি পিড়াপিড়ি করতে পারে না, তবু আরেক বার মনে করিয়ে দিল পঞ্চমা। এবার একবার গেলে হত না শহরে? রেজেস্ট্রি অফিসে? কাজির দরবারে?

তাই যাব আজ। রাত্রের ইস্টিমারে। তুমি সাজগোজ করে তৈরি হয়ে থাকো।

সাজগোজ করে তৈরি হয়ে রইল পঞ্চমা। ইস্টিমারে ভোঁ দিল। তবু সতীশের ফেরবার নাম নেই।

কি করে ফিরবে! বাড়ি-দখলের অর্ডার হয়ে গেছে আজ থেকে। দু'জন অফিসরের থাকবার জায়গা হয়েছে এখানে। সতীশ শুধু শূন্য বাড়ির দখল দেয়নি, মালামাল সহ দরবস্ত হক-হুকুকের দখল দিয়েছে।

বাড়ির দাম পরে মিলবে, অস্থাবরের দাম নিয়েছে আগাড়ি।

সেবার কেঁদেছিল ভয়ে, এবার কাঁদিল দুঃখে। যন্ত্রণায়। প্রবঞ্চনায়।

মানুষের বিশ্বাসঘাতকতাকে আর ভয় করবে না এমনি স্পর্ধা করেছিল পঞ্চমা। কিন্তু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কী চেহারা তা সে কল্পনা করতে পারেনি।

ছাড়া পেলে শেষ রাতের দিকে। পিছনের দরজা খুলে পালাল আলগোছে। কোথায় যে যাবে কিছুই জানে না। সামনে যে একটা ঝোপঝাড় পেল তার মধ্যে গাঢাকা দিলে।

ভোর-ভোর রাতে রওনা হল সামনের পথ দিয়ে। একেবারে নাক-বরাবর। যেখানে গিয়ে পেঁছয়।

পেঁছুলো গিয়ে শোরাপাড়ার ঠাকুরবাড়িতে।

তখনো ভোর হয়নি স্পষ্ট হয়ে। পাখি-পাখালি ডাকতে সুরু করেনি। দেখল, ঠাকুরবাড়ির মেঝের উপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে রূপা।

পায়ের কাছে বসল পঞ্চমা। শান্ত হয়ে বসল চুপ করে।

শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, অসহ্য যন্ত্রণা— তবু মনে হ'ল আর দুঃখ নেই, ভয় নেই— কিছু চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখ, কিছু পেয়ে হারানোর ভয়। যেন আর লাঞ্ছনা নেই, বঞ্চনা নেই। অন্তরে শুধু নীরবতা আর নিবৃত্তি।

তাকাল একবার বুদ্ধমূর্তির দিকে। নীরবতা আর নিবৃত্তির দিকে।

কতক্ষণে ঘুম ভাঙবে না-জানি রূপার! ধৈর্য ধরে বসে রইল পঞ্চমা। ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

লোকজন আর নেই ঠাকুরবাড়িতে। এদিক-পানে সুরু হয়নি হাঁটা-চলা। সবখানে শুধু ধৈর্য আর স্তব্ধতা। কতক্ষণে সূর্য উঠে পড়ে সমারোহে। কতক্ষণে ঘুম ভাঙে।

যদি আর একটু ধৈর্য ধরতে পারত পঞ্চমা। যদি আর দেড়-দুই বছর! কুড়ি যদি পুরতে দিত! সেই তো এল ঠিক মন্দিরে, কিন্তু কী ভাবে কি হয়ে এল!

তাকাল আরেক বার ঠাকুরের দিকে। কত কাল ধরে বসে আছে ধৈর্য ধরে। সমাহিত হয়ে!

ঘুম ভাঙল রূপার! কিন্তু চোখের সামনে এ কে!

'আমি। পঞ্চমা।'

'তা জানি। জানি, আমি যখন ঠাকুরঘরে এসেছি তখন তুমিও আসবে। আমাদের ঠাকুরঘর ছাড়া আর জায়গা নেই।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পঞ্চমা।

'তোমার কুড়ি বছর এখন পেরিয়ে গেছে, না? সেই কুড়ির পরও আমাদের আবার দেখা হল।'

ফুঁপিয়ে উঠল পঞ্চমা।

'এমনটা হল কেন জানো? ধৈর্য ধরতে পারিনি বলে। সংযম যদি বা ছিল, ধৈর্য ছিল না। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ কি? কান্না কিসের? এখনো ঢের সময় আছে ধৈর্য ধরবার।'

আমি এখানে থাকব। ঠাকুরঘরে— ঠাকুরঘরের দাসী হয়ে।

নইলে আর যাবে কোথায়? আমি ছাড়া আর কে তোমাকে রক্ষা করবে? ঠাকুরঘর ছাড়া আর কে দেবে তোমাকে অব্যাহতি?

'কিন্তু বলো, ঠাকুরঘরের দাসী নয়, ঠাকুরের দাসী।'

'ঠাকুরের দাসী।' আবৃত্তি করল পঞ্চমা।

ঠাকুরই আরাম দেবেন, আরোগ্য দেবেন, নব জীবন দেবেন।

'নব জীবন সত্যি চাও পঞ্চমা?' পরিপূর্ণ স্নেহে পঞ্চমার মুখের দিকে তাকাল রূপা : 'তবে বলো তো, ফুঙ্গি ভেঙে দিই? ফিরে যাই সংসারে। আজ আর আমাদের কে ঠেকায়, কে আটকায়।'

তেমনি প্রগাঢ় স্নেহেই দৃষ্টি প্রত্যর্পণ করল পঞ্চমা। বললে, 'না। আমাদের নব জীবন এই ঠাকুরঘরে। বুদ্ধদেবের পদতলে।'

খরা বিয়ে

বরযাত্রী এসেছিলো ভক্ত। বঙ্কলালের বিয়েতে। কাজীপাড়ায়।

কাঁসি আর ঢাক, খোলা গ্যাস আর শামিয়ানা, ছেঁড়া পাতা নিয়ে লেড়িকুত্তার সঙ্গে পাতিকাকের ঝটাপটি। মালসাতে টিকে-তামাক, সরাতে পান-চুন, কটরাতে চিকি-সুপুরি। কলসী, মুচি, তিজেল, ধুনুচী...

সব আবছা-আবছা। মনের মধ্যে এ'টে আছে শুধু সেই মেয়েটার নড়াচড়া। হেলা-দোলা। আঁচল অসামাল করে ছুটে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। কখনো ফরসিতে টান মারা, কখনো বা ডাবা-হুঁকোয় ছুঁচলো করে ঠোঁট রাখা। ধোঁয়া ছাড়া। ঘাসের মতো পান চিবোনো। শব্দ করে পিক ফেলা। বারে-বারে নিচেকার ঠোঁট উলটিয়ে দেখা। শাড়ির এখানে-ওখানে পানের ছোপ লাগানো। ফক্কড়, ছ্যাবলা মেয়ে। মনে লেগে আছে তার সেই পান-খাওয়া লাল দাঁতের হাসি, সেই ফিচকেমি।

তিন বারের চেষ্টায়। প্রথম বার বাস্ যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকেই ফিরে গিয়েছিলো। দ্বিতীয় বার বাস্ যখন সোদপুর ঘুরে চলেছে মধ্যমগ্রামের দিকে, তখন। ব্যারাকপুর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত কলকাতা-কলকাতা মনে হয়েছে, কিন্তু যেই সোদপুরের ক্রসিং-লেভেল পেরিয়ে চলেছে মেঠো রাস্তায়, অমনি কেমন ধুকপুকিয়ে উঠেছে বুক। বাঁধকে। নেমে পড়েছে উজবুকের মতো। কিন্তু এবার, তিন বারের বার, সে ঠিক চলে এসেছে উজোন ঠেলে। এই কাজীপাড়া।

নেমে পড়ে মনে হয়, এসেছে কেন? কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, নতুন-নতুন লাগে। অচেনা-অচেনা। সব ভুলে গেছে, কোথায় সেই পানের বরজ, সেই রামধন-চাঁপার গাছ। ভোলেনি শুধু সে চাঁপাগাছের টকটকে হলদে ফুল, ভোলেনি সেই পান-খাওয়া লাল দাঁতের হাসি।

যদি কোনো ফাঁকে দেখা হয়ে যায় সেই হাসির সঙ্গে।

আসা-যাওয়ায় বাসে-ট্রামে মোটমাট প্রায় তিন টাকা খরচ। কত খুটে-খুটে এই টাকাটা সে জমিয়েছে। কত চুরি-চামারি করে।

'কত্তা', কাকে সে ডাকে, 'এই গাঁয়ে তুমি থাকো?'

'হাঁ, কেন?'

'কী করো তুমি?'

'জমিদারের তৌনিতি।'

'চলেছ কোথায়?'

'সুধন্য পালের বাড়ি চেন?'

'চিনি বৈকি। সরাসর রাস্তা, চলে যাও সিধে। গোঁসাই মণ্ডল সারদা কুলে, পরেই সুধন্য পাল।'

ঠিক। সেই রামধনচাঁপার গাছ। দূরে সেই স্থলপদ্ম। শাদা ফুল লাল হয়ে এসেছে।

ঘুরঘুর করছে। ছোঁকছোঁক করছে। তাকাচ্ছে ইতি-উতি। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। ধারে-কাছে কোথাও একটুও ছায়া নেই।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভূতের মতো?

সেই ছটফটে চুলবুলে মেয়ে এতক্ষণ ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে এই-ই বা কে ভাবতে পেরেছিলো? কেনই বা যে থাকবে না তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাই তো স্বাভাবিক।

'কে ওখানে?'

'আমি।'

'বাড়ি কোথায়?'

'বড়শে—পশ্চিম-বড়শে।'

'সে কোথায়?'

'বেহালা-বড়শে।'

'ও বাবা! তা এখানে কি?' বাড়ির ভিতর থেকে কে-একটা লোক বেরিয়ে আসে।

'বেড়াতে এসেছি।'

'কার বাড়ি?'

'বাড়ি নয় কারুর, এমনি।'

লোকটা তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। যেন ছাঁচে ফেলে হাতের আদরে গড়েছে সে মুখ। টানা চোখ, টিকলো নাক, টাটকা স্বাস্থ্য। বয়েস একুশ-বাইশের বেশি নয়। খালি পা, খাটো ধুতি, বুক-খোলা আধা-শার্ট।

'নাম কী?'

'ভক্তদাস পাল।'

পাল? হ্যাঁ কুমোর সে। বাপ-মা কেউ নেই, মামার আশ্রয়ে থাকে। মামার নাম উত্তম পাল। হ্যাঁ, চাক ঘুরোয় সে। তার হাঁড়িকুঁড়ির ব্যবসা। মামার সে ডান হাত।

'তুমিও চাক ঘুরোও?'

'ঘুরোই বৈ কি। জাত-ব্যবসা।'

'কী গড়ো?'

'সব গড়ি। হাঁড়ি, কলসী, খুরি, গেলাস, প্রদীপ, কলকে—গাঁজার আর গড়গড়ার—তেলের বাটি. ছোপা হাঁড়ি, দোয়াত—সব। তা ছাড়া হাতের কাজ, মেয়েরা করে—সরা, মালসা, হাঁড়ি-কলসীর তলা—চাবড়ার মাটি দিয়ে—'

বুকের রক্ত চনচন করে ওঠে। কিন্তু কে জানে মন্ত্রবলে কথা জেনে নিয়ে চালাকি করছে কিনা। তাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগগেস করে ভিতরের খবর, ছোটখাটো বিবরণ।

না, হটে না ভক্তদাস।

আল-ওয়ালা মেশেল! চারহাতওয়ালা চাকা। শিলপিঁড়ির উপর বসানো। শিলের ত-র উপরে। পাকা আগা-বাঁশের লাঠি দিয়ে তৈরি চাক-নলি। চাকের মাথায় ছানা-মাটির মুঠম-হাত গাছ বসিয়ে থাবড়ে-থাবড়ে সমান করা। চাকের বিঁধেয় নলি ঢুকিয়ে বনবনিয়ে পাক খাওয়ানো। যাকে বলে নক্ষত্রবেগে ঘোরা। কাছেই পেনোর হাঁড়ি, আনিকানি সমান করবার জন্যে বাঁশের ফাঁপের উঁচো। আলগোছে কেটে নেবার জন্যে কলমের আগার মতো সুঁচলো চিমড়ি। সেই কেমন দুই হাতে ভামুর করে আনা, কাঁকড়ামুঠো হয়ে কানা তৈরি করা। হাত লাগিয়েছ কি, অমনি দলাছলা হয়ে গেছে। তারপর—

হটে না ভক্তদাস।

সন্দেহ কি, কুমোর, কুমোরের ছেলে।

হঠাৎ জিগগেস করে লোকটা : 'বিয়ে করবে?'

'বিয়ে? কাকে?' ভক্ত যেন মজা পায়।

'আমার মেয়েকে।'

যেমন ঝাকড়-মাকড় চুল, পাগল ঠাওরায় ভক্ত। বলে, 'তোমার মেয়েকে বিয়ে করবো কেন?'

'টাকা দেব।'

'তা, তোমরা কুমোর তো?'

'কুমোর বৈ কি। আলমান গোত্র। তা, জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি।'

'কী করো তবে?'

'চাষ করি। বিলেন জমি আছে। বরজ আছে পানের।'

'অনেক টাকা করেছ বুঝি?'

'তা মেয়ে বিয়ে দেবার মতো আছে কিছু মাধবের আশীর্বাদে।'

'কিন্তু মেয়ে কেমন? কালো কিটকিটে নিশ্চয়ই?'

লোকটা হঠাৎ ডাক পাড়তে শুরু করে: 'দিব্য, ও দিব্য, ও দিব্যি—'

ঘরের ছাঁচের নিচে দাঁড়ায় এসে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে। দাঁড়িয়ে আছে যেন কাঁপছে, ফেটে পড়ছে। চুল খসা, শাড়ি বেগোছ। শুধু মুখে লেগে আছে হাসি আর দুই ঠোঁটের ফাঁকে পান-খাওয়া সেই লাল দাঁত।

ভক্তের বুকের মধ্যে হামানদিস্তের ঘা পড়তে থাকে। যাকে চকিতে একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যে চলে এসেছে বিরানা জায়গায়, তাকে শুধু দেখে চলে যাওয়া নয়, বিয়ে করে গাঁটছড়া বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, এ যেন দেহে বসে কল্পনা করা যায় না। আজগুবি গাঁজাখুরি গল্পেও এমন কথা শোনেনি কেউ।

'কেন বাবা?' মেয়ে এগিয়ে আসে কয়েক পা।

'এই আমার মেয়ে, দিব্যমণি।'

দিব্যমণি। চন্দ্র-তারার সামিল।

ভক্তর চোখ জড়িয়ে আসে। মুখোমুখি তাকাতে পারে না।

'কে এই ছোঁড়াটা বাবা?' গলা বাড়িয়ে চিবুক তুলে জিগগেস করে দিব্যমণি।

'তুই যা বাড়ির ভেতর।'

'বয়ে গেছে। আমি এখন দলুইদের ঢেঁস্কেলে ধান এলাতে যাচ্ছি।' বলেই দে-ছুট।

ভক্তদাস গড় হয়ে প্রণাম করে সুধন্যকে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, 'আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

'কিন্তু আমি চিনতে পেরেছি গোড়াতেই। দেখেই মন ডাক দিয়ে উঠেছে এ একেবারে আপন হবার জন। কি, রাজি, বিয়ে করবে? পছন্দ হয়?'

চোখ নামিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ঝুরো মাটি খুঁটতে-খুঁটতে ভক্ত বলে, 'আমি কী জানি?'

'কে জানে?'

'মামা জানে।'

তখুনি লোক চলে যায় পশ্চিম-বড়শে, রুয়েডাঙায়। উত্তম পালের বাড়ি। লোক যায় সুধন্যর ভাই সৃষ্টিধর আর মান্দার কেনারাম দুয়ারী। সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয় সুধন্য। রাহা-খরচ তো বটেই, দরকার হলে দাদন পর্যন্ত। যেমন করে হোক উত্তমকে যেন নিয়ে আসে ধরে। যেন মেয়ে দেখে যায়। যেমন করে হোক। ছাড়াছাড়ি নেই।

ভক্তকে আটকে রাখে। যেতে দেয় না। বলে, 'আসুক তোমার মামা। লোক গেছে আনতে। তার মুখের হাঁ-না আদায় করে তবে অন্য কথা।'

নাক-বেঁধা পশুর মতোই নিজেকে মনে হয় ভক্তর। যা বলে তাই করে। গায়ে রগরগে করে তেল মেখে এঁধো পুকুরে স্নান করে। মাড় দিয়ে বাড়িতে-কাচা ফর্সা কাপড় পরে। খেতে বসে। জীবনে এত সব খাওয়া দূরে থাক, দেখেনি এক থালায়। ঝিঙেপোস্ত, বকফুলের বড়া, সরপুঁটির ঝাল, ঘুসো চিংড়ি দিয়ে কাঁচা আমড়ার টক। এক তিজেল পায়েস।

খাওয়ার পরে পান। ভেবেছিলো এবার অন্তত দিব্যমণিকে দেখা যাবে। কিন্তু কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে।

দলিজঘরের মাচার উপরে শুতে হয় তারপর। ঘুমুতে। খিড়কি দিয়ে মেয়েরা মফস্বলে যায়। সেদিক পানে জানলা। শুয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু দিব্যমণিকে দেখে না।

ভরাপেটের ঘুম। সন্ধের ঘাটে এসে ঠেকে। স্বপ্নের মতো মনে হয় এই সন্ধের আবছায়া।

কাটে রাত। নির্জীব অন্ধকারে।

পর দিন পয়লা বাসেই চলে আসে উত্তম। সঙ্গে পাড়ার কাঙ্গাল বর আর বাসুদেব পান্তি। চলে আসে টাকার গন্ধে, আরো টাকার গন্ধে। চোখে দস্তকী দেনদারের যত ভয় তার চেয়ে বেশি কাটকবুলে মহাজনের কাঠিন্য।

'আসুন, আসুন, গরিবের কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো পড়েছে আপনার—' সুধন্য আতিথ্যে নেতিয়ে পড়ে। কোথায় বসতে দেবে, কী খেতে দেবে—তার সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

আড়ে-ওড়ে কান পেতে থাকে ভক্ত। বিটকেল গোঁফে মামার মুখের চেহারাটা কেমন সদয় মনে হয় না।

'এমনি আড়কাটির কাজ চলে নাকি আপনাদের এদিকে?'

'তা যা বলেন! কিন্তু এমন ছেলে পেয়ে হাতছাড়া করতে মন ওঠে না। এমন চালাক-চোস্ত ছেলে—'

'কিন্তু মেয়ে আপনার শুনেছি তো কাণামেঘ—'

'তা একবার দেখুন না তাকে।' বলেই সুধন্য ডাক দেয় দিব্যমণিকে।

দিব্যমণির পাত্তা নেই।

'হলোই বা না মেয়ে আপনার ডানাকাটা পরী, তাতে কী? শুনেছি মাটির কাজের পাটই আপনাদের লোপাট হয়ে গেছে। তবে ঐ মেয়ে নিয়ে আমার লাভ কী? না পারবে মাটি হাতিয়ে কাঁকর বাছতে, না বা লাথিয়ে-লাথিয়ে মোলায়েম করতে। মোটা দানার বালিতে পা পিষে-পিষে পা খেয়ে যাবে না, পায়ে শুধু আলতা পরে থাকবে এমন বউয়ে আমার দরকার নেই।'

'উলটে তাই তো টাকা দেব আপনাকে। বাপ-মা নেই, ভাই-বোন নেই, ভক্তকে আমি ঘরজামাই করে রাখবো। দিয়ে দেব দু'দশ বিঘে জমি। পানের বরজ।'

'বা, বেশ আছেন খুশমেজাজে। বেল পাকিয়েই খুশি, আবাগে কাকের কথা ভেবে আর কী হবে? এতদিন ধরে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলাম যাকে, তার থেকে এই আমার নিটমুনাফা? যাক, ফিরতি বাস কতক্ষণ পরে-পরে আসে? কই রে ভক্ত?' উত্তম হাঁক পাড়ে হেঁড়ে গলায়, 'আয়, আর আটকে থাকতে হবে না তোকে।'

ভক্তর বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে। মামা তা হলে একা যাবে না তাকে সুদ্ধ নিয়ে যাবে। ইচ্ছে করে ঘাপটি মেরে থেকে নিঃসাড়ে সেও গা-ঢাকা দেয়।

কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন! ছায়ায় পর্যন্ত লাথি মারেন, এখন তার দরদ দেখ না! কোনো দিন খেতে-মাখতে পেল না। কোনো দিন দেখতে পেল না ভালো পয়সার মুখ। মুখ খেতে-খেতে জীবন গেল। এখন ন্যাকা-বুঝুতে এসেছেন। থাকবেই তো এখানে। পানের বরজ করবে।

শুধু খাটিয়ে মারা চৌপহর। নিয়ে আয় কোথায় আছে আঠুলে মাটি। নিয়ে আয় বাইন, পাকা তেঁতুলের কাঠ। নিদেন, জঙ্গলের কাঁচা গাছ।

নেল-কাদা দিয়ে খোল ল্যাপ্। পোন পোড়া রাত ভরে ইটের ঝিঁকের উপর হাঁড়ি বসিয়ে। অল্প-অল্প করে তাওয়া। নইলে ফেটে যাবে হুড়ুম-হাড়ুম করে। পরে তেজ বাড়া। খোলের মধ্যে জ্বলতে দে দাউ-দাউ করে। দেখিস আগুনের বে-তদবিরে একটা কানাও যেন না ফাটে। তারপর আঙরটানা দিয়ে আগুন বার কর। জাবখাওয়া গামলা দিয়ে মুখ ঢাক যাতে ধোঁয়া না ভিতরে যায়...

উঃ, সে কী বে-আক্কেল খাটনি!

না, যাবে না সে আর রুয়েডাঙায়। হাত দিলে ঝুরিয়ে যায় এমন রসা দো-আঁশ মাটিতে কচা পুঁতে পাটকাটির ভিতরে খড় দিয়ে বেড়া বেঁধে সে পানের বরজ করবে।

'কই রে ভক্ত, এলি?'

ঘাড় মোটা করে ভক্ত চুপ করে থাকে।

জেদ করে হবে না কিছু। হবে না তার একার জোরে। মামা রাজি না হলে সব ঘুঁটিই কেঁচে যাবে। তার তো আর দেবাংশে জন্ম নয় যে হাত বাড়িয়ে চাঁদের নাগাল পাবে!

চারে মাছও এলো, টোপও গিললো, কিন্তু মাছ গেঁথে খেলাবার সময় ডোর গেল ছিঁড়ে।

কাটান-পেঁচ আছে সুধন্যর সুতোয়। সৃষ্টিধর দিতে চেয়েছিলো আরো একশো, সুধন্য বাড়িয়ে দিল তিনগুণ। তাও রাজি হলো অনেক ধস্তাধস্তি অনেক হেস্তাহেস্তিতে। জানেনা ভক্ত তার মামাকে? পাকা হাড়, ঝুনো শয়তান। মাছ সাঁতলাবে তো তেল দেবে না। পিঁপড়ের গা টিপে-টিপে গুড় বার করবে।

আরো আছে লোয়াজিমা। বারবরদারী, আভ্যুদয়িকের খরচ, জাতকুটুম খাওয়ানোর খরচ—তার মানে আরো একশো।

ধরা বিয়ে যখন—সুধন্য তাতেই রাজি।

কখন যে মামা দিব্যমণিকে দেখে পছন্দ করে কে জানে! পানপাত্র লেখা হয়, সাক্ষী হয় কাঙ্গাল আর বাসুদেব, পাড়ার মুরুব্বি-মাতব্বর। তরশুই দিন আছে বিয়ের।

তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

খেয়ে-দেয়ে বিকেলের বাসেই যাবে না-হয় ভক্তদাস। ঘরজামাই যখন, তখন

এখন থেকে শিকড় গেড়ে বসলেই বা ক্ষতি কী! ট্যাঁকে টাকার টিপলির উপর হাত রেখে উত্তম বলে, বলতে পারে সহজে। •

কিন্তু মান তো আছে। তাই খেয়ে-দেয়ে ভক্ত ফিরবে। ফের আসবে চলন করে।

যাবার আগে আরেক বারটি দেখা যাবে না দিব্যমণিকে?

এ-কোণ ও-কোণ ঘোরে। উঁকি-ঝুঁকি মারে। তাকায় ঘাড় ঘুরিয়ে। কিন্তু দিব্যমণি উবে গেছে, গন্ধটুকুও টের পাওয়া যায় না। যেন বিয়েটাই স্থির, মেয়েটা স্বপ্ন!

তবু ফাঁকে চলে আসে মাঠের মধ্যে, ভেড়ির উপর দিয়ে। চলে আসে পানের বরজে।

শুনেইছে এত দিন, ভিতরে ঢোকেনি কখনো। পোনের আগুন নয়, নরম ছায়া-করা। গরানের ছিট আর লটা আখের মতো পেতেনের ডগা কেটে লাগিয়ে তার উপরে চাল ছেয়েছে, কেশেবন আর সরু খড়ে, লম্বায়-আড়ে চটা ফেলে। মিঠে-মিঠে রোদের আভা। লতা ডগিয়ে-ডগিয়ে যাচ্ছে নলের গা বেয়ে, গাঁটে-গাঁটে পান। ভক্তদাস চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। ফুল নেই ফল নেই মূল নেই—কেবল পাতা। কোনোটা তকতকে, কোনোটা বা বাতি। দু'এক পিল ভেঙে নিয়ে গেছে হয়তো। ইচ্ছে করে ছিঁড়ি একটা—

'কে রে ছোঁড়া? কী করছিস এখানে?'

ভক্তদাস চমকে চেয়ে দেখে দিব্যমণি। ভুরুদুটো বিরক্তিতে বাঁকা, চোখ-দুটো রাগ-রাগ। কিন্তু মুখের মধ্যে তেমনি পান ঠাসা। ঠোঁটের সীমানা ছাড়িয়ে পানের ছোপ তেমনি চলে এসেছে গালের এলেকায়।

যেন ফাল্গুনে হাওয়ায় ডগার মাথা ফেড়ে নতুন পল্লব গজাচ্ছে—এমনি মনে হলো ভক্তর। বলে, 'পানের বরজ দেখছি।'

'কেন, তোর কুমোরের চাক কি আর পাক খাচ্ছে না?' দিব্যমণি ঢুকে পড়ে বরজের মধ্যে।

ভক্তর চোখে খুশি উপচে ওঠে। 'বা আমি যে এখন পানের চাষ করবো।'

'কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে বুঝি। মারা পড়বি বলছি। তাঁত বুনে খাচ্ছিলি, তাই খা, কেন এঁড়ে গরু কিনতে যাবি? ভালোয়-ভালোয় বাড়ি পালা।'

ভক্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার চোখের খুশি টিমিয়ে আসে।

'বোস্ এখানে।'

ঘাস নেই, আগাছা নেই মাটির উপর চাপটি খেয়ে নিজেই আগে বসে পড়ে দিব্যমণি। ভক্তদাসও বসে দূরে-দূরে ভয়ে-ভয়ে।

দিব্যমণি খেঁকিয়ে উঠে : 'কেন এসেছিস এখানে? বিয়ে করতে? আমাকে বিয়ে করতে?'

'আমি তার কী জানি?'

'তুই বিয়ে করবি, আর তুই জানিস না! ঐ কেলোকিস্কিন্দেটা তো তোর মামা? ঐ কুঁদিকাটা মুষকি জোয়ান? যে টাকা নিয়ে গেল? হাম-হাম করে খেয়ে গেল থাবা-থাবা?'

'তোমার বাবা যদি বিয়ে দেন তো আমার মামার দোষ কী?'

'বড়সড় হয়েছি, বাবা আমার দেবেনই তো বিয়ে। কিন্তু তুই করবি কেন? তুই কি আমার যুগ্যি?'

ভক্তদাসের মুখে কোন কথা জুয়ায় না।

'তুই তো একটা বাঁদর। মুক্তোর মালা গলায় পরতে এসেছিস। চিনিস ঐ সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নেকে? কলকাতায় তালতলা না নেবুতলায় থাকে, কলেজে পড়ে, মোটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয়। কত বড়লোক, কাত্তিকের মতো চেহারা। তার কাছে তুই একটা কী! চিলের কাছে গঙ্গাফড়িং।'

'তা তোমার বাবাকে গিয়ে বলো না—'

'বাবা তো নয়, তালুই।'

'কেন তোমার মা মারা গেছে নাকি?'

'মা যদি মারা না যাবে তবে কেউ এমনধারা বিয়ে দেয়? খোঁজ নেই, খবর নেই কোথাকার কে-একটা অজাত-কুজাতের ছেলের হাতে এক কথায় মেয়ে দেয় গছিয়ে? আমি কি উড়ো খই যে গোবিন্দায় নমো করে দিলেই হলো?'

'সাঁতরা-বাবুর ভাগ্নের সঙ্গে তো আর তোমার বিয়ে হয় না!'

'তাই তোকে বিয়ে করতে হবে, না? কী আমার আব্দার! তুই যে চ্যাটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিস!'

না দেখে উপায় কী, এমনি অসহায় অগাধ চোখে চেয়ে থাকে ভক্তদাস।

দিব্যমণি একটু ঘনিয়ে আসে। বলে, কথায় যেন কোথায় একটু মিনতির সুর, 'দ্যাখ্, আমাকে বিয়ে করে তোর কিছুই লাভ হবে না—'

লাভ-লোকসান খত খতেনের ভক্ত কী জানে!

'কোনো কাজই জানি না আমি কুমোরের। আমি না পারবো মাটি হাতাতে, না-বা লাথাতে চেপে-চেপে। কাকে বলে সরা কাকে বলে মালসা, কাকে হাঁড়ি কাকে তিজেল, আমি কিছু জানি না।'

'আমি এখন পানের বরজ করবো।'

'তোর মাথা করবি। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করবি। পানের তুই জানিস কী, হতভাগা? ক'রকম পান তাই জানিস?'

'গাইতে-গাইতে গায়েন হবো।'

'কচু হবি। গোলাপের যেমন তোয়াজ লাগে তেমনি লাগে পানের। পারবি তুই তোয়াজ করতে? জানিস কি করে কাপি আর মুটে পুঁততে হয়? নল থেকে নাবিয়ে এনে মাটিতে লতিয়ে দিতে হয়? সরষের খোল গুঁড়ো করে ঢেলে দিতে পারবি গোড়ায়-গোড়ায়? বর্ষায় জলে বসে ভিজে জোঁকের মধ্যে পারবি তদবির করতে? দ্যাখ্, ফেন দিয়ে ভাত খাচ্ছিস তো খা, গপ্পে দই মারিসনে।'

'তুমি শিখিয়ে দেবে।'

'কী বুদ্ধি রে তোর বলিহারি! বরজের মধ্যে মেয়েরা আসে নাকি কোনো দিন? বরজ অশুদ্ধ হয়ে যায় না?'

হ্যাঁ. ভক্ত শুনেছে বটে এমন কথা। যেমন কুমোরের মেয়েরা চাক পারে না ছুঁতে।

'তবে তুমি এসেছ কেন?'

'আমি মানি না ওসব। তা ছাড়া তোকে ধরতে হবে তো নিরিবিলিতে।'

দিব্যমণি আরো এগিয়ে আসে। বলে, 'শোন. কলার ভেলা করে সমুদ্র পার হতে যাসনে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সরে পড় সময় থাকতে। নইলে ভালো হবে না।'

'নইলে কী হবে?'

'নইলে দেখিস আমিই সরে পড়বো।'

'সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নের সঙ্গে?'

'যার সঙ্গেই হোক না কেন উটকোমুখো, তোর সঙ্গে নয়।'

'বেশ তো, টোপর মাথায় দিয়ে যাবো, আবার খালি-মাথায় উঠে আসবো।'

'তবু তুই যাবি, হতভাগা?'

'বিয়ে ঠিক হলে যাবো না? জমি বিলি হয়ে গেলে যাবো না দখল নিতে?'

'যাস, তাই যাস তুই। বুঝতে পাচ্ছি, লাঠিপেটা না হলে তুই নড়বিনে এখান থেকে। খাবি কোঁৎকা?' •

'অদৃষ্টে থাকে খাবো।'

'পচা আদার ঝাল বেশি। কিন্তু শোন, তোকে বলে রাখি খাঁটি কথা, তোকে আমার একটুও পছন্দ হয় না, মনে ধরছে না, তোকে আমি ভালোবাসতে পারবো না একরত্তি!'

'ও রকম মনে হয় প্রথম-প্রথম।'

এ একেবারে পাথরে কোপ মারা।

এবার দিব্যমণি দস্তুরমতো গা ঘেঁসে গায়ের গরম দিয়ে বসে। বলে ফিস-ফিসিয়ে, 'এবার তবে বলি সত্যি কথাটা—'

এতক্ষণে ভক্ত সত্যি-সত্যি ভয় পায়। দিব্যমণির মুখ-চোখে কেমন একটা অন্ধকার ফুটে ওঠে।

'ঐ পানটা দেখছিস?'

'কই?'

'ঐ যে। হলদেটে হয়েছে, ছিটছিট দাগ পড়েছে। দেখছিস?'

'হ্যাঁ. দেখছি।'

'ঐ পানটা দুষে গেছে। শোন তবে কানে-কানে, আমিও তেমনি দুষে গেছি।'

ভক্তর গা অজানতে শিউরে ওঠে। 'যাঃ, কী যে বলো!'

'না, কী যে বলো নয়, সত্যি। তা না হলে অমন রাস্তা থেকে বর ধরে এনে বিয়ে দেয় সাত-তাড়াতাড়ি? সত্যি, আমি অত্যন্ত খুঁতে, খারাপ মেয়ে। জিগগেস কর গিয়ে বাড়ি-বাড়ি, আমার কেচ্ছায় পাড়ায় কান পাততে পারবিনে।'

'যাঃ বিশ্বাস করি না।'

'ভিটেমাটি চাটি হয়ে যাবে তোর। ঘুঘু চরবে। একবার যখন একটা কেলেঙ্কারি করেছি তখন আরো যে না করবো তার ঠিক কী? বিয়ে করছিস, মেয়ের খোঁজ নিবিনে? জিগগেস করবিনে পার্টি-বেপার্টির লোককে?'

'খোঁজ করে কতটুকুই জানতে পারবো বা?'

'তবু যে মেয়ে দুষে গেছে যাতে দাগ ধরেছে, তাকে তুই বিয়ে করবি?'

'উপায় কি না করে?'

'উপায় নেই?'

'নইলে দোষ তোমার ঢাকবো কি-করে?'

'আমার দোষ ঢাকতে তুই বিয়ে করবি? তুমি কি পাগল না মুন্দফরাস?'

'তা ছাড়া গোড়ায় ঠিক খোল দিলে পানের দোষ খণ্ডে যায়। ঝাল পান ফের মিঠে হয়ে আসে।'

'তোর মাথা হয়ে আসে। শেষকালে তুইই কপাল চাপড়াবি। সাধ করে বেনো জল ঢোকাসনে।' দিব্যমণি উঠে পড়ে: 'মুখের পান ফুরিয়ে গেছে, থাকতে পাচ্ছি না আর। তবু শেষবার বলে যাচ্ছি. ভালো চাস তো পাত্তাড়ি গুটো, মানে-মানে সরে পড়। নইলে এক কেলেঙ্কারির পর আরেক কী কেলেঙ্কারি বাধে, তুই ভাবতেও পারবি নে।' আঁচলে ঘুর্নি দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায় গেট দিয়ে।

সারাটা রাত ভক্তদাসের কাটে কেমন একটা বুক-চেপে-ধরা বোবা হাঁপের মধ্যে। বুকে যতটা নিশ্বাস নেয় ততটা যেন ছাড়তে পারে না। যতটুকু আশা নেয় তার চেয়ে ভয়ই বেশি জুড়ে থাকে। ভয়ের ভাপ।

কিছু একটা যে ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। পাঁচ আঙুলেই ঘি—এমন মোলায়েম পরিণামে বিশ্বাস হয় না। হয় ফাটবে মাথা নয় ভাঙবে ঠ্যাং। সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নের সঙ্গে সে যে কিছুতেই এঁটে উঠবে না তা কে না জানে। হয়তো ফাঁদে ফেলবে, নয় গায়েব হয়ে যাবে। কে জানে, হয়তো সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই যাবে দিব্যমণি। হয়তো বা সুধন্য পালের মনই চলবিচল হয়ে যাবে। হয়তো মামা আসবে না। ভজকট—ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কী যে হবে কিছুই আঁচ করতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে পারছে সর্ষের ভিতর থেকে ঠিক বেরিয়ে আসবে ভূত।

তবু চলে যেতে মন ওঠে না। চোখের ভালো-লাগাটা মুছে দিতে ইচ্ছে করে না নিজের থেকে চোখ বন্ধ করে।

সকালে উঠে বাড়ি-ঘরে লক্ষ্য করে না একটু ব্যস্ততা। আকাশে-বাতাসে যেন বিয়ে-বিয়ে রঙ নেই। তাকে জায়গা দিয়েছে লাগোয়া সারদা কুলের বাড়িতে, বাইরের ঘরের হাতনেয়। পুরুত এসেছে তার তদারকে। তবু ভয়-ভাঙা হতে পারে না। কুমোরের বিয়ের কাণ্ড-কারখানাই বা কী, তবু ততটুকুও যেন সোর-সরাবত নেই! মনে হয় না দিব্যমণি তার বাড়ি আছে লক্ষ্মী মেয়ের মতো। নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে রাত থাকতে, হাঁটা-পথে, নৌকোয়, গাড়িতে।

তবু কী আশা করে যায় সে পানের বরজে, দুপুর বেলায়। আওতায়

ধান হয় না, অথচ পান হয়েছে কেমন। তবু রোদের ঝাঁজে কোথাও-কোথাও লতা কেমন জ্বমরে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে।

পিছনে খসখস করে ওঠে। যা ভেবেছে, বা যা মোটেই ভাবেনি, দিব্যমণি। যেন কী চক্রান্ত তার চোখে, চিবুকে, তার চুপিচুপি চলায়।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। ঠোঁটে মনে হয় পানের লাল নয়, রক্তের ছোপ। হাতের ইসারায় বসতে বলে ভক্তকে। যেখানটায় ভক্ত বসে, সেখান থেকে আরো দূরে সরে যেতে ইসারা করে, যেখানে আরো একটু আবডাল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভক্ত একবার এখানে বসে, আরেকবার ওখানে, পাতার থোপনার আড়ালে।

কাছে এসে বসে প্রায় কোলের কাছে। বলে, 'আমি জানি কেন তুই যাসনি এখনো। বেশ, তাই, ট্যা-ফোঁ করতে পারবিনে কিন্তু—বুঝলি?' বলে ভক্তর হাত চেপে ধরে।

ভক্ত কিছুই বোঝে না।

চোখে ঝিলিক মেরে বলে দিব্যমণি, 'চুমু খাবি তো? চুমু খেলেই তো হবে? খা না—যটা তোর খুসি। আমার মুখে খুব মিষ্টি পান। নে, শিগগির, সাঁটে সেরে নে চট করে। তারপর বাড়ি পালা।'

ভক্ত হাত ছাড়িয়ে নেয় আস্তে-আস্তে, আঙুলের প্যাঁচ থেকে আঙুল খুলে খুলে। বলে, 'না।'

'না কি? নে, রাখ্, নেকরা করিসনে।'

একশোবার বললে একশোবারই না—ঐ এক উত্তর।

'তোকে কি কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই?'

'না, তা হয় না।'

দিব্যমণি যেন ঘুসি খায় উদ্যত থুতনির উপর। যেন ঠেলা খেয়ে পড়ে যায় এক পাশে। বলে, 'তবে কী চাস তুই হনুমান?'

'আমি বিয়ে চাই।'

'আমাকে চাসনে?'

'চাই।'

'তবে?'

তবে কি করে বোঝায় ভক্তদাস!

'কেন, বিয়ে করে তুই কি সন্নেসী হবি নাকি?'

'তা কি জানি!'

'তবে আমাকে তুই এই কচু পাবি। আমি চললাম তবে মরতে।' দিব্যমণি এলো আঁচলে চলে যায় আঁকাবাঁকা পায়ে।

পর দিন বিয়ের দিন।

বিয়ের দিন না রায়ের দিন। কাঠরায় যেন আসামী এসে দাঁড়িয়েছে, শুধু রায় জানবার জন্যে। খালাস না জেল। বিয়ে না বাউণ্ডুলে!

হয়তো এখুনি শুনবে দিব্যমণিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে না সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নেকে। হয়তো এত্তেলা দিতে গেছে থানায়। দিব্যমণি যে বলে গেল মরতে যাচ্ছে তার মানে জলে ডুবে মরতে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই। আশ্চর্য, ভাবতেও পারতো না ভক্ত, আভ্যুদয়িকের কাজ হবে, তারপর আসবে কিনা মামা, দুজন জাত-কুটুম নিয়ে, গয়ারাম আর বারাণসী। বাজবে ঘণ্টা-কাঁসর, ধরবে পোঁ। আস্তে-আস্তে জমায়েৎ হবে লোকজন।

আরো আশ্চর্য, ডাক পড়বে তার শামিয়ানার নিচে, বিয়ের আসরে।

'যা দিনকাল, সব সাঁটে সেরে নিতে হবে ক্ষমাঘেন্না করে।' কে বলে মেয়ে-পক্ষ থেকে।

সমস্তই কি সংক্ষেপ? দ্রুত? কোনোখানেই নেই কি ঢালাও অবসর, আভাঙা আলস্য?

এও কি সত্য বলেই ধরতে হবে? ঐ যে কনে এসে বসলো তার পিঁড়িতে। কোল-কুঁজো হয়ে। লাল চেলিতে। ঝোঁকানো মাথায় ঘোমটা দিয়ে।

ঠিক দিব্যমণিই তো? খটকা লাগে। অনেক যেন কাহিল, ডিগডিগে। নিস্তেজ। যেন ঢলকে পড়েছে অনেকটা। রোদ-লাগা পানের লতার মতোই জুমরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কে জানে, হয়তো আর কেউ। তেমন নয় তার বসবার ছাঁদ, কাঁধের ডোল। এ অনেক ভদ্র, অনেক ঠাণ্ডা। অনেক ধীর, অনেক মৃদু। কোলের উপর হাত দুখানি রেখেছে যেন ভিক্ষার মতো।

ঠিক। এমনি করেই প্রতিশোধ নিয়েছে দিব্যমণি। আরেকটা কোনো মেয়ে দিয়েছে বদলি করে। নিজে সটকান দিয়েছে, আর তার বদলে পাঠিয়ে দিয়েছে একটা কে ফিকে জোলো পানসে মেয়ে। মামার কী! মামার তো টাকা পেলেই খালাস। মেয়ে দেখেওনি হয়তো। কিম্বা হয়তো আরো মূলে আছে ষড়যন্ত্র। হয়তো সুধন্যই দিব্যমণিকে দেখিয়ে পার করছে তার কৃষ্ণমণিকে।

পান-খাওয়া দাঁতে দিব্যমণির লাল হাসিটা দেখতে পাচ্ছে যেন সামনের

আলোতে, দূরের অন্ধকারে। কী ধড়িবাজ মেয়ে! তার বিয়ের সাধ মিটিয়ে দিয়েছে ষোল আনা। খোঁড়াকে ঠিক সে টেনে নিয়ে এসেছে খালের মধ্যে। এখন ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন।

কার বদলে কে। নাকের বদলে নরুন। পানের বদলে মুখশুদ্ধি। ঠিক হয়েছে। কাঙালের ঘোড়ারোগ হলে এমনই হয়।

মুখচন্দ্রিকা। মেয়েটার চোখ বোজা। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে, মেটে মিনমিনে মুখ। চিনি-চিনি অথচ চেনা যায় না। আস্তে-আস্তে চোখ তোলে মেয়ে। চাউনিটা মনমরা। দেরি হয় না চিনতে। দিব্যমণিই।

দিব্যমণিই কি সত্যি?

দেখতে দেখতে ধোয়া-পাখলা হয়ে পাট উঠে যায় বিয়ের। বাতি যায় নিবে। বর-কনে শুতে যায়।

ঘোলা রাত। ময়লা ময়লা জ্যোৎস্না। ঝিঁঝি ডাকে। তেঁতুল গাছে বসে ডাকে একটা ভুতুম।

বিছানায় উঠতে ভক্তর পায়ে দিব্যমণির পা ঠেকে যায়। দিব্যমণি অমনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

ভক্ত ভাবে, খুব একটা ঠাট্টা হয়তো। কিন্তু দেখে দিব্যমণির মুখে নরম গাম্ভীর্য।

গ্যাসের আলোয় যা দেখেনি এখন দেখতে পায় মিটমিটে জ্যোৎস্নায়।

দিব্যমণির ঠোঁট শাদা, শুকনো। দাঁত দেখা যায় না। একটাও পান খায়নি সে আজ।

'এ কি, পান খাওনি?'

অনেকক্ষণ পর ধরা-গলায় দিব্যমণি বলে, 'না, আজ আমার উপোস। আমার বিয়ে।'

এ কি দিব্যমণি কথা কইছে?

'কিচ্ছু খাওনি তাই বলে?'

'না। বিয়ের দিন মেয়েদের কিছু খেতে হয় না।'

'খেলে কী হয়?'

'পাপ হয়। খেতে নেই।'

'তুমি তো ও-সব মানো না।'

'না মানি। এখন মানি।'

'পান খেলে না কেন?'

'পান সমস্ত পুজোয় লাগে, সমস্ত শুভকাজে লাগে। আজ তা খেতে হয় না।'

'কাল থেকে?'

'দু একটা খাবো। বেশি খাওয়াতে শ্রী নেই।'

এ কি দিব্যমণি কথা কইছে?

ভক্ত যতক্ষণ না শোয় ততক্ষণ দিব্যমণিও বসে থাকে এক কোণে। মুখ ফিরিয়ে। আঙুলে করে চাদরের কোণ খোঁটে। যত না রাগ তত লজ্জা। যত না ঘৃণা তত ভক্তি।

অনেক সাহস করে ভক্ত হাত ধরে। হাতটা কি রকম টান, লম্বা হয়ে থাকে। ছাড়িয়ে নেয় না, ঠেলেও দেয় না। শুধু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে।

হাত ছেড়ে দেয়। 'শোও, বসে আছ কেন?' বলে ভক্তদাস।

হাত আবার নিজের কাছে রাখে। 'তুমি আগে শোও।'

এ কি দিব্যমণির কথা?

দিব্যমণিকে শোয়াবার জন্যেই শুতে হয়। শুয়েই কেমন কুঁকড়ে লুটিয়ে পড়ে। মনে হয় যেন মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে। দুঃখে, লজ্জায়, পরাজয়ে। ধরা-দেয়ার চাইতেও ধরা-পড়ে-যাওয়ার লজ্জায়। অনেক বলে ফেলেছে অনেক খুলে দিয়েছে তারি অনুতাপে। জলে ধুয়ে-ধুয়ে পড়ে আছে একটা ধার-ক্ষয়া গোলালো পাথরের ঢিপি।

পা দিয়ে পা ছোঁয়। মনে হয় কাঠের কুঁদো। মাঠে ফেলে-রেখে-আসা গোড়াকার নাড়া।

যেন কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

হঠাৎ দূর থেকে যেন একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। ফোলা-ফোলা ফোঁপা-ফোঁপা কান্না। মুখের মধ্যে কাপড় ঠেসে-ঠেসে। বুক পেট পিঠ কাঁধ দলে পিষে থেঁতো করে। মিনতি নেই, নালিশ নেই, প্রতিবাদ নেই। ফাট-ধরা মাটির বোবা অন্ধকার থেকে কান্না।

ভুতুমের ডাক হয়তো। কিম্বা কে জানে, রাতের ডাক।

দিব্যমণি যে মরে যাবে বলেছিলো ঠিকই মরে গেছে। ভক্তদাস উঠে বসে, সর্বস্বান্তের মতো। খুব কাছে মুখ এনে তাকায় তার ঘুমন্ত, শান্ত মুখের দিকে। শাদা মরা মুখ। ফাঁসিকাঠে লটকানো মুখ। চোখের জলের দাগের

মতো রক্তের কালো দাগ যেন লেগে আছে জায়গায়-জায়গায়। কশে, চোখের নিচে, নাকের দুপাশে।

দরজার বাঁ পাল্লায় আস্তে চাপ দিতেই হুড়কো আলগা হয়ে খুলে যায়।

ভক্ত বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। পা টিপে-টিপে। দরজাটা আবার আস্তে ভেজিয়ে দেয়।

সত্যি, তার যুগ্যি নয় ভক্তদাস। সমস্ত স্বামিত্ব নিয়েও নয়। বোঝে এতক্ষণে। স্বামিত্বের শ্মশানে এসে।

মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি সায় দিয়ে ওঠে।

না, দিব্যমণি বাঁচুক। দিব্যমণি হোক। এক রাত্রির মিথ্যে দুঃস্বপ্নের পর বাঁচুক আবার তার সেই পুরোনো বঙ্গিমায়। সত্যিকারের স্ফূর্তিতে।

খিল

অভাবনীয়েরো একটা সীমা থাকা উচিত।

আপিসেই সুরজিৎ তার পেলো, রাতে, বরিশাল এক্সপ্রেসে অশোকা আসছে। আশ্চর্য, অশোকা কি জানে না কিছুই? ঘটনাটা তো ঘটে গেছে আজ এক বছরেরো উপর।

তবু, রাতে, বেশ একটু আগেই সুরজিৎ স্টেশনে গেল। গাড়ি ঠিক রাখলো। এবং যতক্ষণ না বাঁকের মুখে ইঞ্জিনের হেড-লাইট দেখা যায় ততক্ষণ প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চিন্তিত ভঙ্গিতে পাইচারি করলো।

ইণ্টার-ক্লাশের মেয়ে-কামরা থেকে নামলো অশোকা। বয়েস—বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছে, এবং নিঃসম্বল ও নিরভিভাবক যখন সে আসছে, বুঝতে হবে সে কুমারী ও স্কুল-মিসট্রেস। আঠারো ইঞ্চির একটা পাৎলা সুটকেস ছাড়া সঙ্গে আর কোনো জিনিস নেই। শীতের রাতে বিছানাও নিয়ে আসেনি। মোটা সিল্কের একটা ব্লাউজ মোটে গায়ে—শীতের রাতে যার সংক্ষিপ্ততার চেয়ে হঠকারিতাটাই বেশি করে চোখে পড়ে।

দু'জন পরস্পরের দিকে চেয়ে সংক্ষেপে হাসলো। প্রায় দশ-এগারো বছর পরে দেখা। কিন্তু চিনতে কারুরই দেরি হলো না। যেন কিছু দিন আগেই আর কোথাও তাদের এমনি অপ্রত্যাশিত দেখা হয়েছে।

'একেবারে তুমি যে আসবে তা ভাবিনি।' অশোকা সলজ্জমুখে সামান্য হাসলো · 'ভেবেছিলাম আর্দালি-চাপরাশি কাউকে পাঠিয়ে দেবে হয়তো।'

'আর্দালি-চাপরাশি কেউ রাতে থাকে না।' সুরজিৎ অশোকার হাতের ব্যাগটার দিকে তাকালো। বললে, 'সঙ্গে আর কোনো জিনিস নেই?'

'না।' কুণ্ঠিত ভাবে হেসে অশোকা বললে, 'এক দিনের তো মোটে মামলা।'

সুরজিৎ ব্যাগটা অশোকার হাত থেকে তুলে নিলো। অশোকা আপত্তি করলো না। কিন্তু সেটা তক্ষুনি সে কুলির মাথায় চালান দেবে জানলে নিশ্চয়ই আপত্তি করতো, জোর করলেও ছেড়ে দিতো না।

গাড়িতে উঠলো দুজনে। অশোকা আগে—পিছনের সিটে; সুরজিৎ মুখোমুখি। বাক্সটা গাড়োয়ানের জিম্মায়।

সংসারে জিনিস যার এত অল্প সে যে কতদূর দুঃসাহসী এই কথাটাই সুরজিৎ ভাবলো। প্রয়োজন তার বেশি না প্রয়োজন তার কম, এই কথাটাই সে বুঝে উঠতে পারলো না।

বললে, 'আমার ওখানে যে চলেছ খুব অসুবিধে হবে।'

'কার? আমার না তোমার?'

'তোমার। জানো তো', সুরজিৎ একটু থেমে বললে, 'আমার স্ত্রী, জয়ন্তী বছর দেড়েক হলো মাবা গেছে।'

'হ্যাঁ কাগজে দেখেছিলুম খবরটা। গণ্যমান্যকে বিয়ে করলে স্ত্রীও গণ্যমান্য হয়।' অশোকা একটু হাসলো কিনা বোঝা গেল না।

সুরজিৎ বললে, 'বাড়িতে একেবারে একা আছি। মেয়েছেলে কেউ নেই—'

'কেন, আমিই তো আছি।' অশোকা স্বচ্ছন্দভাবে বললে।

'কিন্তু কে তোমার দেখাশুনা করে!'

'আমি নিজেই করতে পারবো। এতদিন ধরে তাই করে এসেছি।'

একটুখানি কাটলো।

সুরজিৎ প্রশ্ন করলো : 'এখানে কেন এসেছ জানতে পারি?'

'আশ্চর্য, তুমিও একটা কৈফিয়ৎ না পেলে সন্তুষ্ট হবে না?' গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে অশোকার চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল দেখালো। 'সমস্ত রাস্তা গাড়িতে এক ভদ্রমহিলার কাছে লম্বা জবাবদিহি দিতে হয়েছে : কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কার বাড়িতে যাচ্ছি, সে আমার কে হয়, সেখানে আর কে-কে আছে, ইস্টিশানে কে আসবে নিতে—এক গাদা প্রশ্ন। উঃ, প্রাণ প্রায় যায়।'

'সবগুলি উত্তরই বেশ সন্তোষজনক হয়েছিলো আশা করি।'

'অন্তত ভদ্রমহিলা তাই মনে করেছিলেন।' অশোকা শব্দ করে হেসে উঠলো।

'ও-সব প্রশ্নের বেশির ভাগ উত্তরই আমার জানা শুধু একটা ছাড়া। কেন এসেছ সেইটেই শুধু জানতে চাই।'

'এমনিতে আসতে পারি না?'

'কেউ পেরেছে বলে তো শুনিনি এ পর্যন্ত।'

'কেউ মানে?'

'কেউ মানে বয়স্ক কুমারী মেয়ে। একাকী কোনো পুরুষের আশ্রয়ে। বলো না, কেন, কী দরকারে এখানে এসেছ?'

'বাবাঃ. কী কৌতূহল তোমার!' অশোকা আঁচলটা একটু টানলো, চুলটা একটু অনুভব করলো, গলার হারটা একটু আঙুল দিয়ে নাড়লো। বললে, 'তোমাদের এখানকার মেয়ে-ইস্কুলে হেডমিসট্রেসের চাকরিটা পাবো বলে মনে করছি। কাল সকালে তারই ইণ্টারভিয়ু।'

'সে ক্ষেত্রে,' সুরজিৎ একটু কাশলো : 'মেয়ে-ইস্কুলের হস্টেলে ওঠাটাই কি ঠিক ছিল না? কাল সকালে ইস্কুলের সেক্রেটারি যদি জিগগেস করেন, কোথায় ছিলে, তা হলে তোমার মুখের জবাব শুনে খুব বেশি তিনি খুশি হবেন বলে মনে হয় না।'

'প্রথমতো, তাঁর সে-কথা জিগগেস করাই উচিত হবে না, দ্বিতীয়তো,' অশোকা সহাস্য স্বাচ্ছন্দ্যে বললে, 'তোমার মতো এত ভীতু তিনি না-ও হতে পারেন।'

এর উত্তরে সুরজিতের কথাটা কেমন গম্ভীর, একটু বা বোকাটে শোনালো। সে বললে, 'এক-আধটু ভীতু হওয়াটা মন্দ নয়। বিশেষ করে তার, যে চাকরি করতে বেরিয়েছে।'

'তোমার মতো চাকরির জন্যে আমার অত মায়া নেই। নাই বা হলো চাকরি।' বলে অশোকা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে গলাটা সামান্য উঁচু করে ধরলো।

কেমন যেন তাকে অত্যন্ত শ্রান্ত ও অসহায় দেখালো হঠাৎ। মনে হলো যেন তার হাত-পা গাল-গলা শীতে নিদারুণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। প্রথমে একটা সাদা গেঞ্জি, তার উপরে উলের গেঞ্জি, তার উপরে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, তার উপরে শাল—তবু সুরজিতের শীত মানছে না ইচ্ছে করছে প্রকাণ্ড একটা লেপ জড়িয়ে বসে থাকে, অথচ এই গলিত শীতে ঐ তার চেহারা। এটা হতাশা না ঔদ্ধত্য তা কে বলবে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে-থাকতে সুরজিতের চক্ষু কেমন কোমল হয়ে এলো। বললে, 'তোমার শীত করছে না?'

'না।'

সুরজিৎ অল্প একটু হাসলো। বললে, 'শীতের কাছে ভীতু হওয়াটা অশাস্ত্রীয় হবে না। আমার গায়ের কাপড়টা নাও।' বলে শালটা গা থেকে খুলে নিয়ে অশোকার কোলের উপর সে রাখলো।

অশোকা চমকে উঠলো। বললে. 'দেখো, তোমার না ঠাণ্ডা লাগে। আগে-আগে একটুতেই তোমার ঠাণ্ডা লাগতো—ব্রঙ্কাইটিসের দোষ ছিল। সে সব এখন সেরে গেছে, না?'

'কিছুই সম্পূর্ণ সারে না।'

'তবে তুমিই গায়ে রাখো। একা-একা আছ, অসুখ-বিসুখ হলে মুস্কিল হবে।'

'তার চেয়ে আরো মুস্কিল হবে যদি তোমার অসুখ করে।'

অশোকা আবার হেলান দিল। ক্লান্তরেখায় গলাটা আবার একটু উঁচু করলে।

'কী, খুলে গায়ে দাও না।'

'না, এই বেশ আছি।' শালটা তেমনি রইলো অশোকার কোলের উপর পড়ে। গাড়ি থেকে নামবার সময় কি মনে করে শালটা সে তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলো।

প্রকাণ্ড বাড়ি। একজনের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ। নিচে দু'খানা ঘর, একটাতে বৈঠকখানা, পাশেরটা ভাঁড়ার। চেয়ার-সোফা ও য়্যাশট্রের আধিক্য দেখে বোঝা যায় বৈঠকখানায় প্রচণ্ড আড্ডা বসে। আর, পাশের ঘরে থাকে-থাকে থরে-থরে জিনিস দেখে মনে হয় কী নিপুণ নিখুঁত গৃহস্থালি! অথচ সব চাকর-ঠাকুরের হাতে। একটা ঠাকুর—দুটো চাকর, কোথা থেকে কুটোটি কুড়িয়ে নেবে তারি জন্যে সর্বদা তটস্থ। ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো অত বড়ো না হলেও প্রকাণ্ড উঠোন. তার এক পাশে আনাজের ক্ষেত, অন্য পাশে দিশি ক'টা ফুল-গাছ, কিন্তু কোথাও একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই। বাবু যদি বলে তবে ওরা অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে এমন একটা ভাব যেন ওদের মুখের উপর লেখা আছে। কোনো জিনিসই যেন হাত বাড়িয়ে চাইতে হয় না, সব আগে থেকেই তৈরি। এতটা ভালো নয় যেন কেমন চোখকে পীড়িত করে—অশোকার মনে হলো। কেননা যে একা আছে তার ঘব-দোর খানিকটা অগোছালো এটাই সকলে প্রত্যাশা করে। এইটাই সকলের প্রত্যাশা করা উচিত।

নিচে স্নানের ঘরে একটু উঁকি মেরে অশোকা সুরজিতের সঙ্গে উপরে উঠে এলো। উঠেই উত্তরের বারান্দা। পাশাপাশি দু'খানি সমান মাপের ঘর, উত্তরে দক্ষিণে দরজা। দু'ঘরের মাঝখানেও একটা দরজা আছে অবারিত খোলা, যেটায় কোনোদিন এ পর্যন্ত খিল পড়েনি। প্রথমেই ডাইনে যে ঘর সে ঘরটা

কিসের যে নয় অশোকা ভেবে পেলো না। বিশালকায় এক টেবিল, দেখলেই সন্দেহ হয় এ-টেবিলের চার পাশে বসেই রাউন্ড-টেবল কনফারেন্স হয়েছিলো কিনা। আফিসের বাক্স, বেতের বাস্কেট, ফ্ল্যাট-ফাইলে ফিতে-বাঁধা কাগজ-পত্রের স্তূপ, আইনি-বেআইনি মোটা-মোটা বই—কী যে তাতে নেই তা কে বলবে? কিন্তু সমস্তই অদ্ভুত রকমের গুছানো। খোলা দুটো সেল্‌ফে ঘেঁসাঘেঁসি করে বই সাজানো রয়েছে; কিন্তু আশ্চর্য দু'খানা বইয়ের মাঝখানে কোথাও একটু ফাঁক নেই, কোথাও একখানা বই বেঁকে বা হেলে বসেনি। ওদিকের দেয়াল ঘেঁসে লম্বা একটা কাঠের বেঞ্চি, তাতে ট্রাঙ্ক আর সুটকেস সাজানো, একটার উপর একটা। ঘরে স্ত্রী না থাকলেও যে কেউ বাক্স-প্যাঁটরাগুলি রঙচঙে কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখে অশোকা তা কল্পনা করতে পারতো না। পাশেই দেরাজ—টানাগুলোতে হয়তো আপিসের পোশাক থাকে। তারই সন্নিকটে দেয়ালে ঝোলানো লম্বা একটা আয়না। আয়নাতে শরীরের অনেকখানি দেখা যায় বলে অশোকার কেমন লজ্জা করে উঠলো। দেরাজের উপরকার একটা ছবি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা সে টেনে নিলো। না, মৃত-জীবিত কোনো মানুষেরই সেটা ছবি নয়, সেটা একটা সদ্য-উদ্ভিদ্যমান গোলাপের কুঁড়ি।

আয়নার দু' পাশে দুটো ছোট টেবিল. যদিও ডাইনেরটা অপেক্ষাকৃত বড়ো। বাঁয়েরটাতে প্রসাধনের জিনিস, ডাইনেরটাতে ওষুধ। দুটোই যেন ভীষণ বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো। খানিকটা অন্যায় কৌতূহলের মতো দেখায় বলে অশোকা বেশিক্ষণ সেখানে চোখ রাখলো না। পাশেই আলনা আর দুটো ব্র্যাকেট, একটা কাপড়ও কোথাও একটু কুঁচকে বসেনি। আলনার শেষ তাকে সারবাঁধা জুতোর লাইন. ইলেকট্রিকের আলোয় চকচক করছে। এরি মধ্যে, এ-সবের মধ্যে, ঘরের মাঝখানে বেমানান একটা স্প্রিং-এর খাট।

অশোকা জিগগেস করলো : 'এইখানেই শোও নাকি?'

'না। শোবার ঘর ঐ পাশে।'

পশ্চিমের ঘর থেকে পূবের ঘরে অশোকা এল, মাঝখানের দরজা দিয়ে। পশ্চিমের ঘরটা জিনিসপত্রে যেমনি জবরজঙ, পূবের ঘরটা তেমনিই ফাঁকা, নিরিবিলি। মাঝখানে প্রকান্ড খাট পাতা, বিঘৎ দুয়েক পুরু গদির উপর নরম তোষকে নিভাঁজ বিছানা করা রয়েছে। পায়ের দিকে লেপ রয়েছে ভাঁজ করা। একজনের পক্ষে যেন অনেক অপচয়, অনেক উদ্বৃত্তি, তাকিয়ে থেকে অশোকার মনে হলো। কিন্তু যতই সে শ্রান্ত হোক না কেন, এখুনি, রাত

সাড়ে নটার সময় লেপ গায়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়তে পারে না. এ কথাটা মনে হতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

পাশে একটা ইজি-চেয়ার, আলোর দিকে পিঠ করে। তার হাতের কাছেই ছোট টিপাইয়ের উপর টাইম-পিস ঘড়ি, ক'খানা ছ পেনি দামের হালকা বই আর কখানা রঙিন মলাটের চুটকি সাপ্তাহিক। একবার হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলো সে সেগুলি, যেমনি ছিল তেমনি আবার গুছিয়ে রাখলো সন্তর্পণে।

এ ঘরে ঢুকেই অশোকা ভেবেছিলো দেয়ালজোড়া এনলার্জড একটা ফটোর সঙ্গে তার দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হবে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘরের চারদিকে কোথাও জয়ন্তীর একটুকরো একটা ছবি নেই। অশোকার বুকের মধ্যে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শব্দ শুনে নিজেই সে উঠলো চম্‌কে, কেননা সে-নিশ্বাসটা যেন ঠিক দুঃখের মতন বলে মনে হলো না।

অন্য দিকে চোখ রেখে সুরজিৎ বললে. 'হাত মুখ ধোবে না?'

'পুরোপুরি গা-ই ধোবো। নইলে বড্ড ঘিন-ঘিন করবে। গবম জল পাবো তো?'

'হ্যাঁ, করেছে গরম জল।'

'দেখ, সাবান-তোয়ালে কিছু সঙ্গে আনিনি।' অশোকা হাসলো।

'তা-ও পাবে।'

'সবই পাবো।' অশোকা বললে. নির্ব্যক্তিকের মতো। পরে অনেকখানি হেসে : 'কিন্তু যদি শাড়ি-সেমিজ চাই?'

'তা দিতে পারবো না বটে, কিন্তু তার বদলে পা-জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি দিতে পারবো। পরো না, বেশ দেখতে হবে। অনেকেই তো পরে আজকাল।'

একটু কি বিবেচনা করলো অশোকা। পরে নিতান্ত বালিকার মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি কী যে বলো।' বলে তার সুটকেসে চাবি পরালো।

নিচে. বাথরুমে এসে দেখলো, সমস্ত কিছু তৈরি, প্রয়োজনেরো অতিরিক্ত। প্রক্ষালন সমাপ্ত করে চাকর-ঠাকুরের সঙ্গে সে দুটো সাংসারিক কথা কইলো নিতান্ত মেয়েলি কৌতূহলে। কিন্তু ভুলেও তারা একবার জিগ্‌গেস করলো না. সে কে, কেন এসেছে, কেনই বা এতদিন আসেনি।

উপরে গিয়ে দেখলো, টেবিলের সামনে কি-সব কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছে সুরজিৎ। যেন কতদিনকার পুনরাবৃত্ত অভ্যাস, সুরজিৎ চেয়েও দেখলো না।

খসখসে শাড়ির বহুবিস্তৃত বিশৃঙ্খলায় অশোকা যখন দ্রুত পায়ে উঠে সুরজিতের পাশ দিয়ে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো, তারো মনে হলো এমনি যেন আরো কতদিন হয়ে গেছে এর আগে। নতুনত্বের তীব্রতার মাঝে জিনিসটাকে কখনো-কখনো অত্যন্ত পরিচিত ও প্রাত্যহিক মনে হয়। হঠাৎ ময়ূর-সিংহাসনে গিয়ে বসলে মনে হয় এমনি যেন কতদিনই বসেছি।

কিন্তু খটকা বাধলো। অশোকা জিগগেস করলে : 'তোমার মোটা চিরুনি নেই?'

সুরজিৎকে তাকাতে হলো এবার, আর তাকিয়ে সে ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গেল। আর কিছুতে নয়, শাড়িটার চওড়া ঢালা লাল পাড়ে। এই পাড়টা অত্যন্ত সেকেলে, আধুনিক কুমারী মেয়েদের পছন্দের বাইরে, এ-পাড়ের সঙ্গতির জন্যে কপালে ও সিঁথিতে যেন অনেকখানি সিঁদুরের প্রত্যাশা করতে হয়। এ লালটা সম্ভোগসৌভাগ্যের রঙ। যেন বড় বেশি উদ্ঘাটিত।

'কী দেখছ, মোটা চিরুনি নেই?'

'চুল তো আর ভেজাওনি, সরু চিরুনিতেই আঁচড়ে নিলে চলবে। তা ছাড়া.' সুরজিৎ হেসে বললে, 'রুক্ষ চুলেই তো বেশ ভালো দেখায়।'

চুল আঁচড়াবার আর দরকার হলো না। নিজের থেকেই সুরজিতের শাল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অশোকা বললে, 'বাবাঃ, কী শীত এখানে!'

'তোমাকে এখন চা দেবে না একেবারে খাবে?'

'একেবারে খাবো।' অশোকা অদ্ভুত করে হেসে উঠলো।

'কী খাবে? ভাত না লুচি?'

'তুমি?'

'তুমি যা খাবে তাই।'

'আমি ভাতই খাবো। ভাত না খেলে ঘুম হবে না। আমার সমস্ত শরীর এখন ঘুম চাইছে।'

'তবে দিতে বলি ঠাকুরকে?' সুরজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল।

'দাঁড়াও ব্যস্ত কী!' অশোকা টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো। বললে, 'কাজ—এখনো কাজ? আমি এসেছি. তবু, আজকের রাতেও তোমাকে কাজ করতে হবে?'

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সুরজিৎ কাগজ-পত্রগুলি দূরে সরিয়ে রাখলো।

বললে, 'না, ঠিক কাজ নয়, একটু দেখছিলুম কাগজগুলো।' তারপর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় একটু বা ম্লানকণ্ঠে বললে, 'তারপর—'

'তারপর, এই তো, ভাসতে-ভাসতে। উঃ, কী শীত এখানে! হাত দুটো আমার খেয়ে যাচ্ছে।' মুঠ-করা দুই হাতের উপর চিবুক রেখে দাঁড়িয়েছিলো অশোকা, হঠাৎ ডানহাতখানা দুর্বল ভঙ্গিতে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই দেখ না, যেন বরফ দিয়ে তৈরি।'

এক মুহূর্ত সুরজিৎ দ্বিধা করলো হয়তো। তারপর সেই হাত সে একটু ছুঁলো কি না-ছুঁলো। ব্যস্ত হয়ে বললে, 'গ্লাভস্ পরবে? আমার কাছে ভালো গ্লাভস্ আছে।'

'আর মোজা?' অশোকা হাত সরিয়ে নিলো এবং এবার রাখলো তা শালের তলায়।

'মোজাও দিতে পারি। খুব নরম একটুও কুটকুট করবে না।'

'আর, কান-ঢাকা টুপি? কম্ফর্টার?' হাসতে-হাসতে অশোকা সরে গেল। বললে, 'দস্তানা হাতে দিয়ে খাবার আমার অভ্যেস নেই। তুমি কাজ করো, আমি ঘুরে-ঘুরে তোমার বাড়ি দেখি।'

বলে সে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল। নিঃশব্দে, কেননা এত শীতেও এখন সে খালি-পা।

কিন্তু কোথাও যেন তার এতটুকু আশ্রয় বা বিশ্রাম নেই। এমন একটুও কোথাও আগোছালো হয়ে নেই যে সে গুছিয়ে দেয়। বিছানাটা পর্যন্ত পাতা হয়ে গেছে।

ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলো সে দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলো সেখানে কয়েকখানা বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। এখানে বুঝি কখনো-কখনো সুরজিৎ বসে, বসবার তার ইচ্ছে হয়, সব সময়েই তা হলে সে মস্ত টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাজ করে না। কিন্তু বাইরে কী কনকনে হাওয়া, এখানে এক মিনিট দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার। কোথা থেকে কি একটা প্রচ্ছন্ন ফুলের ম্লান গন্ধ আসছে, তার উপর এমন চক্ষু-জুড়ানো কালো অন্ধকার—কী ভেবে, শালটা গায়ের উপর আরো ঘন করে টেনে নিয়ে অশোকা একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লো।

তারপর সুরজিৎ সত্যিই ফের কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছিলো। হুঁস হলো যখন ঠাকুর এসে বললে, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। ডাকলো : 'অশোকা।'

আশা ছিল দেখতে পাবে পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে সে বই পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সে নেই। বিছানাটাও অস্পৃষ্ট। দক্ষিণের দরজা খোলা দেখে চলে এলো সে দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলো চেয়ারে শুয়ে অশোকা ঘুমিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতে গেল, জ্বালালো না। আলোর চেয়ে অন্ধকারেই অনেক জিনিস বেশি স্পষ্ট করে দেখা যায়।

ডাকলো : 'অশোকা, ওঠো। খেতে যাবে না?'

গলার স্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা, তবু কোনো সাড়া নেই।

হাত দিয়ে অশোকার মাথায় সে মৃদু নাড়া দিলো। তারপর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি। 'এ কি, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?' তবুও অশোকাকে মুহ্যমান দেখে দুই হাতে তার দুই বাহু ধরে সবল আকর্ষণ করে তাকে সম্পূর্ণ দাঁড় করিয়ে দিলো। বললে সুরজিৎ একটু শাসনের সুরে : 'তুমি পাগল হয়েছ নাকি? এই অসম্ভব শীতে পাৎলা একটা শাল গায়ে দিয়ে বাইরে পড়ে আছ? নিমুনিয়া হবে যে! ঘুম পেয়েছে, বিছানায় শুতে পারোনি? লেপ তবে আছে কী করতে? চলে এসো বলছি।' বলে তার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো, আর দরজাটা দিল সজোরে বন্ধ করে।

এত ঝড়-ঝাপটার পর আশ্চর্য হেসে অশোকা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি?'

তারপর তারা নিচে খেতে গেল, টেবিলে, মুখোমুখি।

রাশি-রাশি খাবার। অশোকা বললে, 'তুমি আমার ঘুমটা মাটি করবে দেখছি।'

'কেন বলো তো?'

'এত সব খেলে আমার ঠিক অম্বল হয়ে যাবে। বুক জ্বলবে। ঘুমুতে পারবো না।'

'যদিও আমার কাছে ওষুধ আছে, তবুও তোমাকে অত খেতে বলবো না। যা পারো তাই খাও।'

'আর তুমি—তুমি এতগুলি সব খাবে নাকি?' অশোকা অবাক হবার ভঙ্গি করলো।

'না আমি রাত্রে অত্যন্ত কম খাই।'

'তবে এত সব করেছ কেন?'

'আমি করিনি, ঠাকুর করেছে।'

'ঠাকুর করেছে! দুটো লোকের জন্যে দুশো রকম খাবার! ওকে এত সব বলেছে কে করতে? কী আক্কেল দেখ দিকি। এসব স্রেফ নষ্ট হবে তো?' অশোকা কর্ত্রীত্বের সুরে বললে।

'হোক নষ্ট। তবু তোমাকে বেশি খেতে বলে তোমার ঘুম নষ্ট হতে দিতে চাই না। কিন্তু, ভাবো দেখি,' সুরজিৎ সহজভাবে বললে, 'দৃশ্যটা যদি উলটো হতো, মানে, তোমার ঘরে যদি আমি অতিথি হতুম, আর তুমি যদি আমাকে খাওয়াতে, তা হলে দুশো ছেড়ে দু' হাজার পদ করতে, আর কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিতে না, জোর করে প্রতিটি গ্রাস আমার গলার মধ্যে গুঁজে দিতে, তাতে আমার অম্বল ছেড়ে পায়েস হয়ে গেলেও। বলো, তাই ঠিক নয়?'

'ককখনো না।' চামচ দিয়ে খাদ্যদ্রব্যগুলির প্রথমাংশটা দু' প্লেটে ভাগ করে দিতে-দিতে অশোকা বললে, 'বরং আমার খাওয়ানোতে যদি তোমার অসুখ করতো, রাত জেগে তবে তোমার আমি সেবা করতুম। যতক্ষণ না সুস্থ হতে ছেড়ে দিতুম না তোমাকে। বেশ তো, আজই তার পরীক্ষা হোক না।' অশোকা চেয়ারটা সামনের দিকে আরো টেনে আনলো : 'মনে করা যাক না, এ আমি তোমাকেই খাওয়াচ্ছি। তোমার বাড়ি, তোমার খরচ—ভেবে নিলেই হলো, আমার বাড়ি, আমার খরচ। খাও না তোমার যত ইচ্ছে। দেখ না, সেবা করতে পারি কি না।'

'মাঝখান থেকে আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে তোমার ঘুমটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে। দরকার নেই সেই এক্সপেরিমেণ্টে। ফেলে-ছড়িয়ে যা পারা যায় তাই খাওয়া যাক।'

খেতে-খেতে হঠাৎ নিম্ন কণ্ঠে অশোকা জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, তোমার ঠাকুর-চাকর আমাকে কী ভাবছে বলো তো?'

'কী ভাবছে জিগগেস করাটা যখন সমীচীন হবে না, তখন অনুমান করতে পারি মাত্র।' সুরজিৎ সম্পূর্ণ করে তাকালো একবার অশোকার মুখের দিকে। বললে, 'কোন আত্মীয়া—ছোট বোন-টোন ভাবছে হয়তো।'

'তাই হবে। নচেৎ আর-কেউ যে এমন একা বাড়িতে একা চলে আসতে পারে তা হয়তো ওরা কল্পনাও করতে পারে না। আচ্ছা,' গরসটা মুখের কাছে ধরে নির্নিমেষ চোখে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে অশোকা প্রশ্ন করলো : 'আচ্ছা, আমাকে তোমার মনে ছিলো? তার যখন পেলে তখন চিনতে পেরেছিলে অশোকা কে?'

এই সূত্রে অশোকা সুরজিৎকে টেনে নিয়ে গেল প্রায় দশ-এগারো বছর আগে এক বে-সরকারী মেয়ে-হস্টেলে। যখন সুরজিতের বয়েস পঁচিশ কি ছাব্বিশ। যখন জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এসে লুকিয়ে আরো একজনের সঙ্গে সে দেখা করতো। যখন একটা চাপা গুঞ্জন চলেছিলো চারদিকে শেষ মুহূর্তে কার সে হাত ধরে—জয়ন্তীর না অশোকার।

সে-পরিচ্ছেদটা নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে সুরজিৎ হঠাৎ জিগগেস করলে : 'কাল ইন্টারভিয়ুর পরই চলে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, হবিবির্বনা-অবস্থাতেই যাওয়া ভালো।' অশোকা হাসিমুখে বললে, 'প্রহারেণ পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

আঁচিয়ে উপরে এসে দেখলো সাড়ে-এগারোটা। কি-রকম আতঙ্ক করে উঠলো অশোকার।

টিপাইয়ের উপর পান রেখে গেছে।

সুরজিৎ বললে, 'তুমি পান খাও?'

'তুমি?'

'খাবার পর খাই এক-আধটা।'

'আমি খাই না। তবে তুমি যখন খাচ্ছ—' অশোকা তুলে নিলো একটা পান।

'পান খেলেও ঘুমুতে যাবার আগে দাঁত মাজি।'

'রক্ষে করো, রাত দুপুরে এখন আমি দাঁত মাজতে পারবো না।' অশোকা পান রেখে দিলো।

কতক্ষণ পরে, ঘরের চারদিকে চেয়ে, জানলা-দরজা সব অটুট আছে কিনা তাই হয়তো পর্যবেক্ষণ করে সুরজিৎ জিগগেস করলে, 'তোমার আর কি লাগবে? রাত্রে জল যদি খাও—'

'রক্ষে করো। শীতে রাতে উঠে জল খাওয়া!'

'তবে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ো আর কি!'

'আর তুমি?'

'আমার দেরি আছে।'

'আমিও তবে দেরি করতে পারবো।' বলে হঠাৎ অশোকা জিগগেস করলে : 'বাড়িতে কফি আছে?'

'খাবে তুমি? আমি নিজেই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবার ভয়ে বলতে সাহস পাইনি।'

'তবে বলে দাও না, কোথায় কী আছে, তৈরি করে নিচ্ছি।'

'কিন্তু খাবে যে, ঘুমুতে তোমার অনেক্ দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক। এখন আর আমার ঘুম পাচ্ছে না। এখন জাগতে ইচ্ছা করছে।'

অশোকা নিজের হাতেই তৈরি করলো কফি। সুরজিৎকে এক কাপ দিয়ে নিজে নিলো আর এক। সুরজিৎ বসেছে ইজিচেয়ারে, অশোকা সামনে একটা লম্বা মোড়ায়—টিপাইটা দু'জনের মাঝখানে, বইগুলি মেঝের উপর রেখে দেয়া। বেড়া-দেয়া রুটিনের বাইরে যেন তারা চলে এসেছে। নিচে চাকরদের সাড়া-শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।

কফি শেষ হয়ে গেছে কখন। অনেকক্ষণ তাদের আর কোনো কথা নেই। আর যেন কিছুতেই তারা লঘু আর তরল হতে পারছে না।

প্রকাণ্ড একটা স্তব্ধতার ঢেউ পেরিয়ে গিয়ে সুরজিৎ বললে, আবার সেই আগের কথা : 'দোর দিয়ে এখন শুয়ে পড়ো।'

অশোকারো মুখ দিয়ে সেই আগের কথাই বেরিয়ে এলো : 'আর তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও শোবো এবার। পাশের ঘরে আমার জায়গা হয়েছে।'

মাঝের দরজা দিয়ে অশোকা দেখলো একবার পাশের ঘরের চেহারা। দেখলো সেই স্প্রিং-এর খাটে কখন একটা বিছানা করা হয়েছে—হাসপাতালের রুগীর মতো—পায়ের নিচে একটা মোটা কম্বল—ওয়াড়-ছাড়া। দরিদ্র, সঙ্কীর্ণ বিছানা।

অশোকা বললে, 'তা কি হয়? তোমার বিছানায় তুমি শোবে। ওখানে আমি শোব—একরাত্রির তো মামলা।'

সুরজিৎ অস্ফুটভাবে হাসলো। বললে, 'পাগলামি করো না। তুমি অতিথি, পথশ্রান্ত।'

'অত বড়ো খাটে শুলে আমার ভয় করবে। ঐখানেই দিব্যি আমি কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে পারবো। ঘরময় অনেক জিনিস, ককখনো একা মনে হবে না নিজেকে।'

'তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, এমন-কি আমাকে পর্যন্ত তোমার ভয় নেই। সে-ভয়ও যাতে না থাকে—' সুরজিৎ সরে এলো দু ঘরের মাঝের দরজার কাছে। বললে, 'দরজার খিলটা তোমার দিকেই রইলো।' পরে স্বর অত্যন্ত লঘু করে বললে, 'মশারি খাটানো আছে, দরকার হলে ফেলে নিয়ো। মশা যদিও এখন

নেই। আর রাত কোরো না, কথায়-কথায় অনেকক্ষণ তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি।' বলে সুরজিৎ তার ঘরে অপসৃত হ'ল।

অমনি তার পিছনের দরজাটা আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। নির্ভুল একটা শব্দ হলো—খিল-লাগানোর শব্দ। তারপর সুইচ অফ করার শব্দও সে শুনতে পেলো। তারপর, এ-ঘর থেকে দেখলো সে ও-ঘরের অন্ধকার।

অনেক রাতে সুরজিৎ একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখলো যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে সে, অথচ খুলছে না দরজা। অশোকাকে ডাকতে যাচ্ছে, গলায় ফুটছে না কোনো স্বর। অথচ স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে সে-আগুনের থেকে অশোকা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না।

এমনি একটা আতঙ্কের মধ্যে থেকে তার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। যাক. আগুন নয়, আলো। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

অন্যদিন ভোরবেলা জানলা দিয়ে ডেকে চাকর জাগিয়ে দেয়, আজ সে নিজেই উঠলো, এবং সেটা অপ্রত্যাশিত প্রত্যূষে। মনে পড়লো অশোকার কথা, এবং মনে হতেই নিঃসঙ্কোচে সে পাশের দরজা খুলে উত্তরের বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অশোকার ঘরে ঢুকলো। ঘরে অশোকা নেই, সেটা বেশি আশ্চর্য নয়, কিন্তু খাটজোড়া প্রকাণ্ড বিছানার এতটুকু কোথাও কোঁচকায়নি। সুরজিতের শালখানা ভাঁজ করে ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর রাখা। তার সুটকেসটিও অন্তর্হিত।

উপরে-নিচে সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গায়ই অশোকাকে পাওয়া গেল না। সুরজিৎ তারপর পথে বেরুলো। আর কোথাও নয়, মেয়ে-ইস্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে। বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'নতুন কোনো মিসট্রেস নেবার কথা হয়নি, আর অশোকা মুখার্জি বলে কারুর ইণ্টারভিয়ু দিতে আসার কোনো কথা নেই।'

এর পর স্টেশনেও সে যেতে পারতো—ভোরবেলা জলে-স্থলে দু'দিকের পথই খোলা আছে। অতএব পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন নেই মনে করে সুরজিৎ বাড়ি ফিরলো। ফিরে এসে পরখ করে দেখলো দু'-ঘরের মাঝখানের দরজা তেমনি অটুট বন্ধ আছে।

বন্ধ যদি আছে, তবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে পাশের ঘরে সে আলো দেখলো কেমন করে?

সমস্তটাই কি স্বপ্ন?

প্রথমটা অতুল স্তম্ভিত হয়ে রইলো, পরে উঠলো চেঁচিয়ে।

আর, তার উত্তরে কিনা ঐ নির্বারিত, নির্ঝরিত হাসি!

'কী সর্বনাশ! খোলা ছাদ, পড়ে যাবে যে।' মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলো অতুল হাত-পায়ের প্রান্তগুলো তার ঠাণ্ডা হয়ে এলো, আর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা গেল ছিঁড়ে, তালগোল পাকিয়ে। মনে হল এই বুঝি সে পড়ে যাবে মেঝের উপর।

ঘুরতে-ঘুরতে ছুটতে-ছুটতে হাসতে-হাসতে মেয়েগুলো বললে, 'আমরা পড়ি না।'

এমন অবস্থায় সুমুখের জানলাটা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ রোমাঞ্চ অতুলের দুর্বল স্নায়ুর পক্ষে অসহনীয়।

এই সেদিন সামনের ঐ আমগাছটার ডগায় গিয়ে উঠেছিল চাঁইদের ছোট ছেলে, মরা ডাল ভাঙবার জন্যে। কী সাঙ্ঘাতিক সাহস ছেলেটার! কখনো উপুড় হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে, কখনো-বা এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পা বাড়িয়ে ছেলেটা সরু-সরু শুকনো ডাল পট-পট করে ভেঙে ফেলে দিচ্ছে নিচে. আর যখুনি এই পড়ে গেল বলে অতুল বুক চেপে ধরেছে, তখুনি ছেলেটা শীর্ণতর আরেকটা শাখায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ছেলেটার কী হচ্ছিল কে জানে, অতুলের বুকের মধ্যে হাপর চলছিল কামারের। সামান্য দু-পয়সার জ্বালানিতর জন্যে এই জীবন-সংশয়। অনেক চেঁচামেচিতেও যখন ছেলেটাকে নামানো গেল না, অতুল তখন নিরুপায় হয়ে সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিল।

এখানে এখন জানলাটা তেমনি বন্ধ করে দেয়া উচিত, যদি হৃৎপতন থেকে অতুল বাঁচতে চায়। কিন্তু চোখ ফেরাবো বললেই আর চোখ ফেরানো যায় না।

বড়ো মেয়েটাই সবচেয়ে দেখতে ভালো—তাতে সন্দেহ কী। আর কিছুতে না হোক, বয়সে অন্তত। অন্তত পোশাকে। পোশাকের প্রাথর্যে। 'গেল, গেল—পড়লো সবগুলি।' অতুলের গলা চিরে তিন-তিনটে আওয়াজ বেরুলো।

কিন্তু মেয়েগুলোর মুখে হাসি ছাড়া কোনো শব্দ নেই। যেমন ঘুরছে

তেমনি হাসছে। গোলমাল শুনে নিচে থেকে স্বয়ং প্রোপ্রাইটর এসে হাজির হল। কৃষ্ণকান্তি, বৃহস্বপু।

'এরা কি শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবে নাকি?' অতুল ঝলসে উঠলো : 'ন্যাড়া ছাদ, কালকের বাতের বৃষ্টিটা ভালো করে এখনো শুকোয়নি, আর এরা আলসের উপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে? যদি ছিট্‌কে একটা পড়ে যায় রাস্তায়!'

'পড়বে না বাবুজি, পড়বে না।' ভীমকান্তি প্রোপ্রাইটর অতুলের কাঁধের নিচে মৃদু-মৃদু চাপড় দিতে লাগলো।

'দৈবের কথা কে বলতে পারে? নিচে তো আর নেট টাঙিয়ে রাখেননি!' অতুল ঝাঁজিয়ে উঠলো : 'একটার কারু অপঘাত মৃত্যু হোক আর আমার বাড়ির বদনাম রটে যাক। ভাড়াটে একটাও না পাই ইহজীবনে।'

'এই, থাম তোরা।' ধমকের মতো করে বলে প্রোপ্রাইটর।

মেয়ে চারটে থেমে পড়লো। বড়োটার চুল ছাঁটা. আর ছোট তিনটে দু-দুটো করে বেণী দুলিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল নিচে।

'খোলা ছাদে ওদের একটু একসারসাইজ করতে পাঠিয়েছিলাম—' বিনীত ভঙ্গিতে বললে প্রোপ্রাইটর।

'তা করুক না যত খুশি। তাই বলে আলসেব উপর দিয়ে ছুটতে হবে নাকি?' অতুলের চোখ থেকে আতঙ্কের আভাস তখনো কেটে যায়নি : 'ওদের কী. ওরা না হয় মাটিতে পড়ে গিয়েও হাসবে, কিন্তু এদিকে আমার প্রাণ যে খাঁচা-ছাড়া।'

প্রোপ্রাইটর হাসলো। বললে, 'কিছু ভয় নেই। ব্যালেন্স ওদের বেশ ভালোই শেখা আছে। রাতের শো-তে যাবেন না আজ? দেখবেন তখন সুভদ্রাকে।' প্রোপ্রাইটর আবার অতুলেব কাঁধ চাপড়ালো : 'আপনার কিড্‌নির কাজ নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে না। নইলে এই সামান্যতেই আপনার ভয়!'

ভাদ্র মাসের শেষ। থেকে-থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এখনো। দু-তিনটে বিল জড়িয়ে নদীর বিস্তৃতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। খেয়া-পারাপারের পাঁচ মিনিটের জায়গায় লাগে প্রায় এখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

এমন সময়ে এখানে সার্কাস-পার্টি আসছে শুনে অতুল গোড়ায় খানিকটা আশ্চর্য হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার চাষীরা ভাদোই খুব ভালো পেয়েছে, তাই তাক বুঝে ওদের থেকে লুটে নেবার মতলবেই যে এরা এসে পড়েছে

তাড়াতাড়ি, তা বুঝতেও অতুলের দেরি হয়নি। প্রথমটা সে ঠিক করেছিল সমস্ত সে ভণ্ডুল করে দেবে, চাষীদের বাঁচাবে সে এই অকারণ অপচয় থেকে। তাই, আগে, সার্কাস-পার্টির লোক যখন তার বাড়ির একতালাটা ভাড়া চাইতে এসেছিল, সে রাজি হয়নি। কিন্তু কালকের বৃষ্টিটা কেন-কে-জানে তার প্রতিজ্ঞাটা হঠাৎ মুছে দিয়ে গেল। বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল, ট্রেন আসবার আগেই। সন্ধে-সন্ধিতে সার্কাসের প্রোপ্রাইটর এসে অতুলের সঙ্গে দেখা করলে; বললে,—বাজারের মধ্যে তার নিজের যে বাড়িটা ঠিক করা হয়েছে তার সবই আছে কেবল ছাদ নেই, বৃষ্টিতে সপরিবারে তাই সে রাস্তায় এসেছে চলে, এখন অতুল যদি না দয়া করে তবে তারা আর ফিরে যাবারও রাস্তা পাবে না।

'যত ভাড়া আপনি চান—যা কিছু সুবিধে—' বৃহস্বপু প্রোপ্রাইটর দীন-দুর্বলের মতো বললে।

স্বদেশী-করা অতুল টলতো না, যদি না একটা বিদ্যুৎ উঠতো ঝলসে। চকিতে, ঝাপসা ভাবে, দেখলো ছোট-বড়ো একদল মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর মেঘ-গর্জনের মধ্যেও শুনতে পেলো তাদের টুকরো-টুকরো হাসির শব্দ।

অতুল ভেবে দেখলো চাষীদের নিরানন্দ জীবনে শ্রান্তিবিনোদনের পক্ষে সার্কাসটা মন্দ কী। সম্বৎসর কাটিয়েছে তারা শীর্ণতার মধ্যে, এখন যদি শস্যোচ্ছ্বাসের ফলে উদ্‌বৃত্তি কিছু ঘটে থাকে তাদের, তা দিয়ে ক'টা সন্ধ্যা তারা সম্ভোগ করুক না! কার্নিভ্যাল বা জুয়োখেলা হলে তার আপত্তি হতে পারতো, কিন্তু সার্কাসের মতো নির্দোষ প্রমোদ আর কী আছে! নিচের তলাটা অতুল ছেড়ে দিল প্রোপ্রাইটরকে।

একা মানুষ, বিয়ে করেনি, দোতলার দুখানা ঘরই অতুলের যথেষ্ট। খাতা-লেখার যে দু-জন মুহুরি নিচে একপাশে থাকতো তাদেরকে সে পাঠিয়ে দিল গদিতে। প্রোপ্রাইটর নিঃসঙ্কোচে প্রসারিত করলো নিজেকে।

সামান্য তেজারতি থেকে চালের বিরাট কারবার গড়ে তুলেছে অতুলের বাবা, কালীবর সিং। তাকে যে-কোনো অবস্থায় খুন করলেই যে তার গায়ের মাংসের ভাঁজ থেকে কম-সে-কম হাজার দশেক টাকা বেরিয়ে আসবে, এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি অত্যন্ত প্রবল। প্রৌঢ়তার সীমায় এসে কালীবরের হঠাৎ মদের প্রতি লিপ্সা জাগে এবং দেখতে-না-দেখতে কারবারটি সে গোল্লায় দিতে বসে। অতুল তখন

আইন পাস করে ওকালতি করবে, না আর কোনো ব্যবসা ফাঁদবে তারই কল্পনায় ব্যস্ত, এমন সময় বাবার আকস্মিক অধোগতির খবর তার কানে আসে। সটান গ্রামে ফিরে গিয়ে ব্যবসা সে নিজের হাতে তুলে নেয়, বাপকে তাড়িয়ে দেয় দেশের বাড়িতে, আর তার মদের খরচের জন্যে বরাদ্দ করে দৈনিক পাঁচসিকে। তারপর থেকে চালের ব্যবসা সে চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক. কিন্তু যাই বলো, কোনোই রোমাঞ্চ সে খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু নামে কি আর চিঁড়ে ভেজে? বাঁকতুলসী, সমুদ্রবালি বা বাসমতি? মন ওঠে কি শুধু পয়সায়? এক জায়গায় বসে থাকায়? অনেকে অনেক কিছুই বলেছে, কিন্তু কোনোটাই অতুলের পছন্দ হয়নি। আজকে হঠাৎ তার ভাবের বাষ্প ফুলতে-ফুলতে প্রকাণ্ড একটা তাঁবুর আকার ধারণ করলো। ভাবলো, সার্কাস!

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া, তাঁবু খাটিয়ে-খাটিয়ে। স্পেশ্যাল ট্রেনে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড খোলা ট্রাকে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া, শাল-কাঠের খুঁটি গ্যালারির তক্তা, খাঁচায়-পোরা বাঘ. শেকলে-বাঁধা হাতি। সমস্ত সময়-চিহ্নিত ট্রেনের পাশ কাটিয়ে এ-লাইন থেকে ও-লাইনে এঁকে-বেঁকে হঠাৎ বে-টাইমে এক অজানা জায়গায় চলে আসা, ভাবতেও কেমন নতুন-নতুন লাগে। ধরা-বাঁধা নেই, সিজিল-মিছিল নেই. সমস্ত কিছুতেই একটা অনিশ্চয়তাব ছাপ মারা। কোথায় থাকতে পাওয়া, আড়তে না আড়গড়ায়, কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া নিজেদের চা-রুটি জোটালেই চলবে না. বাঘের জন্যে চাই পাঁঠা, ঘোড়ার জন্যে চানা, হাতির জন্যে কলাগাছ। তারপর, কে জানে কী ভাবে লোকে নেবে; ব্যাণ্ড-বাজানো ও প্রোগ্রাম-বিলোনো গাড়ির পিছনে ছুটবে কেমন ছেলের দল. গ্যালারি ছাপিয়ে লোক নেমে আসবে কিনা ঘাসেব সতরঞ্চিতে। মোট কথা, তাঁবুটা ফাঁপবে না ফাঁসবে। সমস্তই একটা অদ্ভুত অন্ধকার—

দোতলার সিঁড়ির কাঠের রেলিং বেয়ে ঘূর্ণ্যমান একটা ঘাঘরা নিচে নেমে গেল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে কেউ বোধ হয় পড়ে গেল পা পিছলে—এমনি মনে হল অতুলের। হয়তো কেউ কাউকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নিচে, এখুনি হয়তো শুনতে পাবে একটা পিণ্ডাকার শব্দ আর কাতর আর্তনাদ। কিন্তু তখুনি আবার কার ঘুরন্ত ঘাঘরা সিঁড়ির উপর দিয়ে নেমে গেল ক্ষিপ্রছন্দে। এটাও পড়লো বুঝি মুখ থুবড়ে। বসবার চেয়ারটা উল্টিয়ে দিয়ে অতুল রুদ্ধশ্বাসে নেমে এলো। দেখলো, আগেরটা রত্না. পরেরটা লক্ষ্মী, এবার

রুক্মিণী—একের পর এক রেলিঙের উপর দিয়ে ছুটে নামছে আর নিচে থেকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছে তাদের সুভদ্রা।

যেন নেহাত বড়ো হয়েছে বলেই এমনিধারা ছেলেমানসি খেলায় সে শোভা পাবে না. এমনি একটি গরিমা তার চেহারায়।

'এরা যে নিউটনের আইনকেই অমান্য করছে—' অতুল আবার একটা আতঙ্কিত প্রতিবাদ করলো।

প্রত্যুত্তরে আবার সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হাসি। চোখে ঝিলিক দিয়ে সুভদ্রা বললে, 'এ সব কী! দেখবেন সন্ধের সময়।'

অনেক দিন এসব অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে শিখে নিয়েছে এরা ভাঙা-ভাঙা বাঙলা। বাধে না কোথাও।

উচ্চারণের মিষ্টি ত্রুটিটুকুর জন্যেই এদেরকে অতুল কথা কওয়াতে চায়। কিন্তু এরা বলে কম, হাসে বেশি।

'এখুনিই যা দেখছি তাইতেই তো সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।' বললে অতুল. বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে।

রত্নাকে ফের লুফে নেবার জন্যে সুভদ্রা হাত বাড়িয়ে দিল। বললে অন্যমনস্কের মতো, 'এসব তো আমাদের একসারসাইজ শরীরের আড় ভেঙে নেয়া—'

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছিল বুঝি। কিন্তু না, কী সবল বিশ্বাসী বাহু! কাঁধের কাছটা কত প্রশস্ত, পরিপুষ্ট! ওদিকে না তাকিয়েও কী অনায়াসে ও কত অভ্যাসবশেই যেন টেনে নিয়েছে রত্নাকে!

অতুল বললে, 'তুমি একবার দৌড়ুবে না এমনি?'

'বলুন আপনি ধরবেন এমনি নিচে থেকে?'

'সর্বনাশ! আমার ঘাড়ের উপর আশ্রয় নাও আর-কি!' মেয়েদের আরেক চোট হাসতে দিয়ে পালিয়ে গেল অতুল।

নিয়েছে এখানকার লোকেরা, প্রথম সন্ধেতেই।

ইস্টিশনের কাছে আম-বাগানের পিছনে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের; জ্বলছে দুর্ধর্ষ ডে-লাইট. বাজছে দুর্দম ব্যান্ড. আর জড়ো হচ্ছে এসে দুর্বার জনতা। একটি-একটি লণ্ঠন সম্বল করে এক-একটা পাড়া উঠে আসছে আস্ত। কাছে-পিঠে নয়, দূরের-দূরের গ্রাম। নদী-নালা পেরিয়ে মাঠ-ঘাট ডিঙিয়ে, জান-জাঙাল ভেঙে। ট্রেনে, গরুর গাড়িতে। কাচ্চা-বাচ্চা জোয়ান-বুড়ো, কেউ বাদ

নেই। রাতারাতি বসে গেছে সব দোকান-দানি, পান-সিগারেটের, তেলেভাজার, চা-বিস্কুটের। মেলা মনে করে আমগাছের ঝোপের ঝাপসাতে দাঁড়িয়েছে এসে দুয়েকটি গ্রাম্য গণিকা। অতুলের জন্যে তার নিজের বসবার চেয়ার নিয়ে আসা হয়েছে বাড়ি থেকে, তার আলাদা মর্যাদা। গণ্য-মান্য আর যাঁরা এসেছেন ‘পাসে’, বসেছেন তাঁরা সব সার্কাসের গোদা-গোদা কাঠের চেয়ারে, পিঠ খাড়া করে। প্রথম খেলাতেই সুভদ্রা যে সার্কাসী কায়দায় হাওয়াতে হাত হেলিয়ে অভিবাদন সেরে রাঙা সূক্ষ্ম হাসিটুকু হাসলো তা শুধু অতুলের জন্যে!

দৈন্য-দশা সার্কাসের, যদিও নামটা তার রাজকীয়। তাঁবুটা জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া, তাকালে তারা দেখা যায়। গ্যালারিতে বসবার জন্যে যে তক্তা তা যেন মূল আকারকে চিরে অর্ধেক করা। মেয়েদের আব্রুর আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে যে জালের পর্দা টাঙানো হয়েছে তা নিজেই নির্লজ্জ। খেলুড়েদের পোশাকগুলো ময়লা, কোথাও বা সেলাই-করা। ক্লাউন দুটো অমানুষিকভাবে কদাকার। আর, চাকর-বাকরগুলি সত্যি-সত্যিই চাকর-বাকরের মতো। কিন্তু যাই হোক, লোক হয়েছে বটে।

প্রথমেই ঝুলন্ত দোলনার খেলা, একটাতে সুভদ্রা আরেকটাতে নাগস্বামী। দোলনার নিচে চার কোণের চার থামের সঙ্গে বেঁধে দড়ির জাল টাঙানো। এমন অবস্থা, জালটা পর্যন্ত আস্ত নেই। উত্তরের প্রান্তে অনেকটা ফাঁক। মাঝখানটা আঁট আছে বলেই চলেছে এখনো!

ডে-লাইটগুলো টেনে তোলা হলো উপরে, বেজে উঠলো ব্যান্ড, বাঁশি আর ঢেঁটরা। হাত-ধরাধরি করে আসরে নামলো এসে সুভদ্রা আর নাগস্বামী। সুভদ্রার রঙটা মাজা-মাজা, এখন যদিও সেটা পাউডারে-পেন্টে অত্যন্ত তেজালো, কিন্তু নাগস্বামী নিরবচ্ছিন্ন কালো। শোভন গঠন, দীর্ঘাঙ্গ চেহারা, বয়েস ত্রিশের কাছে। সুভদ্রার শরীর দেখে বয়েস সম্বন্ধে যে ঊর্ধ্ব ধারণা হতে পারতো তা ঘা খায় এসে তার মুখের চারুতায়, কটাক্ষের কণ্টকে। যোগবিয়োগ করে কুড়ি-বাইশের বেশি মনে হয় না। নাগস্বামীর পরনে গেঞ্জির সাদা আঁট জামা, গায়ের সঙ্গে লেপটানো; কিন্তু সুভদ্রা এলো ঝোলা একটা আলখাল্লা গায়ে দিয়ে। বিস্ময়কর একটা উদ্ঘাটনের বিস্ময়কর নম্বর পাবার জন্যেই সে ঐ অবান্তর ঢিলে জামাটা গায়ে চাপিয়ে এসেছে। এমন নিরবশেষ ভাবে জামাটা সে গা থেকে খুলে ফেলে দিল যে, প্রথমটা অতুলের ভয় করে উঠলো। একটা অতলান্ত গুহার মধ্যে আকস্মিক পড়তে গিয়ে যেখানে সে ধাক্কা সামলে

দাঁড়িয়ে পড়লো, সে জায়গাটাও কম বিপজ্জনক নয়। সুভদ্রার গায়েও সেই লেপটানো আঁট জামা, গোড়ালি পর্যন্ত টানা, পায়ে রবারের রঙিন জুতো, নিরাভরণ হাত কাঁধ পর্যন্ত অনাবৃত. নিরবকাশভাবে মসৃণ। লাবণ্যলীলাজলে শ্রোণী যে তীর্থশিলা, এত দিনে মনে হল তাকে দেখে। পোশাক যে এত দুঃসাহসী হতে পারে, কে জানতো তা! সর্বাঙ্গে লালিত্য শুধু লিখিতই হয়নি, মোটা পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা হয়েছে। যে লালিত্য স্বাস্থ্যে স্ফূর্তিমান, কাঠিন্যের মেশাল পেয়ে যা সমীচীন। দেহের যদি সংকোচ না থাকে, সুভদ্রা মনেও নিঃসংকোচ।

হাওয়াতে হাত হেলিয়ে হাসলো একটু সুভদ্রা। ঠোঁটে রঙ মাখাটা সইতে পারতো না অতুল। কিন্তু পাতলা ঠোঁটে রাঙা টুকটুকে হাসি হাসলে কাউকে যে এমন সুন্দর দেখাতে পারে, এও বা তার জানা ছিল কই?

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে দুই দিক থেকে দুজনে তারা তরতর করে উঠে গেল উপরে. নাগস্বামী আর সুভদ্রা, ধরলো দুদিকের দুটো ঝুলন্ত দোলনা। তারপর লাগলো দুলতে; বসে, দাঁড়িয়ে, পায়ের খাঁজের সঙ্গে দোলনার দণ্ডটা আটকে রেখে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে। আরো নানা রকম দুঃসহ দুরবস্থায় বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। অত্যন্ত দ্রুত উদ্ধাবিত। গতি বা দ্রুতি শরীরে যে নবতন রেখার সঞ্চার করছে, তাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করবার আগে আরেকটা ভঙ্গি এসে গ্রাস করছে তাকে। ফুটে উঠছে বা আরো কতগুলি নতুন উদ্ধতি, নতুন উত্তেজনা। এখন. মাথা নিচু করে ঝুলতে-ঝুলতে এ-দোলনা থেকে ও-দোলনায় লাফিয়ে প'ড়ে পরস্পর জায়গা বদল করছে। নাগস্বামী কখনো বা অন্য দোলনায় গিয়ে আশ্রয় না নিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ে উড্ডীনোন্মুখ সুভদ্রাকে শূন্য থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে দুহাতে, আবার তক্ষুনি ছুঁড়ে দিচ্ছে তার পরিত্যক্ত দোলনায়। আবার, কখনো বা সুভদ্রা হাত বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে নাগস্বামীকে. ছেড়ে দিচ্ছে আবার তার নিজের সীমানার কিনারে। সমস্তটাই চলেছে একটা উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেগের মধ্যে। একটানা বাজছে শুধু ত্বরার তারস্বর।

এটাই আসল খেলা, মাথা নিচু করে দুলতে-দুলতে হঠাৎ এমনি ঝাঁপিয়ে পড়া অন্য হাতে, আবার অন্য হাত থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের দাঁড়ে চলে আসা। নাগস্বামী কী অবলীলায়. যেন প্রায় গভীর ঘুমের মধ্যেই, টেনে নিচ্ছে সুভদ্রাকে আর এমন নিষ্ঠুর ভঙ্গি করে তাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে যে, অতি কোমল ভাবেই সুভদ্রা উঠে আসতে পারছে তার নিজের জায়গাটিতে। একবার যেন

সে ইচ্ছে করেই সুভদ্রাকে ধরলো না হাত বাড়িয়ে, নিচে ফেলে দিল জোর করে। পড়ার প্রাবল্যে সুভদ্রা দড়ির জালের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো। সবাই ভাবলো, একটা বোধ হয় ছন্দপাত হয়েছে, কিন্তু পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করবার আগেই সুভদ্রা লাফ মারলো শূন্যে, আর নাগস্বামী তাকে আলগোছে লুফে নিল দুহাতে এবং দুলতে-দুলতে দুজনে এমনভাবে হঠাৎ সংস্রবচ্যুত হয়ে গেল যে, নাগস্বামী ধরলো শূন্য দোলনাটা আর সুভদ্রা ধরলো নাগস্বামীরটা। উল্লাসে, হাততালিতে তাঁবু আরো ফুলে-ফেঁপে উঠলো।

আরো অনেক খেলাতেই সুভদ্রা; একক দোলনার পায়ের আঙটার সঙ্গে দোলনার দাঁড়টা আটকে রেখে উন্মত্ত গতিতে ঘোরা—সেখানে সমস্ত রেখা, সরল বা বক্র, বৃত্তের এবং কিছু পরে বিন্দুর আকার নিয়েছে। জাপানী ছাতা মেলে তারের উপর দিয়ে হাঁটা-ও সুভদ্রা। অন্য দিকে রত্না হচ্ছে আরেক ছত্র-ধারিণী। পরস্পরের দিকে মুখ করে এগিয়ে আসতে-আসতে আবার পিছু নিচ্ছে, এরি মধ্যে একবার হঠাৎ একে অন্যের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে উলটো কোটে। সুভদ্রার সঙ্গে-সঙ্গে রত্নাও নাচছে, সমান গতিতে, কিন্তু বিপরীত ভঙ্গিমায়, যখন তারা একজন আরেকজনের পিছনে। রত্না যখন বাঁ পা তুললে, সুভদ্রা তুললে ডান পা। কিন্তু যখন তারা মুখোমুখি, তখন তাদের পা এক হলেও পাক-খাওয়াটায় থেকে যাচ্ছে সেই বৈপরীত্য। তারপর, হাতলহীন সাইকেলের খেলাতেও সুভদ্রাই অগ্রণী। একদল ছেলেমেয়ে দৈর্ঘ্যের অনুপাত অনুসারে সাইকেলের আকার, সবচেয়ে বড়োটা সুভদ্রার, ছোটটা রাঘবের—পাঁচ বছরের। ছোট-বড়ো বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে যাওয়া, তারপর দীর্ঘ একটা রেখা হয়ে হাত ধরাধরি করে চলে যাওয়া তাঁবুর বাইরে। সবচেয়ে দুর্দশার কথা হচ্ছে এই, বারে-বারে সুভদ্রা পোশাক বদলে আসতে পারছে না। হয়তো বদলাচ্ছে চুলের রিবনটা বা কোমরে জড়ানো মখমলের পটিটা। কিন্তু কীই বা হতো পোশাক বদলে? ঢাকতে পারতো না তার এই যৌবনের বন্যতা। এমনি অটুট হয়েই থাকতো তার রেখার কৌটিল্য।

সাজঘরেই ঢুকতে চেয়েছিল অতুল কিন্তু প্রোপ্রাইটর হেসে বললে, সার্কাসের গ্রীনরুমটা একটা নির্বাক রুদ্ধশ্বাস জায়গা, সেখানে গালগল্প দূরে থাক, সাধারণ কথাবার্তা পর্যন্ত বারণ, থিয়েটারের গ্রীনরুমের সঙ্গে এই তার তফাত। ও-জায়গায় বচন, এ-জায়গায় ব্যায়াম। সব কথা বাড়িতে গিয়ে হবে। কিন্তু বাড়িতে এসে প্রোপ্রাইটর বললে, সেকেন্ড শো-র পরে মেয়েরা অত্যন্ত শ্রান্ত

হয়েছে, এখন আর ওদের রাত জাগতে দেওয়া ঠিক হবে না। রোজ-রোজ দুবার করে শো, পর্যাপ্ত ঘুম না পেলে ওদের চলবে কেন?

দেখা গেল পরদিন ভোরবেলা, বাড়ির কাছেই নদীর ধারটিতে। কিন্তু সুভদ্রার পরনে তখন শাড়ি, কাছা-দেওয়া, টান করে আঁটতে গিয়ে বাঁ হাঁটুর কাছাকাছি পর্যন্ত যা-একটু সামান্য অসাবধান। নচেৎ শাড়িতে তার অনেক বিস্ফার, অনেক বাহুল্য, রাতের সুভদ্রার লেশমাত্র অবশেষ নেই। সমস্ত কটি রেখা এমন স্তিমিত, মুহ্যমান; সমস্ত উদ্ধতি এখন ক্লান্তচেতন, বিষাদ-বিনীত। ভালো লাগে না এই বিষম ছন্দপাত, কেমন অদ্ভুত লাগে। আঁট, লেপটানো ইজেরের বদলে এই স্থূল হ্রস্ব কাছা, বহুলবিশৃঙ্খল আঁচল। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, কিন্তু মুখে একটুও প্রসাধন নেই, নেই আর সেই ঠোঁটের লালিমার অস্তাভা। ভীষণ বেমানান, প্রায় একটা হোঁচট খাওয়ার মতো।

স্বাস্থ্যের প্রতি যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রোপ্রাইটর হয়তো ভোরের হাওয়ার জন্যে নদীর ধারে সুভদ্রাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বেড়াতে। কিন্তু সমস্ত ঢাল গ্রাস করে নদী এখন প্রায় রাস্তার ধারের বাড়িগুলি ছোঁয়-ছোঁয়, এখন এখানে বেড়াবার জন্যে ফাঁকা জায়গা কোথায়? অতুলের আন্দাজটাই ঠিক, সুভদ্রা হাওয়া খাচ্ছে না, একটা মাঝারি আকারের পিতলের গামলাতে করে চাল ধুচ্ছে।

'একি, সার্কাসের মেয়ের এ কী কাজ?'

সুভদ্রা মৃদুরেখায় হাসলো। বললে, 'কেন, সার্কাসের মেয়ে ভাত খাবে না?'

'তা হয়তো খাবে, কিন্তু চাল ধোবে কেন?'

'তবে কে ধোবে?'

'কেন, চাকর!'

'ইস্, চাকর! কেন আমার এ হাত দুটো কী দোষ করেছে!' বলে সুভদ্রা তাকালো তার দুই কর্মলিপ্ত বলিষ্ঠ বাহুর দিকে এবং তক্ষুনি অতুলের উৎসুক চক্ষুর সঙ্গে দৃষ্টির সংঘর্ষ হতেই ঈষৎ শিউরে উঠলো। কিন্তু সে লজ্জা, সে আনন্দস্পন্দটুকুকে সে মিলিয়ে দিল এক ফুঁয়ে। বললে: 'শুধু চাল ধোয়া কী এখন গিয়ে সবার জন্যে রান্না করবো আমি। উনুন ধরিয়ে এসেছি দুটো। ঝাঁটপাট, জামা-কাপড় কাচা, কখন সব শেষ হয়ে গেছে—আপনি তো ঘুমুচ্ছিলেন দিব্যি। রান্নার পরে আবার বাসন-মাজা জল তোলা—কত কাজ, কাজের কিছু শেষ আছে? আর, সার্কাসের মেয়ে ছাড়া কেউ পারবে এত কাজ করতে?'

এ কি শুধু স্পর্ধা, না এতে একটু বিষাদ একটু-বা বিতৃষ্ণা আছে অনুচ্চারিত?

মেয়েদের পক্ষে গেরস্থালির কাজ করা তো ভালোই, বিশেষত ভারতীয় মেয়েদের এই তো আদর্শ, অতুল এমনিধারা একটা বিবর্ণ বক্তৃতার অংশ আওড়ালো। কিন্তু কথাটা তো তা নয়, অবস্থা যাদের ভালো, সমাজে যারা সম্ভ্রান্ত. তারা এই সব তুচ্ছ পরিশ্রমের কাজগুলি চাকর-ঠাকুরকে দিয়েই করায়।

'হ্যাঃ. ঠাকুর রাখবে! কী বা সম্ভ্রম আর কী বা জোটে সার্কাসে!' সুভদ্রা একটা হতাশ্বাসের শব্দ করলো।

এই সূত্রে জানা গেল সুভদ্রার পৃষ্ঠপটটা। দি রিগ্যাল সার্কাসের প্রোপ্রাইটরের নাম সংক্ষেপে তাতাচারী. বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, স্ত্রীর নাম কৌশল্যা। মন্থরা রাখলেই নাকি ঠিক হত, চরিত্রের দিক দিয়ে। তবে এক হিসেবে কৌশল্যা নামটাও নাকি সার্থক, কেননা বহু সন্তানেব বোঝা টেনে-টেনে পঙ্গু হয়ে পড়ার পর থেকে তাতাচারী নাকি একটি কৈকেয়ীর সন্ধান করছে। সুভদ্রা কৌশল্যার ছোট বোন, লতাপাতা ছেড়ে আগাছার সম্পর্কে। শৈশবেই বাপ-মা হারিয়ে পড়েছে এই বোনের খপ্পরে, ক্রমে ক্রমে তাতাচারীর আয়ত্তের মধ্যে। তাতাচারী যৌবন থেকেই উদ্দাম, ভাগ্যান্বেষী। ঘুরেছে অনেক দেশ, কোনো কিছুতেই মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত সার্কাস নিয়ে যে আছে, সে শুধু জায়গায় জায়গায় ঘুরতে পাবে বলে। এককালে ইস্কুল-মাস্টাব ছিল বলেই সার্কাসে বাঘের মাস্টার হতে পেরেছে। মেয়ে জাতটার প্রতি তার মমতা নেই. তাই সুভদ্রা না-হয় পর, নিজের মেয়েগুলোকে পর্যন্ত সার্কাসে নামিয়েছে। যদি মেয়েগুলোর শরীর ভালো থাকে, আলুনি না হয়ে যায়, তবে চিরকালই ওদেরকে এমনি নাচাবে, বিয়ে দেওয়াবে না। যে স্বাস্থ্য ও শক্তি ওদের হল, সে আর-কোথাও সম্পদ হয়ে উঠতে পারবে না লাগবে শুধু সার্কাসের বিজ্ঞাপনে।

'কিন্তু তোমরা ছাড়া আরো মেয়ে তো আছে—'

'আছে বৈকি। ঐ যে দাঁতের খেলা দেখায়, সে তো আর্মিনিয়ন মেয়ে আর ঐ চুল দিয়ে যে গাড়ি টানলো সে একটা জুয়েস। ওদের কথা বলবেন না, ওরা যাচ্ছেতাই, যেমন দেখতে তেমনি শুকতে। পয়সার জন্যে এসেছে, পয়সার জন্যে ভেসে যাবে। কিন্তু যে যাই বলুক, যদ্দিন আমি আছি, তদ্দিনই সার্কাসের জৌলুস।' চোখে ঝিলিক দিয়ে সুভদ্রা হাসলো।

'কেন, ছেলেরাও তো আছে।'

'হ্যাঁ. নাগস্বামী আছে, আছে রত্নসভাপতি, আছে রামানাথন। কিন্তু এক রাত্রে আমাকে আর রত্নাকে বাদ দিয়ে দিন, দেখবো জ্বলে কেমন ডে-লাইট!'

'এত যখন তোমার প্রতিপত্তি, তখন তো সার্কাসের খুব ভালো অবস্থা!'

'হওয়াই তো উচিত। কিন্তু শুনতে পাই শুধু, ধার আর ধার। তাঁবুটা সেলাই হয় না, দড়ির নেটটা ফাঁক হয়ে থাকে। আর বারে-বারে আমাকে শুধু একই পোশাকে এসে সেলাম ঠুকতে হয়।' সুভদ্রা উঠে দাঁড়ালো।

'ধার—এত ধার কিসে?'

'যে-মেয়েটা পিপের খেলা দেখালো শুয়ে-শুয়ে, তার চিকিৎসার জন্যে নাকি সর্বস্ব শেষ হয়ে গেছে তাতাচারীর—'

'কই, কে আবার পিপের খেলা দেখালো?'

সুভদ্রারই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালো অতুল। দেখলো সামনেই তাতাচারীর বপুষ্মতী মেদমন্থরা সুবিশালা স্ত্রী এক চোখে কৌতূহল ও অন্য চোখে ক্রোধ নিয়ে আছে দাঁড়িয়ে।

সুভদ্রা বললে, 'আমি সার্কাসের মেয়ে, ভয় করিনে।'

দুপুরের দিকে সুভদ্রাকে আবার পাওয়া গেল নদীর ঘাটে, সঙ্গে এক কাঁড়ি বাসন।

অতুল বললে, 'যাই বলো, তোমার জোর করা উচিত।'

'কিসে?'

'ঠাকুর-চাকর রাখা নিয়ে। তোমার দামে নিশ্চয়ই দুটো ঠাকুর-চাকর রাখা যায়।'

'তা কে না জানে? ঠিকমতো মাইনে পেলে এ্যাদ্দিনে আমার একটা মোটর গাড়ি হত। অন্তত কিছু গয়না।' তাকালো বুঝি একবার রিক্ত গলা ও মণিবন্ধের দিকে।

'কিছু আছে নাকি এখানে মাইনে?'

'পরিবারের জন্যে খাটছি, তার আবার মাইনে কী!'

'পরিবারের জন্যে!'

'তা ছাড়া আবার কী? আমার আর কে আছে!' শেষের দিকের কথাটা একটু কাতর শোনালো বোধ হয়।

'না, তোমার এর প্রতিকার করা উচিত। মানায় না তোমাকে এসব নোংরা কাজে।'

'বলো কী! এই তো আসল কাজ। নইলে সারা জীবন কি দুলবো নাকি গাছে চড়ে?' সুভদ্রা লজ্জালু চোখে হেসে উঠলো। পরে খুব জোর

দিয়ে বাসন মাজতে-মাজতে বললে, 'এসব কাজের জন্যেই তো শরীরের শক্তি ধরা সার্থক আমাদের।'

'না, মোটেই ভালো দেখায় না তোমাকে—' কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অতুল বললে।

'ভালো দেখায় না?' আঘাতের মতো কথাটা লাগলো যেন সুভদ্রার। চমকে উঠে বললে 'কেন? কিসে?'

'এই কাজের ভঙ্গিতে! পোশাকে।'

'ওমা, পোশাক আবার কি দোষ করলো?' সুভদ্রা সন্ত্রস্ত হয়ে শাড়ির হ্রস্বতাগুলোকে বিস্ফারিত করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

'এই শাড়ির চেয়ে তোমার সার্কাসের পোশাকটা অনেক সুন্দর, অনেক তেজী।'

'ওমা, কী লজ্জা!' মাথা ঝুঁকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো সুভদ্রা।

'আমি যদি সার্কাসের কর্তা হতাম বদলাতে দিতাম না তোমাকে ঐ পোশাক।'

'কী সর্বনাশ! ভীষণ কুচ্ছিত দেখাতো সে আমাকে।' বাহুর আড়ে মুখ লুকিয়ে হাসির আরেকটা ঢেউ সুভদ্রা শেষ করলো।

'তুমি তো কত বোঝো! কুচ্ছিত দেখায় তো খেলার সময় পরো কেন ঐ পোশাক?'

'বা, ও তো খেলার সময়। যখন শরীরটা ঘুরছে, দুলছে, জট পাকাচ্ছে। যখন কেবল ছোটা আর চক্কর খাওয়া, চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকা নয়। তখন তো শরীরটাকে শরীর বলেই মনে হয় না একদম। এখন—এখন যেন কেমন ভার-ভার মোটা-মোটা লাগে কেমন এলোমেলো। তাই নয়?'

'এখন একেবারে যাচ্ছেতাই। চেনাই যায় না তোমাকে। সেই আঁট, ডাঁটো শরীর দেখায় এখন কেমন ঢ্যাবঢেবে।'

'দেখাক।' সুভদ্রা যেন রাগ করে উঠলো, 'তাই বলে আমি সত্যিকারের যা তাই হবো না? চিরকাল ঝুলবো শুধু শূন্যে মাটিতে নেমে আসবো না? কুটবো না কুটনো, মাজবো না বাসন?

'না, হবে না বাসন মাজতে।' বাজের হুমকির মতো চেঁচিয়ে উঠলো কে রাস্তার উপর থেকে। দেখলো, তাতাচারী স্বয়ং। শুকিয়ে মুখ এতটুকু হয়ে গেল সুভদ্রার।

শুধু ইট-কাঠ দিলে চলবে না, নগদ টাকা দিতে হবে। ক'দিনের খরায়

পর বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাঁবু গিয়েছে চুপসে, ভিজে সপসপ করছে নিচের শতরঞ্চি। ছেদ বুঝে ব্যান্ড বাজাতে চাইলেও লোক জমছে না। খেলুড়েদের হজম হচ্ছে না ব্যায়ামের অভাবে।

এমনি যখন অবস্থা তখন তাতাচারীকে নরম করবার জন্যে অতুলের ইচ্ছে করলো বলে,—পথ দেখো। কিন্তু তাতাচারী পথ দেখলে সুভদ্রাও বেরিয়ে যায়, তাই জিভের ডগা থেকেই কথাটা ফিরিয়ে নিতে হয়। কী আশ্চর্য, এক বাড়িতে থাকবে, আতিথেয়তার প্রশ্রয় নেবে ষোলো আনা, কিন্তু কিছুতেই ঘনিষ্ঠ হতে দেবে না, তাতাচারীর এ কী অত্যাচার! তাকে না জানিয়ে তারই বাড়িতে যেখানে-সেখানে সে বেড়া তুলবে এই বা কেমন ব্যবহার!

কিন্তু ঝগড়া করে লাভ নেই। টাকা দিতে হবে কোনোরকমে। কিন্তু, টাকা শুধু রোজগার করাই কঠিন নয়, ঠিকমতো অপব্যয় করবার জন্যেও সুবর্ণ-সুযোগের দরকার।

শেষে কিছু হদিস না পেয়ে অতুল একটা সোনার হার কিনলো। তাতাচারীকে বললো, 'এমন সুন্দর খেলা সুভদ্রার, ওকে একটা উপহার দেব।'

'কী, মেডেল?' উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাতাচারীর চোখ।

'না, নেকলেস।'

ম্লান চোখে মুখ গম্ভীর করে তাতাচারী বললো, 'না, মাফ করবেন, ও-সব হালকা জিনিস পারবো না নিতে।'

'হালকা জিনিস? দেখুন না ওজন! সাতআট ভরির কম হবে না। আর দাম কত আন্দাজ করতে পারেন?'

'অত দামী বলেই তো জিনিসটা হালকা। ও গলায় পরলে মনটা নরম, মেয়েলি হয়ে আসবে, চোখেও লাগবে একটু সোনালি ভাব, সেটা সার্কাসের মেয়ের পক্ষে ঠিক নয়। সার্কাসের মেয়ে হবে শক্ত, মজবুত বুকে তারা পাথর ভাঙবে, মোটর তুলবে। ও-সব হার গলায় দিয়ে বাইজি সাজবার তাদের পার্ট নয়। তার চেয়ে মেডেল দিন, যত খুশি, অনেক মান বাড়বে সুভদ্রার।'

সুভদ্রারই নিজের কথা তাতাচারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করলো। তার বুক কি শুধু ভার বইবার জন্যে, হার বইবার জন্যে নয়? সে কি নরম হবে না কোনো দিন, নরম বলে বুঝবে না কোনো দিন নিজেকে? সে কি চিরকাল নিক্ষিপ্ত হবে শূন্যে, নেমে আসবে না মাটির স্বত্ব-সীমায়? কিন্তু এ-সব কথা বলে কি-করে? এর একটাও যে অতুলের নিজের কথা নয়।

কিন্তু একদিন সুযোগ এলো। আর্মিনিয়ন মেয়ে তার খেড়ীসমেত কলকাতা চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তাতাচারী মিটিয়ে দিক তাদের সর্তের টাকাকড়ি। দুশো টাকার উপর। তাতাচারী বললে, টাকা কোথায়?

ঝগড়াটা জিহ্বাগ্র থেকে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রায় সঞ্চারিত হচ্ছে, এমনি সময় অতুল এসে মাঝে পড়লো। বললো, দাঁতের খেলাটা সে কিনে নেবে। আর্মিনিয়নদের মিটিয়ে দিল পাওনা, বাধ্য করলো দু-দশ দিন আরো থেকে যাওয়ায়। বললে, শরতের নীল ধরেছে আকাশে, মেঘ সাদা হয়ে আসছে, বৃষ্টি এই তাঁবু গুটোলো বলে। এখনো চাষীদের ঘরে ধানের পাহাড়, এখনো তারা ঘটি-বাটি পেঁছে-খাড়ু বেচতে শুরু করেনি। হাঁটতে শুরু করেছে পয়সা, দেখা যাক আর এক হপ্তা হয়তো দৌড়ুতে শুরু করবে।

রামানাথন আস্ত-আস্ত জ্যান্ত মাছ গিলে খায়, আর আস্ত-আস্ত সেই জ্যান্ত মাছ উগরে ফেলে ফের টামব্লারের জলে। সত্তর টাকায় তার খেলাটাও সে অতুলকে বেচে ফেললে।

নাগস্বামীকে বললে অতুল, 'তোমার খেলাটাও বেচো না? যত তুমি চাও।'

লজ্জিত হাসি হেসে নাগস্বামী বললে, 'সুভদ্রাকে ছাড়া আমার খেলার দাম কী। সুভদ্রা কি বেচবে?'

সুভদ্রার খেলার মালিক সুভদ্রা নয়। কিন্তু তাতাচারী রাজী হবে কেন? সে কি আর ব্যবসা বোঝে না?

'বাবুজী—।' নাগস্বামী ডাকলো।

অতুল তাকিয়ে দেখলো নাগস্বামীর কালো দুই চোখে ছুরির ফলার মতো একটা মতলব চকচক করছে।

'ও-সব খুচরো খেলা কিনে নিয়ে লাভ কী বাবুজি, কত আর পাবে মুনাফা? নতুন একটা নিজের সার্কাস খোলো।'

বৃষ্টি ধরে যাওয়াতে এখন ফের শো শুরু হয়েছে, কাতারে-কাতারে আসছে আবার গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক। দু-দুটো খেলার মালিক হয়ে আনুপাতিক মুনাফা যা পাচ্ছে অতুল, তা তার আশার অনেকখানি উপরে। এখন নাগস্বামীর কথায় আশাটা প্রায় তাঁবুর মাস্তুলের কাছাকাছি এসে ঠেকলো। 'তুমি আসবে?' অতুল নাগস্বামীর হাত চেপে ধরলো।

'আমার আসতে কতক্ষণ! কিন্তু কথা হচ্ছে সুভদ্রাকে নিয়ে—'

'আসবে না সুভদ্রা?'

'আসা তো উচিত। এখানে তো ওকে শুষে নিচ্ছে তাতাচারী। আর ওর ভবিষ্যৎ কী। রত্নার মা মরবে আর তাতাচারী বিয়ে করবে ওকে। ও কি বুঝতে পাচ্ছে না কিছু?'

'তবে তুমি একবার চেষ্টা করো।'

'তুমি চেষ্টা করলেই হবে। টাকা, টাকাই যথেষ্ট। আমার যদি টাকা থাকতো তবে কত কী করতে পারতাম! টাকা নেই তো কিছু নেই।'

নাগস্বামী একটা নিশ্বাস ফেললো।

অতুলের টাকা আছে বলেই কি সব আছে—একবার ভাবলো অতুল। কে জানে, কে বলতে পারে! দেখা যাক না সার্কাসের তাঁবু মেলে, দোলনা দুলিয়ে।

ভিতরে থেকে নাগস্বামীই বন্দোবস্ত করে দিলে। সেকেণ্ড শোর ঠিক শেষ হবার আগে পুরুষ খেলোয়াড়দের পরিত্যক্ত তাঁবুতে, খোলা গ্যাসের আলোয়। সুভদ্রার তখন সার্কাসের পোশাক। খোলা থামের আলো কেঁপে কেঁপে কখনো আভা কখনো বা ছায়া ফেলে পুরন্ত রেখাকে মৃদু ও মৃদু রেখাকে পুরন্ত করে তুলছে।

নাগস্বামীর কথাতেই সুভদ্রা বুঝতে পেরেছে যেন ষড়যন্ত্রের আভাস, তাই ঝাপসা গলায় জিগগেস করলে, 'কী?'

'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'আমি নতুন সার্কাস খুলেছি—সেই দলে। সবাই আসছে—তুমি যদি আস—'

'আবার সার্কাস!' সুভদ্রা যেন থেমে পড়লো।

'হ্যাঁ, এইখানে যখন সার্কাস, তখন আবারও সার্কাস বইকি। কিন্তু এইখানে শুকনো, শূন্য, ওখানে নগদ টাকা—এই দেখো, পাঁচ শো—' অতুল পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে ধরলো।

'কত বললেন? পাঁচশো? সর্বনাশ! গুনতেই পারবো না।' কথাটা উড়িয়ে দিলে সুভদ্রা। যেন এটা উড়িয়ে দেবার কথা!

অতুল বললে, 'সিজন নয়, মাস-মাস মাইনে। রেজেস্ট্রি করে নেবে ডিড্; তোমার নিজেদের দলের লোক সব সাক্ষী হবে। কি, ঠকাবো ভাবছ? আরও যারা আসছে—'

'না, না, ঠকাবেন কেন? এর চেয়ে বেশি আর আমি কী ঠকতে পারি

বলুন? কিন্তু কথাটা তা নয়। বলি, নতুন কিছু খেলার কথা ভাবতে পারেন না? সেই সার্কাস, সেই দোল খাওয়া, সেই টোল খাওয়া, আর সেই ঘোরা আর ঘোরা? তবে তাতাচারী কী দোষ করলো?'

'শোনো—'

'বেশি সময় নেই। তাতাচারী আসছে এদিকে।'

'আসুক। সার্কাসের মেয়ে, সার্কাস ছাড়া নতুন খেলা আর কী দেখাবে তুমি? পাঁচশোতে না পোষায়—'

নাগস্বামীর দিকে তেরছা একটা চাউনি হেনে সুভদ্রা বিদ্যুতের মতো গেল মিলিয়ে।

অতুল বেরিয়ে এসে বললে, 'আর একবার সুবিধে করে দাও। কালকেই। ঠিকমতো জায়গায় টোকা মারা হয়নি। দেখি শেষ চেষ্টা করে।'

নাগস্বামী বললে, 'আচ্ছা।'

পরের রাতেই আবার নাগস্বামী বন্দোবস্ত করলে। সেটা বৃষ্টি-ফোঁপা রাত, হাওয়ার চাবুক-খাওয়া। অন্ধকার যেন হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। ডাকছে না ঝিঁঝিঁ, জ্বলছে না জোনাকি। নিজের কানে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনবার মতো স্তব্ধতা।

জ্বলছে সেই খোলা গ্যাস, কিন্তু তার শিখাটা আজ বেশি কাঁপছে। নাগস্বামী অদূরে দাঁড়িয়ে আছে বটে পাহারায়, কিন্তু অন্ধকারে তার অস্তিত্বের কোনো অনুভব নেই।

তেমনি নিভীক পোশাকে নির্ভয় সুভদ্রার আবির্ভাব।

'কি, নতুন খেলা ভাবতে পারলেন কিছু?'

'পেরেছি।'

গলার স্বরে চমকালো সুভদ্রা। বললে, 'কী?'

'পাঁচশোর দ্বিগুণ। যাতে গুনতে না অসুবিধে হয়, দশখানা নোট এনেছি একশো টাকার।' বলে অতুল সুভদ্রার ডান হাতটা ধরে ফেললো। অতুলের হাতটা গরম, এত লাফালাফি করেও ধরাটা সুভদ্রার অজানা।

সুভদ্রা হঠাৎ ভঙ্গিটা কঠিন করে বললে, 'কী করবো ঠিক কিছু ভেবে উঠতে পারছি না, অতুলবাবু। হাতটা ছাড়িয়ে নেব, না, বাঁ হাত দিয়ে গলাটা টিপে ধরবো আপনার?'

অতুল হাতটা ছেড়ে দিল। বললো, 'তার চেয়ে দু'হাতে-জড়িয়ে ধরতে

পারো গলাটা।' বাপের বরাদ্দ পাঁচসিকে আজ পাঠায়নি নাকি অতুল? কী হল তার হঠাৎ?

'দু-হাত দিয়ে গলা জড়াবার মানুষ আপনি নন। পলকা ঘাড়ে পারবেন না ভার সইতে। মটকে যাবে।'

'অত দেমাক কিসের, কেউই সইবে না ঐ ভার। সার্কাসের মেয়ে, শরীর দেখিয়ে যার বাহবা, তার আবার স্পর্ধা কী! কে আসবে আর ঐ নিধানী মাঠের কাছে? কে বিশ্বাস করবে, আছে আর এতে শ্যামলের পরিচয়? তোমার পক্ষে হাজার টাকাটা কম ছিল না, সুভদ্রা।' দুর্বল হাতে অতুল আবার নোটগুলি মেলে ধরলো।

'এই তো—এই তো শেষ কথা?' সুভদ্রা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, আরো কিছু আছে?'

কাঁপতে-কাঁপতে গ্যাসের শিখাটা আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোটগুলি পকেটে পুরে রাখতে-রাখতে অতুল ক্লান্ত গলায় বললে, 'কেন, এত ব্যস্ত কেন?'

'না, তাতাচারী দেখে ফেলবে কখন।'

'তাতাচারীকে অত ভয় কিসের?'

'তাতাচারীকে ভয় নয়। অন্যায়কে দেখে ফেলে একজন ঠিক তাকে অন্যায় বলেই চিনবে, তার ভয়।'

'বলিহারি তোমার পছন্দ, সুভদ্রা। যেমন নিজে মোটাচ্ছ তেমনি প্রবৃত্তি-গুলিও মোটাচ্ছে। অন্যায় যে কোনটা তাই চিনতে পাচ্ছ না।' অনেক শান্ত, নিরাসক্ত অতুলের স্বর: 'নইলে ঐ বুড়ো ধুমসো তাতাচারী তোমার গলা জড়াবার মানুষ?'

'মন্দ কী!' ছুটে বেরিয়ে গেল সুভদ্রা, আর যাবার সময় নাগস্বামীকে দিয়ে গেল একটা প্রবল ধাক্কা। নাগস্বামী ধরতে গেল তাকে হাত বাড়িয়ে, পারলো না।

অতুল বললে, 'এই হাজার টাকা তোমার। আর এই বোতল।'

নাগস্বামী টাকাটা নিলো। কিন্তু বোতলটা ছুঁলো না। বললে, 'রক্ত এমনিতেই জ্বলছে, বাবুজি।'

অতুল চাপা গলায় বললে, 'ভুল হবে না তো?'

'আজ এত বচ্ছর ওকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছি, ছুঁড়ে দিচ্ছি আবার

হাতের ঘেরা থেকে, ভুল হবে আমার? ওর শরীরের প্রত্যেকটি ঢেউ আমার মুখস্থ, বাবুজী।'

'নেটটার মাঝখানটায় একটু—'

'না, না, উত্তরের দিকে যে ছেঁড়া আছে, তাই যথেষ্ট। ওখানে থামটা আছে বলেই আরো সুবিধে। টক্কর খেয়ে ঠিক গলে যাবে দেখবেন।'

তুমুল লোক হয়েছে সেদিন, আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও। গ্যালারির ভিড়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে অতুল, আর উপরে চলেছে দোলনার খেলা।

মিথ্যে কথা, নাগস্বামী রাজি নয় সর্ত-পালনে। যতবারই সুভদ্রা ঝাঁপিয়ে পড়েছে শূন্যে ততবারই নাগস্বামী তাকে লুফে নিচ্ছে আলগোছে, আর যতবারই ছুঁড়ে দিচ্ছে সুভদ্রাকে, ততবারই সে অবহেলায় ধরে ফেলছে তার নিজের দোলনা। সমস্তটাই যেন একটা অভ্যেস, তৈলাক্ত কোমলতা।

না, নাগস্বামীকে দিয়ে হবে না, ওর হাত মেলে-দেয়ার মধ্যে বা যেন একটি মমতার ভাব আছে। যাক হাজার টাকা, অন্য রাস্তা ভাবতে হবে। যে করে হোক, গুঁড়ো করে দিতে হবে সুভদ্রার স্পর্ধা, তার শরীরে ঐ পোশাকের ধৃষ্টতা।

এমন সময় প্রকাণ্ড একটা পিণ্ডাকার শব্দ, সঙ্গে-সঙ্গে শতকণ্ঠের সমবেত কাতরতা। নাগস্বামীর হাত থেকে উড়ন্ত অবস্থায় নিজের দোলনা ধরতে না পেরে সুভদ্রা পড়ে গেছে মাটিতে, উল্কার মতো ছিটকে। আর পড়বি তো পড়, নেটের মাঝখানে নয়, উত্তর প্রান্তে যেখানটা ছেঁড়া ঠিক সেই বরাবর।

খেলতে-খেলতে ওরা দুজনেই আজ ভীষণ মেতে গিয়েছিল, নানান রকম নতুন ভাঁজ ও ভঙ্গি দেখাচ্ছিল নাকি। একটা ছিল উড়ন্ত অবস্থায় শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে দোলনা ধরা। তারই শেষ লাফটাতেই এই দুর্ঘটনা। লোকে বললে, সুভদ্রারই হঠকারিতার জন্যে এটা ঘটেছে। অন্তত নাগস্বামী এই ভাবে ব্যাপারটা সাজিয়েছে যেন লোকে বলে সুভদ্রার হঠকারিতা।

সুভদ্রা অজ্ঞান, লেগেছে ঠিক নিতম্বের অস্থিতে। শোয়া-চেয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় হাসপাতালে। এ-হাসপাতালটার নিজেরই প্রায় য়্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে যাওয়ার দাখিল; সুতরাং রাত্রের ট্রেনেই সদর। সদর বললে, দুঃসাধ্য। চলো কলকাতা।

ক্যাবিনে থাকতে হল প্রায় এক মাস। সেখান থেকে ছোট একটা ভাড়াটে বাড়িতে। সমস্ত খরচ যোগালে অতুল, শুশ্রূষা করলে নাগস্বামী, আর

তাতাচারী নতুনতরো রুগ্নতার সামনে শূন্য চোখে চেয়ে রইলো। ডাক্তার বললে, খোঁড়া হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে, সার্কাস দূরে থাক, লাঠির ভর ছাড়া হাঁটতেই পারবে না। অতুল দেখলো পোশাকের তিরোধান, নাগস্বামী দেখলো দর্পের আর তাতাচারী পুনরুত্থানের।

যেদিন প্রথম বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে সুভদ্রা সেদিন তার বিছানার পাশে তিনজনই ছিল—তাতাচারী, অতুল আর নাগস্বামী। আরো অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া। কিন্তু সবাইকে ফেলে, এমনকি লাঠির আশ্রয় ফেলে, নাগস্বামীর কাঁধের উপর বাহুর ভর রেখে সুভদ্রা উঠে দাঁড়ালো। নাগস্বামী তাকে টেনে নিল সার্কাসের চেয়েও কোমলতর অভ্যাসে।

এক-পা দু-পা হেঁটে সুভদ্রা প্রশ্ন করলে নাগস্বামীকে, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে নিজে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলে, না?'

'কেন, তুমি বুঝতে পারোনি এতদিন?'

'বুঝেছি কিছু, সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি।' পরিপূর্ণ চোখ তুলে সুভদ্রা বললে, 'কেন ফেলে দিয়েছিলে বলো দিকি?'

'বা, এ আবার কে না বোঝে?' হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে গেল তারা ভোরের জানলার দিকে। নাগস্বামী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'নইলে তোমাকে বিয়ে করতুম কি-করে?'

বাজার আর ঘাট বিলি হবে এ-সময়, মহলে রিসিভারবাবু এসেছেন। বিলি হবে বাকি-পড়া নিলামী জমি। খাস জমি পত্তন হবে কতক। কাচারিতে বহু লোকের আনাগোনা।

জমিদারির সরিকদের মধ্যে বন্টনের মামলা হচ্ছে। নানান খেচাখেচিতে ডিক্রি আর চূড়ান্ত হতে পারছে না। রিসিভার বসেছে। রিসিভারের হাতেই এখন কর্তৃত্ব। সমস্ত কিছু চলছে এখন তার মুনিবানায়।

আগে জমিদারদের আমলে একটা উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব চলেছিল। অপব্যয়ের আর অপকর্মের। সে-সব দুঃস্বপ্নের কথা গ্রামের লোক এখনো ভুলতে পারেনি। তার সাক্ষ্য এখনো অনেক ছাড়া-বাড়িতে, মজা-পুকুরে ও ভাঙা-মন্দিরে লেখা আছে। লেখা আছে বেজাবেদা হিসাবের খাতায়।

কিন্তু রিসিভারবাবু একেবারে উলটো জাতের লোক। নায়েব-গোমস্তার মত ঘুষ নেন না বা বে-রসিদে টাকা নিয়ে গাপ করেন না। জমিদারদের মত মদ খান না বা কোথায় কোন বাগদি-বাইতি বা ধোপা-মুচির মেয়ে পাওয়া যাবে তার তালাস করেন না। স্বধর্মনিষ্ঠ, খাঁটি লোক। রাশভারি, নিরপেক্ষ, সূক্ষ্ম নিক্তিতে বিচার করেন। অন্যায় ক্ষমাও নেই, অন্যায় জুলুমও নেই। লোকে ভয়ও কবে কাছেও আসে।

নাম শৈলেশ্বর। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ।

'আমার একটা নালিশ আছে বাবু—'

কত নালিশই তো দিন-রাত শুনছেন. শৈলেশ্বর, জমা-ওয়াশিলের খাতার থেকে চোখ তুললেন না। বললেন, 'কি নাম তোর?'

'শ্রীনিবাস ঘাসী।'

'কি হয়েছে?'

'আমার পরিবারকে বার করে নিয়েছে হুজুর—'

অন্যরকম নালিশ। শৈলেশ্বর চমকে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। গলায় এল প্রায় বাজের হুঙ্কার : 'কে বার করে নিয়েছে?'

শ্রীনিবাস বললে, 'দুগগোচরণ।'

তা হলেও শৈলেশ্বর আশ্বস্ত হলেন না। হিন্দু বলেই এ দুষ্কৃতির শাসন হবে না, তিনি বরদাস্ত করে যাবেন, এ অসম্ভব।

'কে দুগগোচরণ?'

'দুগগোচরণ ভুঁইমালি। ক্রোকে-দখলে ঢোল পেটায়। থাকে পাশ-গাঁয়ে, বাঁশুরিতে।'

'ধরে আনো দুগগোচরণকে।' শৈলেশ্বর হুকুম দিলেন।

ছুটল কাচারির সিং। বরকন্দাজ।

'তোর বউ কোথায়?' জিগগেস করলেন শৈলেশ্বর।

'খুঁজে পাচ্ছি না।'

'দুগগোচরণ কোথায়?'

'সে আছে তার বাড়িতে।'

'সে-বাড়িতে লুকিয়ে রাখেনি তোর বউকে? দেখেছিস ভালো করে?'

'তন্ন-তন্ন করে দেখেছি। সেখানে নেই। আর কোথাও গুম করেছে।'

'থানায় গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলাম। দারোগাবাবুরা গা করে না। বলে, বায়না দে, তবে এজাহার লিখব। আমি বাবু গরিব মানুষ—' শ্রীনিবাসের নিরুদ্ধ শোক অশ্রুতে ফেটে পড়ল।

'দাঁড়া, আমি শ্লিপ দিচ্ছি ও-সি-কে। সঙ্গে পেয়াদা দিচ্ছি। চলে যা থানায়। দ্যাখ কি হয়। ভয় নেই, আমি আছি পিছনে।'

বরকন্দাজ ফিরে এসে বললে, 'দুগগোচরণ বাড়ি নেই। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে।'

শ্লিপে কাজ হয়েছে তা হলে। কিন্তু একা দুর্গাচরণকে ধরে লাভ কি? শ্রীনিবাসের বউকে পাওয়া দরকার।

পরদিন সকালবেলা দুর্গাচরণকে এনে হাজির করা হল।

সারা-রাত পুলিসের হেপাজতে বন্ধ হয়ে ছিল থানায়। বেদম মার খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। পিঠ দগড়া-দগড়া হয়ে গেছে। চোখ-মুখ ফোলা। কিন্তু শ্রীনিবাসের পরিবারের কোনো কিনারা নেই।

'কোথায় রেখেছিস ওকে লুকিয়ে?' শৈলেশ্বর গর্জে উঠলেন, 'ভালয়-ভালয়

বার করে দে শিগগির, নইলে খাড়া মারা পড়বি।। জেল তো হবেই, ভিটে-মাটি সব উচ্ছন্নে যাবে।'

'এখন সে কোথায় আমি তার কিছুই জানি না।' দুর্গাচরণ ভার-ভার গলায় বললে। 'সে' কথাটার মধ্যে অলক্ষ্যে যেন একটু আত্মীয়তা ফুটে উঠল। কানে লাগল শৈলেশ্বরের।

'কবেকার কথা জানিস তবে?'

'পরশু যশোমতী আমার বাড়ি এসেছিল সন্ধের সময়। বললে—'

'কে এসেছিল?' পরস্ত্রীর নাম এমন শুভ্র সারল্যের সঙ্গে উচ্চারিত করবে এ শৈলেশ্বর সহ্য করতে পারলেন না, ধমকে উঠলেন।

কিন্তু দুর্গাচরণের কুণ্ঠা নেই। বললে, 'কে আবার! যশো— যশোমতী। শ্রীনিবাসের পরিবার।' বলে পায়ে-দাঁড়ানো শ্রীনিবাসকে ইসারা করলে। সেই সঙ্গে শৈলেশ্বরও তাকালেন শ্রীনিবাসের দিকে। কুঁজো হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে উজবুকের মত। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, অবোলা জন্তুর মত চাউনি। জোর-জবরদস্তি নেই নিতান্ত ল্যাদাড়ে, লেজগুটানো। তার দিকে চেয়ে শৈলেশ্বরের, একবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল. কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। শ্রীনিবাস স্বামী। শ্রীনিবাস দুর্বল। শ্রীনিবাস উৎপীড়িত।

দুর্গাচরণের চেহারায়ও কোনো জেল্লা নেই। তবে এক নজরেই চোখে পড়ে তার বয়েস কম, তার সাহস বেশি। তার অনুভবটা পরিষ্কার। স্বীকৃতি নিঃসঙ্কোচ।

'ওদের মধ্যে বয়সে বড় কে?' শ্রীনিবাসকে জিগগেস করলেন শৈলেশ্বর।

'যশোমতীই বড়।' দুর্গাচরণ জবাব দিলে: 'আমার চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের বড়। তা হলে কি হবে? বলে, আমাকে তুই নাম ধরে ডাকবি। বয়েসে ছোট বলেই তুই ছোট হয়ে যাসনি। মেয়েমানুষের কাছে পুরুষ ছোট-বড় হয় বয়সে নয়, মেয়েমানুষ যে-ভাবে তাকে দেখবে সে-ভাবে। তাই সে আমাকে ডাকত দুগগোচরণ, আমি তাকে ডাকতাম যশোমতী।'

শৈলেশ্বর মার দেবার হুকুম দিতে জানেন না এমন নয়। ইচ্ছে হল পায়ের জুতো খুলে নিজেই বসিয়ে দেন ঘা কতক। কিন্তু ভেবে পেলেন না ওর শরীরে মারের আর জায়গা কোথায়। এত বিস্তারিত মার খেয়ে এসেও যে এমন তন্মন হয়ে কথা বলা যায় শৈলেশ্বর ভাবতে পারতেন না। ভয় নেই লজ্জা নেই আচ্ছাদন নেই।

আগের অসমাপ্ত কথায় তিনি ফিরে গেলেন। বললেন, 'পরশু সন্ধের সময় তোর বাড়ি এসে কী বললে ও?'

'বললে হতচ্ছাড়া সোয়ামীর ঘর আর করব না দুর্গাগোচরণ। তুই এখান থেকে কোথাও আমাকে নিয়ে চল। দূর-দূরান্তের শহরে গিয়ে দু-জনে কুলি হব তাও ভালো।'

'তুই কী বললি?'

দুর্গাচরণের ফোলা-ফোলা চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বললে. 'আমি এক কথাতেই রাজি। চাষা থাকি কি কুলি হই আমার কী এসে যায়, যদি যশোমতী সঙ্গে থাকে। আমি শুধু বললাম, এই রাতটা আমার এখানে থাকো, শেষরাতে ধানখালির ঘাটে গিয়ে ইস্টিমার ধরব।'

'তোর ওখানে যে থাকবে, বাড়িতে তোর পরিবার নেই?'

'ছিল হুজুর। ভাগ্যিমানি গেল-বছর গত হয়েছেন। ভালই গেছেন বলতে হবে নইলে মনে বড় দাগা পেতেন। করবার কিছুই উপায় থাকত না।'

শৈলেশ্বর হিম হয়ে রইলেন।

'তারপর কী হল?'

'রাতটা আর এরা কেউ ঘনাতে দিলে না। চলে এল থানার দারোগা. কাচারির বরকন্দাজ। ব্যাপারটা ঝাপসা-ঝাপসা টের পেতে-না-পেতেই আগে-ভাগে যশোমতী সটকান দিলে। এখন দেখতে পাচ্ছি স্রেফ হাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি পর্যন্ত জানি না।'

তার এই ভনিতায় কান দিলেন না শৈলেশ্বর। কি-রকম একটা কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর, জিগগেস করলেন 'পুলিশ গিয়ে না পড়লে শেষরাতেই বেরিয়ে পড়তিস দুজনে?'

'রাত শেষ হবার আগেই বেরিয়ে পড়তাম। ধানখালির ঘাটে না উঠে হেঁটে চলে যেতাম সেই পারগঞ্জে। যত আগে ধরা যায় ইস্টিমার। যত আগে নিবিয়ে ফেলা যায় হাতের লণ্ঠনটা।'

'কোথায় যেতিস?'

'তা ঠিক করিনি তখনো। ইস্টিমারে উঠে ঠিক কবতাম।'

'যেখানে যেতিস সেখানে গিয়ে বিয়ে করতিস যশোমতীকে?'

'বা, বিয়ে করতাম বৈকি। ও কি আমাকে চিরকালই 'তুই' বলবে নাকি? 'তুমি' বলবে না? বিয়ে না করলে 'তুমি' বলবে কবে?'

শৈলেশ্বর ঢোক গিললেন। 'পরের তালাক-না-করা স্ত্রীকে তুই বিয়ে করবি এমন আইন আছে সংসারে?'

উদাসীনের মত দুর্গাচরণ বললে, 'আইনের আমরা কি জানি?'

'কি জানিস মানে?'

'এখান থেকে তো চলেই যাচ্ছিলাম আমরা।'

যেন যেখানে যাচ্ছিল সেখানে কোনোই আইন নেই।

'যেখানেই যেতিস লম্বা জেল হয়ে যেত।'

'জেল হয়ে যেত?' নির্বোধ বিস্ময়ে দুর্গাচরণ বললে, 'পাপ করলাম না, অধর্ম করলাম না, তবু জেল হয়ে যেত?'

'পাপ করোনি হতভাগা?' আর সহ্য হচ্ছিল না শৈলেশ্বরের। 'পরের বউকে স্বামীর আশ্রয় থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছ, সেটা পাপ নয়? ঘাড় ধরে হারামজাদাকে বার করে দে তো রাস্তায়—'

বরকন্দাজের ঘাড়কাতা খেয়ে দুর্গাচরণ রাস্তার উপর পড়ল মুখ থুবড়ে। শৈলেশ্বরের মনে হল শ্রীনিবাসকেই বুঝি ফেলে দেয়া হল ভুল করে। কিন্তু না ভুল হবে কেন। শ্রীনিবাস স্বামী, তার কোনো অপরাধ নেই।

'এখনো যদি খোঁজ দিতে পারিস যশোমতীর, জেল থেকে রেহাই পাবি। নইলে রক্ষে রাখব না।'

'খোঁজ তো এখন আমারই চাই।' গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে দুর্গাচরণ বললে, 'কিন্তু ওর ছেলের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'ছেলে? ওর আবার ছেলে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ আছে একটি আট-নয় বছরের। রজ্জব আলি চৌকিদারের বাড়ি কাজ করে। খেতালি-রাখালির কাজ। আরো দুটি ছিল ছোট-ছোট। বছর দুই আগে মারা গেছে পর-পর। যে-বছর চালের দর হয়েছিল আশি টাকা, সেই বছরই শ্রীনিবাস একটু বিদেশ গিয়েছিল টাকার জোটপাট করতে। ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড। এরি মধ্যে মনের মত নাগর জুটিয়ে নিয়েছে যশোমতী।'

ডাকো রজ্জব আলিকে।

কি ব্যাপার? শ্রীনিবাসের পরিবার তোমার বাড়িতে আছে নাকি?

সে কি কথা? রজ্জব আলির প্রায় ভির্মি যাবার দাখিল।

'তোমার বাড়িতে ওর ছেলে কাজ করে তো? তাকে দেখবার জন্যেও তো ওর মা যেতে পারে সেখানে।'

'কার ছেলে? ও তো আমার ছেলে। আমি ওর পালক-পিতা।' রজ্জব আলি তেজী গলায় বললে, 'আমি ওকে নগদ কুড়ি টাকায় কিনেছি। শ্রীনিবাসই বেচেছে হাতে ধরে।'

কথাটা সত্যি, শ্রীনিবাস অস্বীকার করতে পারল না। দুর্ভিক্ষের বছর বেচে দিয়েছিল সে ছেলেকে। যাতে সে না মরে, যাতে দুটি তারা বাপে মায়ে খেতে পারে দু'দিন।

না এখনো মসজিদে কলমা পড়ায়নি ছেলেকে, নাম আগের মত সেই প্রহ্লাদই আছে। বেশ, টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন শৈলেশ্বর। সুদও দিচ্ছেন কিছু, বাপের কাছে পাঠিয়ে দিক প্রহ্লাদকে। আইন-কানুনই ছিল না, তখন আবার দান-বিক্রি কি! সে-দুঃসময়ে লোকের বুদ্ধি-বিবেচনাই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। শ্রীনিবাসও সেই সব হাড়-হাবাতের দলে। তার ঘর-বাড়ি রুজি-রোজগার সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে তার ছেলে। ফিরিয়ে আনতে হবে তার পরিবার।

রজ্জব আলির আপত্তি নেই।

কিন্তু আপত্তি প্রহ্লাদের। বাপের কাছে কিছুতেই সে ফিরে যাবে না।

'কেন?'

'মা বারণ করে দিয়েছে।'

শৈলেশ্বর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'যে-বাপ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, টাকাব জন্যে ছেলেকে বিক্রি করে দেয় মুসলমানেব কাছে, মা বলেছে, সে-বাপ বাপই নয়।'

বড় তেজের কথা। এ-তেজ সে নিশ্চয়ই শ্রীনিবাসের থেকে পায়নি। পেয়েছে যশোমতীর থেকে। কেমন দেখতে না-জানি যশোমতীকে। এতক্ষণে এই প্রথম শৈলেশ্বরের মনে হল।

'মাকেও বিক্রি করে দিয়েছিল দু'বার। আগাম টাকা নিয়ে এসেছিল বেপারীদের ঠেঙে। কিন্তু মা যায় নি নড়েনি বাড়ির দরজা ছেড়ে।'

'কারা তারা?'

'রহমালি আর কাঞ্চন।' বললে দুর্গাচরণ।

ডাকো তাদের।

তারা এসে বললে, খবরটা মিথ্যে নয়। দু'-দুবার দু'জনের কাছে বউ বেচে টাকা নিয়েছে শ্রীনিবাস। টাকা নিয়ে সটকান দিয়েছে। কিন্তু তারা দখল

পায় নি যশোমতীর। দখল নিতে গেলে বারে-বারে ঠেকিয়ে দিয়েছে দুর্গাচরণ। গরু বেচে, ধান বেচে, জমি বেচে কিস্তিতে-কিস্তিতে টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছে। তবু বিপথে যেতে দেয় নি যশোমতীকে। ভিক্ষুকের অধম হতে দেয় নি।

'তাইতো যশোমতী একদিন বললে, আমাকে তুই বিয়ে করে ফেল, দুর্গাচরণ। আমার জন্যে কত আর তুই খেসারত দিবি। আমাকে তুই বিয়ে করে ফেললে কেউ আর আমাকে শ্রীনিবাসের বউ বলতে পারবে না। শ্রীনিবাসও পারবে না আমাকে বিক্রি করতে, আর করলেও সে-বিক্রি টিকবে না, বাতিল হয়ে যাবে।' দুর্গাচরণের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তাই বলে পরের স্ত্রী তুমি আত্মসাৎ করবে? এটাই বা কোন সৎপথ?' শৈলেশ্বর হুঙ্কার ছাড়লেন : 'এ-হারামজাদা বলে কী অসম্ভব কথা! বার করে দে ঘাড় ধরে।'

দুর্গাচরণ আবার ঘাড়ধাক্কা খেল।

যে যাই বলুক শ্রীনিবাসকে আবার তিনি জায়গা করে দেবেন। বানচাল নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল সে, আবার ফিরিয়ে দেবেন তাকে শক্ত ভিত্তির আশ্রয়। প্রথমেই যশোমতীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যশোমতী এলে তার হাত ধরে প্রহ্লাদও তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে। ততদিন সে কাচারিতেই থাক, ছুটকো চাকরের কাজ করুক। মা এসে পড়লে তার আর রাগ থাকবে না।

ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত শ্রীনিবাসের জন্যে শৈলেশ্বরের সহানুভূতির অন্ত নেই।

বড় তেজী মেয়ে যশোমতী। তা হোক। তবু বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই। নিদারুণ দুর্বিপাকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল শ্রীনিবাসের। কার না হয় শুনি? এর চেয়ে আরো কত ভয়ংকর কাণ্ড লোকে করে বসে। যশোমতী যে স্বামী বেঁচে থাকতে দুর্গাচরণকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এটা সেই দুর্বিপাকের পরিচয়। না, ওদের মধ্যে আবার তিনি ফিরিয়ে আনবেন বনিবনা। শ্রীনিবাসকে মহলের আটপ্রহরী করবেন কিছু জমি দেবেন চাকরান। নতুন করে ঘর তুলে দেবেন ওদের। ওদের জীবনে নিয়ে আসবেন শক্ত অব্যাহতি! সময় সুগম হয়ে উঠলেই আবার ওদের মধ্যে স্বীকৃতি ফুটে উঠবে। যে দুটো ছেলে মরে গিয়েছিল আবার ফিরে আসবে যশোমতীর কোলে।

কিন্তু যশোমতী কোথায়?

যশোমতীর দেখা নেই।

ওদিকে পুলিশ, এদিকে জমিদারের লোকলস্কর, কোনো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহ-অসন্দেহ সব জায়গায় তদন্ত হচ্ছে, কোথায় কে যশোমতী! ঘাটে-অঘাটে প্রত্যেকটি নৌকোর উপর কড়া নজর, এমন সোয়ারী কেউ নেই যাকে তখুনি-তখুনি সনাক্ত করা যায় না। অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে পাহারা। কিন্তু যশোমতী নিরুদ্দেশ।

কোথায় সত্যি যেতে পারে? যা জানা যাচ্ছে হাতে তার পয়সা ছিল না, সময় ছিল না স্টিমার ধরে। এমন সাহস নেই নৌকো নেবে একলা। এখানেই কোথাও আছে। নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছে কেউ। কোনো গভীর অন্তঃপুরে।

তবে কি কোনো অবস্থাপন্ন মুসলমান তালুকদার তাকে গায়েব করেছে? বিশ্বাস হয় না। নগদ টাকায় খরিদ হয়েও যার দখল হয় না সে নিজের থেকেই গিয়ে ধরা দেবে এ অসম্ভব কথা। তেমনি অসম্ভব কথা সে আত্মহত্যা করেছে। এত যার তেজ সে কখনো আত্মহত্যা করে না।

আর কিছু নয়, শয়তান ঐ দুর্গাচরণ, সেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাই ওকে আর চোখের বাইরে ছেড়ে দেয়া নয়, সব সময়েই পিছনে ওর লোক রয়েছে। হয় পুলিশের নয় জমিদারের। ও টেরও পায় না।

চাষবাসে আজকাল আর বিশেষ মন নেই দুর্গাচরণের। কেমন ছন্নছাড়া সর্বস্বান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কি খায় না-খায়, বড় কাহিল হয়ে পড়েছে, ঘরে না গিয়ে মাঝে-মাঝে বাইরে পড়ে থাকে। আর, সব খবর নিয়মিত রিপোর্ট হয় শৈলেশ্বরের কাছে। তবু, সন্দেহ নেই, এই দুর্গাচরণের থেকেই সন্ধানের সূত্র পাওয়া যাবে। গুপ্তচরদের উৎসাহ দেন শৈলেশ্বর। প্ররোচনা জোগান। যশোমতীর উদ্ধারের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন।

কিন্তু কোথায় যশোমতী!

মাঝে-মাঝে উড়ো খবর আসে। আজ নাকি ইয়াকুব গাজীর পুকুরে ওকে কে স্নান করতে দেখেছে। আরজ আলির উঠোনে ওর শাড়ি শুকোচ্ছে নাকি আজ। কিংবা আজ নাকি আতাহার মিঞার খলেনে ও ধান কুটছে।

ডাকো ইয়াকুবকে। তলব দেও আতাহারকে। আরজ আলিকে ধরে নিয়ে এস।

সবাই প্রথম বাক্যেই অস্বীকার করে। তার চুলের ডগা, চোখের পলকটিও কেউ দেখেনি। হ্যাঁ, পুলিশ-তদন্ত হোক। তন্তুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবু আশা হারান না শৈলেশ্বর। যে-রকম জাল পেতেছেন, ঠিক সে ধরা

পড়বে। ঠিক আবার তাকে তিনি মিলিয়ে দিতে পারবেন স্বামীর সঙ্গে। তাই তিনি শ্রীনিবাসকে নতুন কাপড়-জামা কিনে দিয়েছেন, রেখেছেন পরিষ্কার ফিটফাট করে। কাচারিতে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন একটা। তার জীবনে এনে দিয়েছেন একটা ভদ্রতার পরিবেশ। স্বামীত্বের মর্যাদা। এবার এনে দেবেন স্ত্রীর প্রেম, গৃহবাসের শান্তি।

তবু শত ফিটফাট ছিমছাম হলেও লোকটাকে কেমন যেন অপদার্থ মনে হয়। মনে হয় সে যোগ্য নয় যশোমতীর।

যোগ্যতার প্রশ্ন কি আর ওঠে? সে স্বামী। এখন ওঠে অধিকারের কথা।

মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গল্প করেন শৈলেশ্বর। একটু বা নিঝুম নিরিবিলিতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চান তার গেরস্তালির ইতিহাস। একেকবার ইচ্ছে করে প্রশ্ন করেন, কেমন দেখতে যশোমতীকে। মুখের থেকে ফিরিয়ে নেন প্রশ্নটা। ভয় হয়, লোকটা যেমন মিথ্যেবাদী, হয়তো বলে বসবে, কদাকার, জঘন্য। স্ত্রী বলেও বিন্দুমাত্র তার মায়া হবে না।

কিন্তু শৈলেশ্বর অনুভব করেন এত যার তেজ, এত যার জ্বালা, সে সুন্দর না হয়ে যায় না। সে-সৌন্দর্য বোঝে শ্রীনিবাসের সাধ্য কি?

যশোমতীকে যদি পাওয়া যায় তবে তাকে তিনি পাশের হাজত-ঘরে রেখে দেবেন এক রাত্রি, অন্ধকারে গিয়ে চুপি চুপি আলো জ্বালাবেন। দেখবেন তার সেই তেজ, তার সেই জ্বালা।

অধিকারের প্রশ্ন কি আর ওঠে? তিনি প্রভু। এখন ওঠে আধিপত্যের কথা। শৈলেশ্বর ভয় পান। কিন্তু প্রভাত তো হবে। স্বামী-পুত্রের চাকরি হয়েছে, জমি হয়েছে, ঘর উঠেছে. দিনের আলোতে চোখ মেলে দেখবে না যশোমতী? তার জীবনের সমস্ত রাত্রি সে মুছে ফেলবে না?

স্বপ্ন দেখছিলেন শৈলেশ্বর। চর এসে বললে, 'যশোমতীকে পাওয়া গেছে।'

শৈলেশ্বর চমকে উঠলেন। বিশ্বাস করবেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

'এখানে নিয়ে আসব?'

এখন মোটে সন্ধে। শৈলেশ্বর গলা নামিয়ে বললেন, 'এখন নয়। মাঝরাতে।'

মাঝরাতে ফরাসে চুপচাপ একা বসে ছিলেন শৈলেশ্বর। উচ্চশিখায় লণ্ঠন জ্বলছে তাঁরই প্রতীক্ষার মত।

'তুমিই যশোমতী?'

জিগগেস করবার দরকার ছিল না। শৈলেশ্বর এক পলকেই তাকে চিনতে পেরেছেন।

কিন্তু তার কপালে সিঁদুর, ডগডগে সিঁদুর। ঐটেই তার তেজ। আর তার চোখে ও কি জল? না ঐটেই তার অপূর্ব জ্বালা।

জয়ী হয়েছেন শৈলেশ্বর। অনুতপ্ত হয়ে যশোমতী তার স্বামীর আশ্রয়ে আনুগত্যের অভিজ্ঞান নিয়ে ফিরে এসেছে।

তবু এ সৌন্দর্য আস্বাদ করে এ যোগ্যতা শ্রীনিবাসের নেই, হয়তো অধিকারও নেই।

চর কাচারিরই পেয়াদা। শৈলেশ্বর হুকুম করলেন, 'একে হাজত-ঘরে বন্ধ করো।'

ঘর খুলল পেয়াদা। ঝাঁট দিয়ে ধুলো ঝাড়ল। নতুন একটা লণ্ঠন জ্বালল মিটিমিটি।

'তোমাকে আজ রাতে ঐখানে থাকতে হবে।' বললেন শৈলেশ্বর।

'ঐ নোংরা ঘরে, শুকনো মেঝের উপর?' পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসল যশোমতী: 'তার চেয়ে আমার ঘরে চলুন, নরম লেপ-তোষক কিনেছি।'

'তোমার ঘর?' শৈলেশ্বর যেন চাবুক খেলেন।

'হ্যাঁ, আমি যে ঘর নিয়েছি খালপাড়ে।'

'খালপাড়ে?'

'হ্যাঁ যেখানে খারাপ মেয়েদের বস্তি। চেনেন না? আপনারাই তো জমির খাজনা পান।'

'কেন? সেখানে কেন?' শৈলেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন।

তা ছাড়া কোথায় আর যেতে পারে যশোমতী! কোথায় গিয়ে সে মুক্তি পেতে পারে স্বত্বহীন স্বামিত্বের দাবি থেকে? জমিদার আর পুলিশ তার জন্যে আর কোথায় জায়গা রেখেছে, আর কোথায় তার আশ্রয়! তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত সে ঢুকে পড়েছে আঁস্তাকুড়ে। কোনো ঘাটেই নোঙর ফেলতে না পেরে সে ডুবেছে পাঁকের মধ্যে।

কিন্তু সে মুক্ত। সে অধরা। তাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারে না।

'তাই আমাকে আপনি আর বন্ধ করতে পারেন না। আমার সম্বন্ধে আর কোনো ওজুহাত নেই, আকর্ষণও নেই।' যশোমতী শব্দ করে হাসল: 'আমার

কপালে যে সিঁদুর সে আমি স্ত্রী বলে নয়, আমি চিরকালের সধবা বলে। যাবেন আমার ঘরে?'

'না।' শৈলেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন।

অনেক রাতে যশোমতীর বন্ধ ঘরের দরজায় কে করাঘাত করল।

'কে?'

'আমি দুগগো—দুগগোচরণ।'

'মদ খেয়ে এসেছিস? মদ খেয়ে না এলে ঢুকতে দেব না। আর-আর দিনের মতো তাড়িয়ে দেব।'

'না মাইরি বলছি, ঠেসে টেনে এসেছি আজ।' জড়ানো গলায় বলতে লাগল দুর্গাচরণ: 'দাঁড়াতে পারছি না, টলে টলে পড়ছি। দরজা খুলে দে শিগগির, নইলে মাথা ঠুকে-ঠুকে দরজা ভাঙব।'

না, ভুল নেই, মাতাল হয়ে এসেছে দুর্গাচরণ। যশোমতী দরজা খুলে দিল।

ঘৃণা

একটি মুহূর্তের চকিততড়িৎ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মার ঠিক করতে হবে। দশদিকে দশটা লোক বাঘের মতো থাবা পেতে আছে. আরেকটা দুর্দান্ত বিক্রমে বল ছুঁড়ছে মুখোমুখি। আর সে-বলে কত পাকচক্র, কত কূটকৌশল, কত উড়ন-ঘুরন। তোমাকে নস্যাৎ করবার জন্যে সর্ববিধ পার্থিব প্রতারণা। চক্ষের নিমিষে সিদ্ধান্ত এক চুল দেরি হয়েছে কি তুমি আউট হয়ে গিয়েছ।

সাধ্য কি ব্লক করো। ব্লক করতে তোমাকে দেবে কেন? তোমাকে প্রলুব্ধ করবে।

আর ব্লক করাই ক্রিকেট নয়। টিঁকে থাকাই জীবন নয়।

'একটা গাড়ি কিনতে পারেন না?'

জগদ্দল পাথর-ভর্তি বাস-এ হঠাৎ সেদিন দেখা।

লেডিজ নেই, লেডিজ হবে না- সমানে চেঁচাচ্ছে কন্ডাক্টর। তবুও পাদানি ও দরজার ভিড় ঠেলে নিরঙ্কুশ ঔদাসীন্যে উঠে পড়ল সুকণ্ঠী। যেতে যখন হবেই তখন ভয়-ভবিষ্যৎ না ভেবেই যেতে হবে।

কিন্তু দাঁড়াবে কি করে? ধরবার অবলম্বন কি? অবলম্বন বোধ হয় একটুমাত্র আশা কেউ তাকে সিট ছেড়ে দেবে।

আজকের যুগেও এমন আশা কেউ করে নাকি? সমান স্বাধীনতা নিয়েছ সমান দায়িত্ব নেবে না? আসরে নেমে আবার ঘোমটা টানা কেন? দয়া চাও কোন লজ্জায়? যদি ফুলের কুঁড়িই হবে হাটে-বাজারে রোদে-বৃষ্টিতে নেমেছ কেন? হাট-বারে পাঠ নেই।

মহানুভব কে খুঁজছে? দু-একটা মিনিমুখো বোকাসোকা লোকও তো থাকতে পারে।

আশ্চর্য, আশার রাজ্যে পাথরেও ফুল ফোটে।

পাশের লোককে বিপন্ন করে দাঁড়িয়ে পড়ল পরাশর। পাশের লোককে প্রসন্ন করে বসে পড়ল সুকণ্ঠী।

যেখানে সুকণ্ঠীর নামবার কথা তার আরো তিনটে স্টপ পেরিয়ে পরাশরের

বাড়ির গলি। তিনটে স্টপ পেরিয়েই নামল। বদান্যতার বদলে যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানায় না তার কেমনতর রীতি-নীতি!

নামতেই সুকণ্ঠী বললে, 'একটা গাড়ি কিনতে পারেন না?'

এ কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি।

'গাড়ি কেনা মানেই তো যন্ত্রের অধীন হ'য়ে যাওয়া।' বললে পরাশর। 'তখন বাস-ট্র্যাম, ফার্স্ট ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস রিকশা-সাইকেল—আনন্দময় পদব্রজ—সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। তা ছাড়া আজকের এই রোমাঞ্চ? তোমাকে এই সিট ছেড়ে দেওয়া?'

সুকণ্ঠী হাসল। বললে, 'তার চেয়ে একটা স্মুথ লিফ্‌ট্‌ পেলে বেশি সুখ।'

পরদিন অফিস-টাইমে সুকণ্ঠীর বাস-স্টপের কাছে একটা ট্যাক্সি এসে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল।

পরাশর নামল গাড়ি থেকে। উন্মনস্ক সুকণ্ঠীর কাছে গিয়ে বললে, 'একটা গাড়ি আছে। চলো তোমাকে পেঁৗছে দিই। তোমার আপিস তো আমাদেরই পাড়ায়।'

গোটা চারেক বাস ছেড়ে দিয়েছে সুকণ্ঠী। এমন গণ্ডারের মতো ভিড় ছুঁচ গলাবারও সাধ্য নেই। তাম্রনেত্রে তাকিয়ে আছে পশ্চিমের দিকে। আর মনে-মনে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময়ে এই দৈবাগত নিমন্ত্রণ।

যেমন অভ্যাস, গায়ের আঁচল মৃদু শাসন করে সুকণ্ঠী বললে, 'মন্দ কি।' তারপর দু পা এগিয়ে গাড়ির সামনে এসে বললে, 'ট্যাক্সি!'

যেন খুব সম্ভ্রান্ত নয় এমন কটাক্ষ। ভাড়াটে-ভাড়াটে গন্ধ, কেমন যেন অকুলীন। তোকে দেখলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সি করে যেতে, আপিসের কোনো মেয়ে যদি বলে, কেমন নিশ্চয়ই টোকো শোনাবে। তবু বদ্ধ গুমোটের মধ্যে এক ঝলক বাসন্তী হাওয়ার মতোই মহাঘ্রাণ এই ট্যাক্সি।

পরাশর বললে, 'অফিস-টাইমে এই ট্যাক্সি যোগাড় করাও বা কি কঠিন।'

আরো কঠিন, তাক বুঝে ঠিক সময়ের সূচ্যগ্রমুখে গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হওয়া। তার মানে কতক্ষণ আগে থেকে মিটার নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুকণ্ঠীদের গলির মোড়ে, কতক্ষণে দেখা যায় তার শাড়ির পাড়, তার ব্যাগের স্ট্র্যাপ, তার এগিয়ে-আসার ঢেউ।

সুকণ্ঠী আগে ঢুকল ট্যাক্সিতে। পরে পরাশর।

কেমনতর হয়ে গেল। পরাশরের ডাইনে হয়ে গেল সুকণ্ঠী। শুধু মুখ বাড়িয়ে ডাকত আর সরে বসে জায়গা দিত, সুকণ্ঠী বাঁয়ে থাকত। বাঁ-টাই সমীচীন, শাস্ত্র ও আইনসম্মত। আর, অনেক অভিজ্ঞতার ফল থেকেই আইন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট হয়ে হরিশ মুখার্জি রোডের মোড় ঘুরল ট্যাক্সি।

'ঘুরপথে চলতে বললেন কেন?' একটু কি কুণ্ঠিত হল সুকণ্ঠী।

'চৌরঙ্গিতে ক্ষণে-ক্ষণে শুধু রক্তচক্ষুর আস্ফালন।' একটু যেন ঘেঁষে বসল পরাশর: 'আর লাল চোখ যদি একবার তোমার দিকে তাকায় বারে-বারেই তাকায়। তুমি একটা স্মুথ রান চেয়েছিলে, না? জীবনে যদিও স্মুথ রান কোথাও নেই, তবু লাল চোখ যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল।'

তবু পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসছে না সুকণ্ঠী। হাঁটু দুটো কেমন কাঠ করে বসে আছে। কনুইটা কেমন কোণ-তোলা। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা পাশ থেকে সরিয়ে এনে বসিয়েছে কোলের উপর।

লোয়ার সার্কুলার রোড ঘুরে ক্যাজারিনা এভিনিউতে পড়েছে ট্যাক্সি।

চোখ না মেলেও দেখা যায়। চুপ করে থেকেও কথা হয়। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে মুখ বুজে শুধু কাছাকাছি বসে থাকাও যে দেখা আর কথা বলা এ কে জানত।

সেদিনের সেই মফস্বলের মেয়েটিকে মনে-মনে আবার রচনা করল পরাশর।

এক বৃষ্টি-থামা সন্ধ্যায় লণ্ঠনের টানে ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকা এসেছে, নানা মাপের নানা রঙের পোকা। তাই বসে-বসে দেখছিল পরাশর আর ভাবছিল এত যেখানে পোকা তখন কে বলে এ পৃথিবী শুধু মানুষের জন্যে।

একজনের হাতে একটা মোটা খাতা, গোটা কয় কলেজের মেয়ে এসে হাজির।

ওদের মধ্যে যে মেয়েটি অচপল সে খাতাটি বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেছি। আপনি যদি একটা লেখা দেন—'

স্বাস্থ্যে শ্রীতে ডগমগ মেয়েটি। যেন ঝকঝকে একটা করাতের পাত।

খাতাটা বাড়িয়ে দিল না হাতখানিই বাড়িয়ে দিল কে জিগগেস করবে।

উৎসাহে উথলে উঠছে। আগ্রহ দূরে থাক, এতটুকুও কৌতূহল দেখাল না পরাশর। খাতাটাও একবার দেখল না পৃষ্ঠা উলটিয়ে। নিহাস্য গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি তো কবিতা লিখি। আর সে শুধু প্রেমের কবিতা।'

'লিখবেন।' এতটুকু অপ্রতিভ হল না মেয়েটি।

মুখের দিকে তাকাল পরাশর। দেখল লজ্জার গাঢ় পদ্মরাগ সুকণ্ঠীর চোখের কোণে বিশ্রাম করতে বসেছে।

সে কবিতা আর লেখা হয় নি। সে পত্রিকা মুছে গেছে। সমস্ত শহরটাই মুছে গেছে মানচিত্র থেকে।

কিন্তু মনের চিত্র থেকে মুছে যায় নি সেই মেঘমাখানো সন্ধ্যা, সেই মিটিমিটি লণ্ঠনের আলোয় অনেক পোকার মধ্যে একটি মানুষী প্রজাপতি। আর রক্তে-মাংসে যে-প্রেমের কবিতা লেখা হবে না তারই অব্যক্ত গুঞ্জরণ।

আকাশের দেশ নেই, প্রেমেরও বয়স নেই।

ফেলে-আসা গাঁ-শহরের অধিবাসীদের মাঝে-মাঝে সভা হয়, একত্র মেলামেশার জন্যে। যেহেতু এককালে সে-শহরে পরাশর অধিষ্ঠিত ছিল এবং সৌহার্দ্যে সকলের সঙ্গে প্রায় একাত্ম ছিল, তারও নিমন্ত্রণ হল।

তেমনি এক সভায় সুকণ্ঠীর সঙ্গে দেখা।

'আমাকে চিনতে পারেন?' সুকণ্ঠীই এসেছিল এগিয়ে।

'তুমি তুমি সেই সু, সু—শরীরের কি যেন একটা অংশ—সুদতী, সুভ্রূ, সুকেশী—না, না, সু— সুকণ্ঠী নও?' রক্তিম উত্তেজনায় সুন্দর হয়ে উঠেছিল পরাশব।

'আশ্চর্য, এখনো মনে আছি দেখছি।' সুকণ্ঠী চোখ নামাল না।

'ঠিক বলেছ, মনে আছে নয় মনে আছি।' দর্শনের মধ্যে স্পর্শনের সুর মেশাল পরাশর: 'ধনে-জনে সুখ নেই, মনেই সুখ।'

তাজা ডগালে শাকের মতো লকলকে ছিল এখন একেবারে দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। দয়াহীন দারিদ্র্যের ঝড় দাগ ফেলে-ফেলে বয়ে গেছে দেহের উপর দিয়ে তা ঠাহর করলেই বোঝা যায়। কাছে বসে কথা কয়ে কিছু খবরও জানা গেল, সেই পুরোনো খবর। বাবা উকিল ছিলেন বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে থাকতে পারলেন না। কিছুই আনতে পারেন নি. বাড়িঘরেরও খন্দের নেই। এখানে কে চেনে, প্র্যাকটিস জমাবার কথা ভাবাও পাগলামি। তবু দুপুরে, ঘুমে-গরমে পচে মরার চাইতে আদালতে ঘোরাফেরা করেন, অন্ধিসন্ধি যদি এক-আধটা মিলে যায় কখনো। দুখানা ঘরে যে একটা বাসা নিয়েছেন তাকে একটা বাক্স বললেই ঠিক হয়। যা চাকরি একা সুকণ্ঠীই করছে। তার সঙ্গে একটু রাজনীতি বা কাজনীতি না মিশিয়েই বা উপায় কি। ফোকটে যদি দুটো টাকা মাইনে বাড়ে সে ফিকির কে না দেখে।

'তোমার পিঠ-পিঠ যে ভাই ছিল সে কি করছে?'

'ভুগছে।'

'অসুখ?'

'রাজ-অসুখ। রাজযক্ষ্মার চেয়েও মারাত্মক।'

'সে কি?' চমকে উঠেছিল পরাশর।

'হ্যাঁ. সে অসুখের নাম বেকারি। সমর্থ ছেলে, বি-এ পাস, একটা চাকরি জুটছে না।'

বিয়ে যে হয় নি তা তো হাতে-মাথেই বোঝা যাচ্ছে। কি করেই বা হবে? সময় কই? স্বাস্থ্য কই? টাকা কই?

একজনের চোখের উঠোনে আরেকজনের চোখের রোদ খেলা করেছিল অনেকক্ষণ।

যে ছবির চোখ একবার তোমার চোখের দিকে তাকিয়েছে তাকে দূরে-সামনে যে কোণ থেকেই দেখ না কেন সব সময়েই সে তাকিয়ে থাকবে চোখের দিকে। তেমনি যাকে একবার ভালো লেগে গিয়েছে. সব অবস্থাতেই সে জাগিয়ে রাখবে সেই ভালোলাগার আলো— যে আলো মাটিতেও নেই সমুদ্রেও নেই।

সভা শেষে, ভেঙে যাবার আগে আবার একটু দেখা হল। এ ওর ঠিকানা বললে। এত কাছে? অলক্ষ্যে যেন আরো একটু কাছাকাছি হল। একদিন যেয়ো না। তোমার ভাইকে— কি না জানি নাম— ধ্রুবজ্যোতিকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। দেখি কি করতে পারি।

ভাইকে কিছু বলে নি নিজেই একদিন দেখা করতে গিয়েছিল সুকণ্ঠী।

একটা প্রকাণ্ড একান্নবর্তী বাড়ি বড়ো-ছোটো অনেক আত্মীয়পরিজন নিয়ে একত্র আছে পরাশর। ভাড়াটে বাড়ি, এখানে-ওখানে অনেকগুলি কোঠায় অনেক শিশু বুড়ো ছোকরা-ছুকরির হিজিবিজি।

'নিজের একটা আলাদা বসবার ঘর নেই তাই এস এই প্যাসেজটাতেই বসি।' বললে পরাশর।

'থাকেন কোথায়?'

'মানে শুই কোথায়? ঐ তেতলার এক কোণে। অদৃষ্টে কোনো রকমে জুটেছে একখানা।'

'আলাদা একটা ফ্ল্যাট নেন না কেন?'

'একের পক্ষে পাঁচজনের মানে পাঁচের পিঠে চড়ে একান্ন হওয়াই সুবিধে।'

সুকণ্ঠী হাসল, কিন্তু আলাপ জমল না। কেমন বাজার-বাজার আপিস-আপিস শোনাল। কত মাইনে সুকণ্ঠীর, বাড়তি-আদায় কিছু আছে কি না, মরা নদীতে কি করে চালায় গাধাবোট— এই সব। পরাশর আরো কত উঠেছে মই বেয়ে আকাশ প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়— ছি ছি, তার হিসেব।

কি রকম যেন প্রার্থী-প্রার্থী মনে হ'ল নিজেকে। সুকণ্ঠী উঠে পড়ল।

'কই আমাকে একদিন যেতে বললে না তোমাদের বাড়ি?' পরাশর এগিয়ে দিল দু পা।

'তবু তো আপনাদের বাড়িতে একটা প্যাসেজ আছে বসবার, আমাদের বাড়িতে তাও নেই।'

'ভালোই তো। পথেই তা হলে আমাদের ঘর-দোর।'

.ট্যাক্সি রেড রোডে পড়েছে।

গতিটাকে একটা গভীর শান্তির মতো মনে হল পরাশরের। প্রগাঢ় নিষ্ক্রিয়তার শান্তি। গল্পটা কিভাবে শেষ হবে মনে যখন ঠিক-ঠিক এসে যায় তখন লেখকের যে শান্তি সেই শান্তি সুকণ্ঠীকে এখন পাশে নিয়ে। মনে-মনে লেখার সমাপ্তি খুঁজে পাবার পর যেমন আর লিখতে ইচ্ছে করে না তেমনি যেন ওকে নিয়েও পরাশরের আর কিছু ইচ্ছে নেই।

সামান্য একটা ফুল ফোটাবার জন্যে মৃত্তিকার কত দীর্ঘ ও ধীব আয়োজন চলে। মানুষেরই ধৈর্য নেই, আয়ু নেই, ভবিষ্যৎ নেই।

'কই তোমার ভাই তো এল না।'

'আমি ওকে বলি নি কিছু—'

'সে কি? আমার আপিসে কত দিক থেকে কত রকম ভেকেন্সি হয়—'

'ওর হবে না। আর যখন হবে না তখন আমার কাছে ও আপনার নিন্দে করবে। আপনাকে অযোগ্য অক্ষম বলবে। এ আমি সইতে পারব না।'

সুকণ্ঠীর বাঁ হাতখানির দিকে তাকাল পরাশর। দুর্বল, দরিদ্র, পরিত্যক্ত। আস্তে-আস্তে ধরবে না ছোঁ মেরে তুলে নেবে ভাবতে লাগল।

পরিশ্রমের কাঠিন্যে লেখা ঔৎসুক্যের নরম কবিতা।

পরাশরের হাতের মধ্যে সুকণ্ঠীর হাতখানি ভয়ে কুঁকড়ে রইল। বিস্কুটের মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেল।

খটখটে রোদ, দু-দিক থেকেই ধাবন্ত মোটর। আগাপাশতলা-বোঝাই একটা এক্সপ্রেস দোতলা বাস কাটিয়ে গেল ট্যাক্সি।

'আপিস থেকে ফিরতে তোমার বুঝি খুব দেরি হ'য়ে যায়?'

'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গানের টুিউশানি থাকে।'

'তোমার গলা কি আশ্চর্য সুন্দর. যেন সোনা ঢালা—'

প্রশংসা করলে কোন মেয়ে না সুখী হয়? তবু সুকণ্ঠী, খুশি হ'য়েও হাতের দিকে কড়া নজর রেখেছে। হাত নিয়েই পরাশর শান্ত থাকে কি না, না এলাকার বাইরে চলে আসে। শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললে, 'চর্চাই করতে পারি না। পাবলিসিটি নেই—'

পুরুষের স্বভাব কি কিছুতেই যাবে না?

হাত ছেড়ে দিয়েছে হাত। কাঁধের উপর উঠে এসেছে।

মুহূর্তে পরাশরের সান্নিধ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক কোণে ছিটকে পড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল সুকণ্ঠী: 'এই, রোকো। রোকো—'

এমনটি কোনোদিন শোনে নি ড্রাইভার। গাড়ি আস্তে করল।

একটা টুকরো-করা সেকেণ্ডের এক কণিকা ভুল হয়েছে মারে। পিচে বল পড়বার আগেই ব্যাট হাঁকড়ে বসেছে।

কিন্তু তাই বলে শালীনতাকে বিসর্জন দেওয়া কি উচিত হবে? বর্বরতার প্রতিরোধে আবার শালীনতা কি। তবু ব্যাণ্ডেজটা সিল্কের হওয়াই তো ভালো। ব্যাণ্ডেজ কোথায়? এ দগদগে ঘা।

পরাশর সহজ হবার চেষ্টায় বললে, 'এইখানে নেমে পড়লে বিপদে পড়বে যে।'

'না. আমি এইখানেই নামব। পায়ে হেঁটে যাব।' কোণের কাছে লেপটে গিয়ে সুকণ্ঠী দুঃখে রাগে থরথর ক'রে কাঁপছে।

'এখানে ট্যাক্সি কোথায়? বাস কোথায়? হঠাৎ নেমে পড়লে চলতি গাড়ির লোকেরা ভাববে কি।'

'অন্যে কি ভাবে বয়ে গেল। আমি কি ভাবছি তা কে ভাবে।' মেরুদণ্ড খাড়া করে বসল সুকণ্ঠী: 'এই, রোকো। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি।' ব্যাগ হাটকাতে বসল নিচু হয়ে।

'এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চলো, নামিয়ে দেব। সেটাই ডিসেণ্ট হবে। সেখানে বাস-ট্র্যাম যা হোক কিছু একটা পেয়ে যাবে সহজে।' নিশ্চল নিরুদ্বেগ মুখে বললে পরাশর।

বিপদে বুদ্ধি হারানো কাজের কথা নয়। এটুকু পথ রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধতায় সহ্য করা ছাড়া উপায় কি। গায়ের আঁচল ঘন করে বসল সুকণ্ঠী।

তাই এখনো বিয়ে করে নি। এমনি উড়ে-ঘুরে বেড়াবার মতলব। বলে, যন্ত্রাধীন হব না। বাস ট্র্যাম ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস রিকশা সাইকেল—যখন যা হাতের কাছে চলে আসে তাই লুফে নেবে। কিন্তু আমি ছ্যাকড়া গাড়ি নই।

চিত্তরঞ্জনের মোড়ের কাছে ট্যাক্সি থামল। ঝটকা মেরে নেমে পড়ল সুকণ্ঠী।

পরাশরকে খানিক এগিয়ে গিয়ে নামতে হল। কি না জানি করে ফেলে মেয়েটা। নখে-দাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি, ট্র্যাম-বাসের তলায় না ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেলেঙ্কারির ভয় বলে বালাই কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। কে জানে, হয়তো যা রেওয়াজ হয়েছে আজকাল, থানায় না ডাইরি করে বসে।

না, সুস্থ-শান্ত ভঙ্গিতে তেরো নম্বর বাসেই উঠল সুকণ্ঠী। পবাশর আরেকটা ট্যাক্সি নিল।

সন্ধ্যায়ও রাগ মরে নি সুকণ্ঠীর। বাড়ি ফিরে এসে ছোটো অ্যাটাচি কেসটা খুলে বসল। দৈনিক পত্রিকার কটা কাটিংস জমিয়েছিল সুকণ্ঠী, যেখানে-যেখানে পরাশরের বক্তৃতার সারাংশ বেরিয়েছিল তার টুকরো। কটা ছবি। কটা বিজ্ঞাপন। অন্যের থেকে ভিক্ষে করে আনা অটোগ্রাফের পৃষ্ঠা।

ধারালো নখে সব ছিঁড়তে বসল সুকণ্ঠী। টুকরো-টুকরো করে। তাতেও জ্বালা মিটছে না। ছেঁড়া অংশগুলি আবার ছিঁড়ল, কুচিকুচি করে ছিঁড়ল। মনে-মনে ভাবল অনেক বেঁচে গিয়েছি—এক-একবার ইচ্ছে হত চিঠি লিখি—ভাগ্যিস লিখি নি। জঞ্জাল জড়ো করি নি বেশি।

দেশলাইয়ের কাঠি জেলে পোড়াতে বসল সে ছিন্নস্তূপ।

সেদিন খবরের কাগজ খুলতে গিয়ে চোখে পড়ল বড়ো অক্ষবে কি একটা সংবাদ বেরিয়েছে পরাশর সম্বন্ধে। চোখে পড়তেই ঝলসে উঠল। পরে ভাবল, কোনো কেলেঙ্কারির সংবাদ হয়তো। কিংবা কে জানে, হয়তো মোটর চাপা পড়েছে। নয়তো বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা। পড়ে দেখতে ক্ষতি কি।

বিপরীত সংবাদ! কতক্ষণ পরেই দুটি ছোকরা এসে হাজির। আমাদের সভায় আপনি যদি দুটি গান গান।

উৎফুল্ল হ'ল সুকণ্ঠী। এভাবেই তো পাবলিসিটি হবার সুযোগ। বললে, 'আপনারা কারা?'

কতদিনের পুরোনো ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তার বিবরণ দিল ছোকরারা। কারা-কারা সব সভাপতি হয়ে গিয়েছেন দৈর্ঘ্যে পরিধিতে কত বড়ো সব

জাঁকালো জাঁদরেল। কত ফিল্ম-স্টার, রেডিওআর্টিস্ট গান গেয়েছেন এখানে, কত নৃত্যভারতী দেখিয়ে গিয়েছেন ললিতকলা।

'কিসের সভা?'

'আমরা পরাশর রায়কে সংবর্ধনা দিচ্ছি।'

'কে পরাশর রায়?'

'সে কি কথা? এত বড়ো একজন সাহিত্যিক, জনপ্রিয়তার সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় যার বাসা—'

'ও, শুনেছি বটে।' মুখ গম্ভীর করল সুকণ্ঠী : 'কিন্তু এও শুনেছি লোকটা অত্যন্ত বাজে, রোথো, থার্ড ক্লাস—'

'চামড়া ও চরিত্র যার-যার নিজের ব্যাপার।' এক ছোকরা হাই তুলল, আরেক ছোঁড়া তুড়ি মারল : 'ও সব কে দেখে? দেশ সম্মান দেবে প্রতিভাকে।'

'মাপ করুন। যার-তার সভায় গান গাইতে পারব না।' রাগে পুড়তে লাগল সুকণ্ঠী।

এত বড়ো একটা পাবলিসিটির সুযোগ এমনি করে গোল্লায় পাঠাবে? প্রসাদের ফুলকে এমনি করে পায়ে দলবে? উপায় কি তা ছাড়া? গানের চেয়ে মান বড়ো।

বলে কিনা গলা যেন সোনা-ঢালা। যদি পারতাম, গালাগাল দিয়ে সিসে-ঢালা করে দিতাম।

একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে হঠাৎ সেদিন দেখা। কোন এক দূরসম্পর্কিত লোকের বাড়িতে কাজ, সেখানে ও লোকটার নিমন্ত্রণ হতে পারে কে জানত। সম্পর্কের কত শেকড় যে চারদিকে ছড়িয়েছে তার ঠিক নেই।

গদ্‌গদকণ্ঠে শোকভক্তি-ঢলঢল গান গাইছিল সুকণ্ঠী। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে। জমাট হয়ে আছে স্তব্ধতা। এমন সময় ঘরে ঢুকল পরাশর।

মুহূর্তে গান গেল থেমে। সুকণ্ঠী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাতাস যেন উড়ে গিয়েছে ঘর থেকে। গা-মাথা কেমন ঘুরতে লেগেছে। সাঁ করে ছুটে চলে গিয়েছে পাশের ঘরে। বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল ঢালতে শুরু করেছে।

কি হল, ডাক্তার ডাকো। ভিড় সরিয়ে দাও।

পরাশর বেরিয়ে গেল।

না, সুস্থ হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। বাড়ির বাইরে এসে শুনতে পেল পরাশর, সুকণ্ঠী আবার গান ধরেছে।

'আপনারা একজন ঠিক করুন। হয় গাইয়ে নয় বলিয়ে।' প্রোগ্রামটা হাতে করে ছুঁলও না সুকণ্ঠী। উপর-উপর চোখ বুলিয়েই বললে।

'আপনার সঙ্গে বক্তার ক্ল্যাশ হচ্ছে কোথায়?'

'ভীষণ হচ্ছে। আপনাদের রুচির সঙ্গে হচ্ছে।' ঝাঁজিয়ে উঠল সুকণ্ঠী।

'কিন্তু পরাশরবাবুর নাম যে কার্ডে ছাপা হয়ে গেছে। ওঁকে এখন বাদ দিই কি করে?'

'তা হলে আমাকে বাদ দিন। আমার নাম, গায়কের নাম তো আর ছাপা হয় না।'

'ওরে বাবা. আপনাকে বাদ দিলে সভা তো ফাঁকা মাঠ। আগে গাইয়ে পরে কইয়ে।'

'তা হলে যে সভায় ওরকম সভাপতি সে সভায় আমি গাই না।'

মাথা চুলকোতে লাগল ছোকরারা। 'তা হলে কি করে ম্যানেজ করা যায়?'

'খুব যায়। নিতে লোক পাঠাবেন না। লোক না পাঠালে যায় কখনো সভাপতি? নিজের থেকে গাড়ি ভাড়া করবে?'

'তা মন্দ বলেন নি। লোকই পাঠাব না। আর এদিকে সভায় ঘোষণা করে দেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিংবা বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে থেঁতলে-থেঁতলে কাটার মধ্যেও আনন্দ আছে।

জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। লোক যাবে না। থেকে-থেকে শুধু মোটরের হর্ন শুনবে। একটাও দাঁড়াবে না দরজায়। হদিসও পাবে না কেন এই প্রত্যাখ্যান।

ধারালো অস্ত্রের উলটো পিঠ দিয়ে ফাটিয়ে-ফাটিয়ে মরাব মধ্যেও সুখ কম নয়।

'দিদি, আমার একটা চাকরি হয়েছে।' ধ্রুবজ্যোতি চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল।

'বলিস কি?' আনন্দে প্রায় পাখা মেলল সুকণ্ঠী : 'কত মাইনে?'

'স্টার্টিং তো ভালোই। প্রায় আশাতীত। একশ কুড়ি টাকা।'

'সত্যি?' ভাইকে প্রায় আদর করে সুকণ্ঠী : 'কোথায়, কোন আপিসে?'

আপিসটার নাম করল ধ্রুব।

'কি করে পেলি?'

'অ্যাপ্লাইও করি নি, কোথায় আবার খোঁজ পাব! পরাশরবাবু নিজের থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিলেন।'

'কে?' যেন হুঙ্কার করে উঠল সুকণ্ঠী:

'পরাশরবাবু। সেই যিনি— সেই যে—'

জ্বলন্ত একটা উনুন নিবে গিয়ে তাতে যেন গোবর লেপা হয়ে গেল। সুকণ্ঠী গলা মোটা করে বললে, 'ওখানে তোমার চাকরি করা হবে না, ধ্রুব।'

'কেন?'

'ওখানকার অ্যাসোসিয়েশন ভালো নয়।'

পেটের ভাত প্রায় চাল হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। ধ্রুবজ্যোতি মন খুলে হাসল। বললে 'চাকরির আবার অ্যাসোসিয়েশন! ভূতের আবার জন্মদিন!'

'পরাশরবাবু লোকটা শঠ, ভণ্ড জঘন্য—' যেন শব্দসম্পদ বেশি নেই সুকণ্ঠীর। অসহায়ভাবে হাত ছুঁড়ল শূন্যে। বললে, 'ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না।'

'সূচনায় এটা কি তারই পরিচয় দিচ্ছে?'

'যারা প্রতারক তারা সূচনায় এমনি ছদ্মবেশ পরে। ভালো করবার ছলে সর্বনাশ করে। চাকরি দিয়েছে গূঢ় কোনো শত্রুতার উদ্দেশ্যে।'

'এরকম শত্রুর সংখ্যা দেশ জুড়ে বৃদ্ধি পাক।' আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল ধ্রুব: 'বেকারির নিপাত হোক।'

'তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ও এই সুযোগে এই বাড়িতে আনাগোনা শুরু করবে।'

'বলো কি, আসবে আমাদের বাড়ি?'

'আসবে? এলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেব না?'

'সে কি কথা? তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'শুধু ঝগড়া হলেই কি দরজা বন্ধ করে দেয়?'

'তবে কোনো দুর্ব্যবহার?' চিরুনি ছেড়ে দিয়ে শুধু আঙুলে মাথা চুলকোতে লাগল ধ্রুব।

'ধ্রুব!' গর্জন করে উঠল সুকণ্ঠী: 'যদি এ চাকরি তোমার করতেই হয় তবে এ বাড়িতে তোমার থাকা হবে না বলে দিচ্ছি। হয় তুমি আলাদা নয় আমি আলাদা হয়ে যাব। কালসাপকে বাস্তুসাপ হতে দেব না।'

বাবা এসে মাঝে পড়লেন। ধীরস্তব্ধ না মুহ্যতি। তিনি বললেন, 'আগেই

দড়িকে সাপ ভাবা কেন? আর সাপ ফণা তুললেই বা ভয় কিসের? পাথর হতে পারলে সাপের ছোবলে কি হবে!'

পাথরই হতে হবে। বাড়ির সঙ্গে ছিন্ন করতে হবে সম্পর্ক।

কোথাও কোনো একটা মেয়ে-হস্টেলে জায়গা পায় কিনা তারই জন্যে ঘোরাঘুরি করছে সুকণ্ঠী। ঠিকানাটা না বদলানো পর্যন্ত শান্তি নেই। শুধু বাড়ির ঠিকানা নয় পাড়া, মহল্লা, বাস-রুট। কোনদিন ধ্রুবর খোঁজে বাড়িতে এসে ওঠে চোরের মতো তার ঠিক কি।

'জানো দিদি, পরাশরবাবু পড়ে গিয়েছেন।'

সুকণ্ঠী মুখ ফিরিয়ে রইল। কত লোকই তো পড়ে-মরে তাতে কার কি মাথাব্যথা!

'সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে স্লিপ করেছেন।'

'মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে?' রি-রি করে উঠল সুকণ্ঠী।

'অতটা হয় নি। পায়ে চোট লেগেছে—'

'ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যায় নি?'

'বলা যায় না কি হয়।'

'অমন লোকের অমন কিছু না হলে প্রকৃতির নিয়ম বলে কিছু থাকে না।' সুকণ্ঠী সর্বজ্ঞ দার্শনিকের মতো বললে।

'হাসপাতালে আছেন। এক্স্‌রে রিপোর্ট পেলে তবে বোঝা যাবে।'

এই, এই হচ্ছে অসুবিধে। রোজ তার খবর সরবরাহ করছে ধ্রুব। এমনি করে তার অস্তিত্বের শারীরিক অনুভবটা বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন চলেছে।

'বিশেষ ভাবনার কিছু নেই বলেছে ডাক্তার। সিম্পল ফ্র্যাকচার। প্ল্যাস্টার করে দিয়েছে। মাসখানেকের ধাক্কা।'

'মোটে?' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সুকণ্ঠীর। উষ্মাটা যে চাপা দেবে চট করে এমন কোনো কথা খুঁজে পেল না।

'আজ আবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম—'

'যেখানে খুশি তুমি যাও, চুলোয় হোক গোল্লায় হোক নরকে হোক—আমাকে জানাবার কোনো দরকার নেই। হাসপাতালে রুগী খালি একটা নয়।'

'জানো দিদি,' সেদিন বিমর্ষ মুখে ধ্রুব এসে বললে, 'পরাশরবাবু আমাকে বাইরে বদলি করে দিয়েছেন—'

উত্তরে জিগগেস করা উচিত, কোথায়? কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাসের সঙ্গে সুকণ্ঠীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : 'বাঁচলাম!'

'বাঁচলে?'

'তা ছাড়া আবার কি। সব সময় আর খবর যোগান দেওয়া চলবে না। গায়ের জ্বালার নিবারণ হবে।'

ধ্রুব গেল বাবাকে বলতে। রামমোহনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মফস্বলে গেলে তো বিষম ক্ষতি। কিছুই তখন তুলে তো পাঠাতে পারবে না সংসারে।

'না, না, একা থাকতে শেখাই তো ভালো।' সুকণ্ঠী সহজ-স্পষ্ট স্বরে বললে, 'আত্মীয়দের আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে পড়ে থাকায় কোনো বাহাদুরি নেই। খোলামেলা জায়গায় স্বাবলম্বনের স্বাধীনতায় থাকা অনেক ভালো।'

এ একটা কাজের কথা হল? যে করে হোক এ বদলি রদ করাতে হবে।

'তুমি একবারটি যাবে দিদি? তুমি যদি একটু বলো—' মিনতিম্লান মুখে ধ্রুব কাছে এসে দাঁড়াল।

'আমি? আমি যাব?' বোমার মতো ফেটে পড়ল সুকণ্ঠী।

বুঝতে পেরেছি, মনে-মনে গণনা করতে বসল, সব কারসাজি। চাকরি দেওয়া বদলি করা তদবিরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সবই শাণিত ষড়যন্ত্র।

অগত্যা রামমোহনবাবু ছেলেকে নিয়ে নিজে গেলেন দরবার করতে।

'বাবা, তোমার যাবার কি হয়েছে? তুমি কেন ছোটো হতে যাবে?' সুকণ্ঠী বাধা দিতে এল।

রামমোহনবাবু শুনলেন না। শুধু বললেন, 'আমার তো মনে হয় দিতে জানাটাই চালাকি নয়, নিতে জানাটাও চালাকি।'

মফস্বলই যেন বহাল থাকে। রাগে জ্বলতে লাগল সুকণ্ঠী। এত কথা তা হলে উঠতে পায় না সংসারে। পরাশরের জ্বলন্ত স্মারক চিহ্নের মতোই যেন জেগে আছে ধ্রুব। সব সময়ে যেন তারই সমৃদ্ধি আর ঔদ্ধত্যের গন্ধ বয়ে বেড়াচ্ছে। ও চলে যাক, সরে যাক চোখের সামনে থেকে। নিত্যনতুন কথার নিবৃত্তি হোক, মনে-জাগিয়ে-রাখার ঘা শুকোক। গা-জুড়োনো হাওয়া দিক।

'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল দিদি।' ধ্রুব ফিরে এসে বললে, 'বদলি কিছুতেই রদ করতে রাজি হলেন না।'

'আমার কথা কিছু বলেছিলে বুঝি?' যেন মাথার উপর খড়্গ তুলল সুকণ্ঠী।

'না, তোমার কথা বলতে হয় নি। কিন্তু মনে হয় বুঝতে পেরেছেন। নইলে প্রায় ঐ কথাগুলিই বললেন কি করে?'

'কোন কথা? কোন কথা আবার বলেছিলাম আমি?'

'বললে, আত্মীয়দের আঁকড়ে মাথা গুঁজে পড়ে থাকার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। ওরকমভাবে থাকতে গেলেই নানারকম ক্ষুদ্রতা, নানারকম কলহ। বিরোধের মধ্যে আলাদা হলে জোড় লাগে না, কিন্তু এমনি আলাদা থাকতে শিখলে আত্মীয়রা আলাদা হয় না।'

'এ সব আমি কিছু বলি নি। এ সব মোটেই আমার মনের কথা নয়।' চাপা আক্রোশে গজরাতে লাগল সুকণ্ঠী : 'তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের জব্দ করা, নাকাল করা আমাদের সংসারের আয় কমিয়ে দেওয়া—'

ধ্রুব কান চুলকোতে লাগল।

কে জানে হয়তো বা দুর্বল, অভিভাবকহীন করে ফেলা। হাতের কাছে একটা খাটিয়ে-পিটিয়ে ভাই ছিল, উঠতে-ছুটতে পারত, তাকে সরিয়ে দেওয়া।' মনে-মনে আবার গণনা করতে বসল সুকণ্ঠী। গভীর, সুগভীর ষড়যন্ত্র।

রাগে-রোষে দগ্ধ হ'তে লাগল সুকণ্ঠী। কোথায় শীতলসিঞ্চন আছে, মনোহর সরোবর আছে যেখানে ডুবতে পারলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, মনের জ্বালা যায়।

বৃষ্টি, বৃষ্টি নামল সেদিন। আপিস-আদালত ভাঙো-ভাঙো, এমন সময়। একটা সমুদ্রকে যেন আকাশে তুলে এনে সহসা উপুড় করে দিয়েছে। বৃষ্টিতে ফোঁটা থাকে, রেখা থাকে, দুটো রেখার মধ্যে খানিকটা বা ফাঁক থাকে। এ বৃষ্টির মধ্যে কোনো ফোঁটা নেই রেখা নেই ফাঁক নেই। এক সমুদ্র জল একসঙ্গে নেমে পড়েছে। যেন বাঁধ-ভাঙা বন্যা, কারু ধার-না-ধারা ধারাপাত।

আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সুকণ্ঠী। তাড়াতাড়ি একটা বাস ধরতে হয়।

প্রায় ছুটে একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বাস কোথায়? যা দু-একটা আসছে গন্ধমাদন হয়ে আসছে। হাত তুললেও দাঁড়াচ্ছে না। ভিতরের তাগিদে যদি বা কখনো দাঁড়াচ্ছে, পিলপিল করে লোক ছুটছে হানা

দিতে। পেঁাছুবার আগেই ভিজে একসা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার ফিরে আসছে স্বস্থানে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সুকণ্ঠী। মুষলধার শুনেছে, এ শতঘ্নীধার। কোথাও বিরাম নেই, দয়ামায়া নেই। কি করে বাড়ি ফিরবে ভেবে কুল পাচ্ছে না। নিঃসহায় দুশ্চিন্তায় সমস্ত শরীর ভারি হয়ে উঠেছে। জলের শাদা পর্দা যেমন ঘিরে আছে শূন্যকে, তেমনি সুকণ্ঠীকে ঘিরে আছে আতঙ্কিত অনিশ্চয়।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—বহুজনের সঙ্গে সুকণ্ঠীও হাত তুলল।

ভালো করে দেখে নি কেউ, একটা লোক আছে ভিতরে। সবাই নিরস্ত হল কিন্তু ট্যাক্সি নিরস্ত হল না। সুকণ্ঠীর কাছে দাঁড়াল, কার্ব ঘেঁষে। দরজা খুলে দিল ভিতর থেকে। আর আশ্চর্য এক মুখ হাসি নিয়ে ভিতরে ঢুকল সুকণ্ঠী।

উঠতে-উঠতে বললে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

'বর্ষায় সমস্ত হিসেব মুছে যায়। কুম্ভকর্ণের মতো অসম্ভবেরও ঘুম ভাঙে।' বললে পরাশর।

'হবে।' দরজা বন্ধ করল সুকণ্ঠী।

বেশ মেলে-ঢেলেই বসেছে মাঝখানে। ভঙ্গিটা আর কাঠ-কাঠ নয়, কাঠগোলাপ-কাঠগোলাপ। বেশ অনায়াসেই ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল পরাশর।

'ভিজে গিয়েছ দেখছি।'

'ও কিছু নয়—'

জনে-যানে যে শহর ঝলমল করছিল সে কেমন এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। অবাস্তবতার ছায়ামাখানো অন্যরকম পোশাক পরেছে। বাড়িঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, যেন কোন পরিত্যক্ত পাষাণের রাজ্য। দোকানের সাইন-বোর্ডগুলি যেন অন্য কি কথা কইছে. অসময়ে যে ক'টা আলো জ্বলে উঠেছে তা যেন কোন অনির্দেশের হাতছানি। লোকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে বা যারা পথ ভাঙবার চেষ্টা করছে সব আরেক কোন অজানা দেশের বাসিন্দে। সবাই কেমন অসতর্ক, অন্যমনস্ক। কিছু আসে যায় না, সবাই কেমন নিয়মের বাইরে, নিষেধের বাইরে রুল-টানা রুটিনের বাইরে।

ট্যাক্সি থেমে পড়ল। আর যাবার পথ নেই।

জলে জলময় রাস্তা। রাস্তা তো নয়, ডহরপানির খাল। দস্তুরমতো ঢেউ দিয়েছে, আশেপাশের দোকান বাড়ির দেয়ালে গিয়ে লাগছে। কোমরডুব জল ঠেলে যাচ্ছে কেউ-কেউ, ছেলেরা নৌকো ভাসিয়েছে, কাগজের, কাঠের। কেউ-কেউ বা সাঁতার কাটছে, জল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। এখানে-ওখানে বিগড়ে আছে মোটর। বোঝাই হয়ে রিকশা চলেছে ছপ্পর তুলে।

'কি বিপদই না হত ট্যাক্সি না পেলে।' বললে সুকণ্ঠী।

'বিপদ তো এখনও।' বললে পরাশর। 'ট্যাক্সি আর যাবে না। এঞ্জিনে জল ঢুকেছে। কতক্ষণে জল নামবে ট্যাক্সি চলবে কে জানে।'

তবু যেন এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই সুকণ্ঠীর। এই অজস্র বর্ষণ পথঘাট ডোবানো বাড়িঘর ভোলানো জল এই অনিশ্চয়ে থেমে থাকা—কিছুই যেন দুরূহ নয়।

কলকাতাই যেন নয় আর কলকাতা। যেন কোন আরেকটা জায়গা। নদীর ধারে একটা নৌকো বাঁধা। একটা ছাতিম গাছ ভিজছে নিঝুম হয়ে। কোথায় বসে কাঁদছে একটা নিরালা পাখি।

যেন এটা বাড়িফেরা কেরানির বিকেল নয়, ঘুমে-অঘুমে মেশা মস্ত মধ্যরাত।

খোকা মারা গেল।

পাশেই ঝুরুলি গ্রাম। সেখানে লোক গিয়েছিল রোস্তমকে ডেকে আনতে। যদি অন্তত এ সময়েও সে আসে। কিন্তু সে এল না। বরং বলে পাঠাল, 'কার না কার ছেলে—তার ঠিক নেই।'

কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সরবানু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

পাড়ার মুরুব্বি এসে বললে, 'এবার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হোক।' কারী এল। বাজার থেকে এল নতুন কাপড়, গোলাপজল, আতর-কর্পূর। এল খাটিয়া। খোকাকে একটা তক্তার উপরে শুইয়ে সরবানুর নানী গরম জলে তার গা ধুইয়ে দিল। খাটিয়ার উপর পাতলা কাপড়—দুটো চাদর, একটা খেলকা। ছিটিয়ে দিল আতর-কর্পূর, গোলাপজল। খোকাকে এনে তার উপর শুইয়ে খেলকা আর চাদর মুড়ি দিয়ে মাথার উপর, পায়ের তলায় আর মাজায় তিন বাঁধন দেওয়া হল। নতুন কাপড়ের সুতোর বাঁধন। তারপর কারী জানাজা নামাজ পড়লে। তারপর—তারপর খোকাকে নিয়ে গেল কবরখোলায়। জন্মের মতো চোখের আড়াল হয়ে গেল সরবানুর।

শুনেছে বাড়ির পাশেই, বাগানে, খোকাকে গোর দেওয়া হয়েছে। কবরের উপর বাঁশ দিয়ে তার উপর মাদুর দিয়ে, তার উপর মাটি দিয়েছে। জাফরির বেড়া দিয়েছে চার ধারে, যাতে শেয়াল এসে না খোঁড়ে। এত কাছে, তবু যেন কোথায়!

ছেলে সবে তিন মাস পেটে এসেছে, সরবানু চলে আসে তার বাপের বাড়ি। তারপর এই কেটে গেল তিন বছর। একটানা।

সে কি অমনি এসেছে? অমনি কি কেউ আসে? এলেও বাপের বাড়িতে বসে অশান্তির ভাত খায়?

তাকে তার স্বামী আর শাশুড়ী তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, মারধোর করত, মুখে কাপড় পুরে ঝাঁটা দিয়ে ঠেসে রাখত। মার সহ্য করা যায়, কিন্তু খিদে বোধহয় সহ্য করা যায় না।

ওকে দিত এই খাওয়ায় কষ্ট। কুকুর-বাঁধা লোহার শিকল দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখত ওকে, কিছু এসে যেত না, যদি খেতে দিত পেট ভরে, একটু বা আদর ভক্তি করে। থালা-বাসনে না দিয়ে মালসায় করে ভাত দিত, যে-মালসায় কুকুরে খায়। তাও নুন জল ভাত সব একত্র করে। নুন-জলের বেশি আর কিছু মিলত না ডাল-তরকারি।

অপরাধ কী সরবানুর? সরবানু খুবসুরৎ নয়। সে বে-পছন্দের মেয়ে।

ধারধোর করে বাপ বিয়ে দিয়েছিল তার। দিয়েছিল সোনার পার্শি-মাকড়ি, নোলক আর সিতাপাটি। রুপোর চুড়ি ছয় গাছা তাবিজ দুই পাটি, মল এক জোড়া। সব কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। ওরা যা দিয়েছে তা তো কোনোদিন গায়েই ওঠেনি। মুখ-দেখানি দিয়ে গিয়েছিল পাঁচটি টাকা, তাও আঁচলের খুঁট থেকে কবে খুলে নিয়েছে।

এক এক দিন রাতে রুস্তম এসে তার শিকল খুলে দিত। একদিন খাটে না উঠে সোজা দরজা খুলে সরবানু চলে এল তার বাপের বাড়ি, গাং-ভেড়ির উপর দিয়ে। এতটুকু তার ভয় করল না।

সেই থেকে তিন বছর সে আছে তার বাপের কাছে। আর এই তিন বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও রোস্তম এমুখো হয়নি। খোঁজ খবর নেয়নি। দেয়নি খোরাক-পোশাক।

তার বাপ, কছিমদ্দি জমিজমা খুইয়ে তখন শুধু ভাগচাষী। লাঙল-গরু নেই. মুজরো কবুলতিতে চাষ করে। দিনান্তর খাওয়া হয় না। তারই সংসারে সে কিনা এসে ভাগীদার হল! ছেলে হবার পর খবর পাঠিয়েছিল, যদি এবার ওদের মন টলে। ছেলে মারা যাবার পর আবার পাঠিয়েছিল, যদি বা গলে এবার।

দু'বারই এক তুরুক জবাব : 'কার না কাব ছেলে তার ঠিক নেই।'

আর নয়। গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা বললে, 'এবার বিয়ে-ছাড়ানোর মোকদ্দমা করো। মারপিট করত, তিন বছরের উপর খোরপোশ দেয়নি— মামলা এক ডাকেই ডিক্রি হয়ে যাবে।'

দুর্বল মোকদ্দমা করবো কি!—কছিমদ্দি চুপ করে চেয়ে থাকে।

'কিছু ভাববার নেই। মোকদ্দমার খরচ আকুঞ্জি সাহেব দেবেন বলেছেন। বলেছেন,—বিয়ে ছাড়ান পেলে নিকে করবেন সরবানুকে।' হোমরা-চোমরাদের মধ্যে কে একজন বললে।

'আকুঞ্জি সাহেব! কই শুনিনি তো!' মজলিসে সাড়া পড়ে গেল।

'হ্যাঁ হাঁটানে-ছেলে-শুদ্ধু নিকে করবেন না, এই ছিল তাঁর গোঁ। ছেলে এবার মরেছে, আকুঞ্জি সাহেবও তাই এগিয়ে এসেছেন।'

তবে আর কথা কী! আকুঞ্জি সাহেবের মতো লোক! এতবড়ো গাঁতিদার! বোর্ডের যিনি প্রেসিডেণ্ট! খাঁ-সাহেব হবার জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। তিনি চান সরবানুকে? কছিমদ্দির বুক আহ্লাদে উছলে উঠল।

তবে ডাক দাও এবার দিদার বক্সকে। কছিমদ্দিকে নিয়ে যাক উকিল-সাহেবের সেরেস্তায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের আর্জির মুশাবিদা হোক।

এতটা হাঙ্গামা-হুজ্জুত সরবানুর পছন্দ হয় না। মামলা-ফয়সালা করে লাভ কী। তার চেয়ে সবাই যদি ধরে-পড়ে চাপ-চুপ দিয়ে রোস্তমকে রাজি করাতে পারে মাস-মাস বরাদ্দ কিছু টাকা পাঠাতে, তা হলেই সে বর্তে যায়। রোস্তমদের অবস্থা তো ভালো। বাড়িতে টিনের ঘর, কাঠের খুঁটি। জোন-মান্দার দিয়ে চাষ করায়। গাড়ি-গরু রাখে। অনায়াসেই ক'টা টাকা ফেলে দিতে পারে। পেটের ভাত, পরনের কাপড়টা অন্তত চলে যায়। নিকে-সাদিতে সুখ কই!

কিন্তু রোস্তম একেবারেই কাঠ-গোঁয়ার। টাকাকড়ি তো দেবেই না, বরং উলটে বদনাম দেবে। খাওয়া-পরার চেয়েও মান-ইজ্জত বড়ো জিনিস। না, আর সে কাকুতি-মিনতি করতে পারবে না। চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এবার দাঁড়াবে সে নিজের জোরে, নিজের অধিকারে। আইনের হাওয়ালায়।

তাই ডাক পড়ল এবার দিদার বক্সের। বাঘের মুখে যেন হরিণ পড়ল। তুষের গাদায় আগুনের ছিটে।

এ অঞ্চলটা উকিল হামিদ সাহেবের প্রতাপের মধ্যে। তা ছাড়া এ বিয়ে-ছাড়ানো মোকদ্দমায় তাঁর মতো ওস্তাদ-ওস্তাগর আর কেউ নেই।

ঝুরুলি গ্রামে সমন জারি হল রোস্তমের উপর। এ গ্রাম উকিল হরিসহায়বাবুর জিম্মাদারিতে। তাঁর দালাল হৃদয় ঘোষ রোস্তমকে প্রায় ঘোড়া-ছুটিয়ে নিয়ে এল তাঁর বৈঠকখানায়।

যারা দালাল তারাই মুহুরি। আর এই মুহুরিদের মুঠোর মধ্যেই যত মামলা-মোকদ্দমা। তারা উকিলের থেকে মুনফা নেয় মক্কেলের থেকে মেহনতানা। তারা আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

রোস্তম জবাব দেয় : সমস্ত ভুয়ো, সমস্ত মিথ্যে কথা। একদিনের জন্যেও

সে সরবানুর গায়ে হাত তোলেনি, দাবড়ি দিয়ে কথা বলেনি কখনো। লায়লা-মজনুর মতো তাদের ভালোবাসা ছিল। সমস্ত তার শ্বশুর কছিমদ্দির জালসাজি। বিয়ে ভেঙে দিয়ে নিকে দেওয়াবে। মেয়ে মোটা টাকা পাবে দেনমোহরের, আর নিজেও সে আদায় করবে তহরি। কছিমদ্দি একটি পাকা শয়তান। বড়ো মেয়ে কুলসমকেও এমনিভাবে বিয়ে ভাঙিয়ে নিকে দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফায় : সরবানু বাপের বাড়িতে আছে মোটে দেড়বছর। দুই বছর ধরে খোরপোশ না দিলেই তবে বিয়ে ভাঙার একতিয়ার হয়। সেই দুই বছর এখনো পুরো হয়নি। তা ছাড়া যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ওঠা-বসা করে না, কুমতলবে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে, তার আবার খোরাক-পোশাক কী।

তৃতীয় দফায়, আর এইখানেই হরিসহায়বাবুর নিজস্ব খোদকারি : মেয়েটা খারাপ একেবারে খাস্তা।

তাই যদি, তিন-তালাক দিয়ে দে না? কছিমদ্দির দল রোস্তমের কাছে গিয়ে ঝাপটা মারে। যে মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আবার পিরিত কিসের? যাক না সে জলে ভেসে।

'না, আমি তালাক দেব না। আমার মান আছে।' রোস্তম গম্ভীর হয়ে বলে : 'আমি বউ-ফিরে-পাবার উলটো মামলা করব।'

সুতরাং দু'-পক্ষে শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। যন্ত্রতন্ত্র। সাক্ষী সাজানোর কারিগরি। মেয়ের পক্ষে, প্রথমে, মহিম ঘাসী। তিন বছর আগে জ্যৈষ্ঠের এক জ্যোৎস্নারাতে সে সরবানুকে দেখেছিল হেঁটে যেতে গাং-ভেড়ির উপর দিয়ে, ঝুরুলি থেকে নাগপুরের দিকে।

'তুমি তখন করছিলে কী অত রাতে?'

'কুটুম-সাক্ষাৎ করে বাড়ি ফিরছিলুম।'

হ্যাঁ, নাগপুরে কছিমদ্দির বাড়ির থেকে বিশ-কুড়ি রশি দূরেই তার ভিটে। পাড়াসুবাদে সরবানু তাকে নানা বলে ডাকে।—হ্যাঁ, একটুখানি অন্তরে-অন্তরে থেকে বাকি পথটুকু এগিয়ে গিয়েছিল মহিম।

উলটো দিকে কাটান-সাক্ষী মমিন গাজি। সে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান। তার গাড়িতে চড়েই কছিমদ্দি তার মেয়ে নিয়ে গেছে গেল বছর আগন মাসের শেষে। ফসল উঠে যাবার পর টানা মাঠের উপর দিয়ে। আলগা সাক্ষী আছে

আরো। সাধু দালাল আর জুড়ন সরদার। এরা কেউ খাতির-খাতরার লোক নয়, চুনের ঘরে সব ধর্মকথা বলে যাবে।

আরো সব শাঁসালো সাক্ষী আছে রোস্তমের। পাড়াপড়শী। আলতাপ আর আরমান কারিকর। কেউ এরা শোনেনি কোনোদিন হুড়-ঝগড়া। খারাপ-মন্দ কথাও একটা কানে আসেনি। যদি মারপিট হবে তবে চিক্কুড় মেরে কাঁদবে তো মেয়েটা। কোনো একটা টুঁ শব্দও তাদের কানে পেঁাছোয়নি।

কছিমদ্দির দল বলে, 'ঘরের বউ কি চেঁচিয়ে কাঁদবে নাকি? পাড়া মাথায় করে? সাক্ষী রেখে? সে কাঁদবে গুমরে-গুমরে, বন্ধ বুকের মধ্যে। তা ছাড়া সরবানুর খালু, রাজাউল্লা, নিজের চোখে সরবানুর পায়ে শেকল দেখে আসেনি? ওদের বাড়িতে জন দিত যে গোপাল মোল্লা, সে দেখেনি তার ভাত খাবার মালসা? কাঁদবে কি? মার খেতে-খেতে মারঘেঁচড়া হয়ে যায়নি সে?'

দু'পক্ষেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। সাক্ষী ভাঙাবার ফিকির খুঁজছে দু'দলেই। দিদার বক্স আর হৃদয় ঘোষ এসে বিরুদ্ধ তাঁবুতে বসে ফিসির-ফিসির করে। এটা-ওটা তদবির করতে হবে বলে পয়সা নেয়। তারপর একই হাঁটা-পথ দিয়ে পাশাপাশি খোশগল্প করতে-করতে শহরে ফেরে।

হৃদয় বলে, 'মেয়ের ঐ খালু রাজাউল্লো ভারি তেজি সাক্ষী। বড়ো জোতদার, তাই ইউনিয়ন-বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ওকে যদি হাত করতে পারা যায় তা হলে আর কথা নেই।'

ওদিকে দিদার বক্স বলে, 'পাড়ার সাক্ষী একটা খাড়া করা দরকার। এতটা নির্যাতন হল মেয়েটার ওপর আর পাড়ার কেউ তা জানতে পারবে না? পাড়ার লোক এককাট্টা হয়ে থাকে, কুচ পরোয়া নেই, আমি দাঁড় করাব পাড়ার লোক। এই তো সামনেই আছে—ফরিদ মণ্ডল। এমন শেখা শিখিয়ে দেব যে, কলকাত্তা বোম্বাই বনে যাবে।'

এদিকে টাকা খরচ করে আকুঞ্জি সাহেব; ওদিকে রোস্তমের চাচা, বশিরদ্দি।

শুনানির দিন পড়েছে, মাস দুয়েক পরে।

এখন কথা উঠেছে সরবানুর জবানবন্দিটা কমিশনে হবে কিনা।

দিদার বক্স বলে, 'বা, কমিশনেই হবে বৈকি। পর্দানশিন স্ত্রীলোক, সে কি আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে নাকি? কী বলেন আকুঞ্জি সাহেব?'

কখনই না। যত টাকা লাগে আকুঞ্জি সাহেব রাজি।

কিন্তু সরবানু রাজি নয়। সে বলে, 'না। আমি আদালতে, হাকিমের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। উঁচু গলায় বলব আমার দুখের কথা। যারা গরিব, যাদের কেউ নেই, হাকিমই তাদের মা-বাপ।'

অন্তরালে কছিমদ্দি তাকে বোঝাতে আসে। সরবানু ঝিলিক মেরে বলে ওঠে, 'আকুঞ্জি সাহেব আমাদের কে? ওর ঠেঙে টাকা খেতে যাব কেন আমরা? বিয়ে তো এখনো ছাড়ান পাইনি।'

দিদার বক্সের বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ে। কমিশন-জবানবন্দি হলে আরেক কিস্তি পয়সা। উকিল-আমলা-মুহুরি-পেয়াদা। ওর যেন গো-ভাগ্য নয়, এঁটুলি ভাগ্য।

'শুনেছ? বাদিনী কমিশন করাবে না। এ যে প্রায় ধান পাকিয়ে মই দিয়ে দিলে!' দিদার বক্স হৃদয় ঘোষের কাছেই নালিশ করে!

'আর বলো কেন!' হৃদয় ঘোষেরও সেই একই নালিশ: 'রোস্তমকে বললাম, তোমার মার একটা কমিশন-জবানবন্দি করাও। আর্জিতে তোমার মার নামে বলেছে অনেক নরম-গরম, সাফাই একটা তার দিয়ে রাখো। ছেলে তাতে রেগে প্রায় মারতে আসে! বলে,—আমাতে-ওতে কাণ্ড, তাতে আবার মাকে টানো কেন?'

'আমি ভয় খাইয়ে দিয়ে এসেছি কছিমদ্দিকে। বলেছি: মেয়ে তোমার আদালত-আদালত করছে, ভিড়ের মাঝে হকচাকিয়ে গিয়ে সব শেষে ভণ্ডুল করে দেবে।'

'আমিও ছেড়ে দিইনি। বলে এসেছি: তোমার মা যদি না নিজের মুখে আর্জির কথা অস্বীকার করে, তবে আর দেখতে হবে না; মামলা নির্ঘাত ডিক্রি হয়ে যাবে।'

দুই বন্ধু পাশাপাশি হেঁটে যায়। মুখের কাছে মুখ এনে এক কাঠিতে বিড়ি ধরায় দুজনে।

দু'-পক্ষই ভয় পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কেননা আপোস-নিষ্পত্তির কথা উঠেছে একটা: দল-সালিস ডেকে মিট করিয়ে ফেলো। গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা নিজের থেকেই মজলিস ডেকেছে।

দু'-পক্ষেরই ভয়। সরবানু যদি জেতে তবে রোস্তমের মান যায়, মুখ পোড়ে। দেনমোহরের বাজার চড়ে যায় দেখতে-দেখতে। বউ-কাঁটকী বলে

মার অপবাদ হয়। আর, যদি রোস্তম জেতে, তবে জন্মের মতো সরবানু অন্নদাসী হয়ে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ায়। মামলার ফলাফল কিছুই বলা যায় না, তরাজু কখন কার দিকে ঝুঁকে পড়ে! তাই দু'-পক্ষই সায় দেয়, উস্কে দেয় সালিসবাবুদের।

সালিসের সর্ত খুব সোজা। রোস্তম সরবানুর বরাবর একটা তালাকনামা সম্পাদন করে দেবে, আর তার পণস্বরূপ সরবানু দেবে তাকে পঞ্চাশ টাকা।

মন্দ কী। ভাবলে রোস্তম। যে মেয়ে বশ মেনে থাকতে চায় না, কী হবে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে? দূর করে দিয়ে নতুন বউ ঘরে আনবে। মন্দ কী, মাঝের থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার। পড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনাই লাভ।

মন্দ কী। ভাবলে সরবানু। যে ভাবে হোক বিয়ে ছাড়ান পেলেই হল। আখোচ করে কী হবে। গায়ে এখন আর কোনো দাগ-জখমও নেই, জ্বালা-যন্ত্রণার ঝাঁজও এখন মুছে গেছে মনের থেকে। টাকা কে দেয় না-দেয় তার খোঁজে তার কী দরকার। ছেলে একটা তার অনাদরে মরে গেছে বটে, কিন্তু তাই বলে তার শরীরের জোর মরে যায়নি।

আপোস-রফার কথা উঠতেই আরেক মহলে আগুন জ্বলে উঠল। হৃদয় ঘোষ-দিদার বক্ষ নয়, এবার আসল ঠাকুরের স্থান। আগুন জ্বলে উঠল হরিসহায়বাবু আর হামিদ সাহেবের জঠরে। আপোস হওয়া মানেই গোড়া ধরে গাছ কেটে ফেলা। এ বজ্রপাত মাথা পেতে সইবেন না তাঁরা কখনো। অন্তত পঁচিশ টাকা করে না পেলে তাঁরা ছোলেনামায় দস্তখৎ দেবেন না।

এমনিতে দু'টাকা পেলে যাঁরা টঙে ওঠেন তাঁদের হাঁকার আজ—পঁচিশ টাকা। মক্কেলের আপোস আর উকিলের আপসোস। উপায় কী? কুড়িয়ে খেতে না পেলেই কেড়ে খেতে হয়।

উকিলরা ঘাড় বেঁকায় দেখে পক্ষরাও পিছিয়ে পড়ে। দু'দিক থেকে হৃদয় ঘোষ আর দিদার বক্ষ শক্ত হাতে পাঁচন কষতে থাকে। শুধু উকিলের সই? মুহুরিয়ানা নেই? আমলায়ানা?

আর, দুর্বল ছাড়া আপোসে রাজি হয় কে? মোকদ্দমায় যার যতখানি জিদ, তার ততখানি জিত।

সালিসরা ছোড়ভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষরা আবার নিজের-নিজের কোটে ফিরে গিয়ে ঘোঁট পাকায়।

সত্যি, কোনো মানে হয় না—রোস্তম মনে-মনে বলে। আপোস হয়ে গেলে শ্বশুর কছিমদ্দি জব্দ হয় না। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয় না সরবানুর। রোস্তমের কী? একটা ছেড়ে চারটে পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারে। গায়ে পড়ে তালাক দিতে যাবার তার কি হয়েছে?

সত্যি, কোনো মানে হয় না—এ সরবানুরও মনের কথা। সে আদালত করেছে, আদালতই তাকে আশ্রয় দেবে। এমন দাঙ্গাবাজের সঙ্গে আবার আপোস-রফা কী। লাথি-চড় মেরে না-খেতে দিয়ে শরীরের জৌলস কেড়ে নিয়েছে তার উপরে এই বেইজ্জতি! বলে,—কার ছেলে কে জানে। তাকে আবার টাকা দিয়ে তোষামোদ করা! কখনো না।

হৃদয় ঘোষ আর দিদার বক্স আবার বিড়ি ধরিয়ে শহরে ফেরে।

সরবানু সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়।

গায়ে-মুখে বোরখা নেই। আলগা একটা ছোট কাপড় গায়ের উপর চাদরের মতো করে ভাঁজ করে নিয়েছে। মাথার কাপড় মাথা থেকে এক চুলও নেমে আসেনি। চোখ দুটো টলটল করছে। অনেক কথা বলে ফেলার অধৈর্যে।

'কি উকিল সাহেব,' হাকিম জিগগেস করলেন এজলাস থেকে: 'মামলা মিটিয়ে ফেলুন না?'

সরবানু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'জীবন বিসর্জন দেব, তবু মামলা মিটিয়ে নিতে পারব না ওর সঙ্গে।'

রোস্তমের দল হরিসহায়বাবুর পিছন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বে-আব্রু হয়ে সাক্ষী দিতে এসেছে, সরবানুর এই বেহায়াপনায় রোস্তম প্রথমটা তর্জন করে উঠেছিল—তার স্ত্রী হয়ে এই অশিষ্টতা! কিন্তু বেগতিক হয়ে তাকে ঠাণ্ডা হতে হয়েছে,—সরবানু আর তার স্ত্রী থাকতে রাজি নয়। সে বেছপ্পর, তাই সে বে-পরদা।

লম্বা জবানবন্দি হচ্ছে সরবানুর। রঙ ফলিয়ে তার মারের কাহিনী বলছে। তাব না-খেতে পাওয়ার কাহিনী। গলাটা বড্ড খরখরে, স্পষ্ট। এতটুকু থামে না, দমে না। জায়গা বদলায় না। সত্যের সুর যেন এসে কানে লাগে।

তারপর ছেলের কথা উঠল। এবার সরবানু ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। এ একেবারে তার আরেক রকমের চেহারা। বর্ষার আকাশের মতো। কাঁদতে

যদি একবার শুরু করল, আর থামতে চায় না। কেবলই বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। শরীরটা ঝাঁকানি খেয়ে কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

বড়ো রোগা হয়ে গেছে সরবানু। অনেক জুড়িয়ে গেছে তার গায়ের রঙ। ডান ভুরুর উপরে মারার সেই কালো দাগটা কেমন করুণ করে রেখেছে তার চোখের চাউনিটাকে। হাতে শুধু দু'গাছা গালার চুড়ি। খালি পা। পরনের শাড়িটা মোটা, আধ-ময়লা। বুকের থেকে, কোলের থেকে, দুই বাহুর মধ্যে থেকে কী যেন চলে গিয়েছে এমনি একটা খালি-খালি ভাব।

জেরায় উঠে হরিসহায়বাবু প্রথমেই ছেলেব জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে একটা জট পাকিয়ে তুললেন। তার সঙ্গে বিয়ের তারিখ, বাপের বাড়ি যাবার তারিখ, আর্জি-দাখিলের তারিখ সব একত্র করে বাধিয়ে দিলেন গোলমাল।

ধাঁধা লেগে গিয়েছে সরবানুর। ভুল করে ফেলছে। উলটা-পালটা বলছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এমনি করলে মামলা সে জিতবে কি করে? তার জন্যে কষ্ট হয়। মায়া করে।

'আফটার দি রিসেস—' হাকিম হঠাৎ কলম রেখে খাস-কামরায় নেমে যান। এক জেরাতেই মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে—রোস্তমের দল খুশি হয়ে ওঠে।

আধ ঘণ্টা পর হাকিম আবার উঠে আসতেই মামলার ডাক পড়ে। হাজিরার সব সাক্ষীই আছে, শুধু সরবানু আর রোস্তমকেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারা ততক্ষণে টাবুরে নৌকোয় করে ইছামতীতে ভেসে পড়েছে।

তাদের জীবনে এমন একটা দিন কোনোদিন আসেনি। তাদের চার দিকে উকিল-মুহুরি আমলা-ফয়লা সাক্ষী-সাবুদের ষড়যন্ত্র—তারি মধ্য থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে তারা। চলে এসেছে নদীর উপর ঝকঝকে আকাশের নিচে। আর কে তাদের ধরে! যদি ধরে জলে লাফিয়ে পড়বে তারা, সাঁতরে পার হয়ে যাবে।

'খোকাকে কোথায় গোর দিয়েছিস?' জিগগেস করে রোস্তম।

'বাগানে—' রোস্তমের কাঁধের কাছে মুখ গুঁজে সরবানু ফুঁপিয়ে ওঠে।

'বাগান? বাগান কোথায়?

'নামে বাগান। আওলাত-ফসল কিছুই নেই। শুধু একটা গাব গাছ। সেই গাবগাছের তলায়—'

'চল্, দেখে আসি।'

জমি

মোকদ্দমা শেষ হয়ে গেল।

শেষ হয়ে গেল? জিগগেস করল হেলালদ্দি। জিগগেস করল আরো অনেকে। পাড়া-বেপাড়ার দশজনে। মোকদ্দমায় কে পেল কে ঠকল সেটা জিজ্ঞাস্য নয়। মোকদ্দমা যে শেষ হয়ে গেল এটাই আপশোষের কথা।

এ কদিন সমানে তারা ভিড় করেছে আদালতে। কে কী বলে বা এক কথা বলতে আরেক কথা বলে ফেলে তাই শুধু শুনেছে এ কদিন। কে কি রকম হিমসিম খায়, কার কী কেচ্ছা-কীর্তি বেরোয়। কার দায়মুল হয়েছিল, কে বেটি চুরি করেছিল ,কে পড়েছিল ঘরপোড়া মোকদ্দমায়। সকাল থেকে শেষবেলার কাচারি পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়। ভিড়হুড় দেখে আদালত-ঘর থেকে তাদেরকে বের করে দিলে চাপরাশি-আর্দালির হাতে টিকিটের পয়সা গুঁজে আবার গুটি-গুটি এসে দাঁড়ায়। সাক্ষীর প্রতি সহানুভূতিতে নিজেরই অলক্ষ্যে ঘাড় নেড়ে হাঁ-না ইঙ্গিত করে বসে। শত্রু-মিত্র সব যেন তাদের ঘরের লোক।

জীবনে আর কোনো নেশা নেই। রোমাঞ্চ নেই। ক্রিকেট-ফুটবল নেই, থিয়েটার-বায়স্কোপ নেই, রেস-রেশালা নেই। নেই কোন জুয়োখেলা, মদ-গাঁজা। থাকার মধ্যে আছে এই মোকদ্দমা। দাদ-ফরিয়াদ। তার হার-জিতের খাম-খেয়াল। উকিলে-উকিলে কাছি-টানাটানি।

মোকদ্দমার ফল বেরিয়েছে শুনলাম। পেল কে? ফলের কথা একমাত্র জিগগেস করলে আমিরন।

আর কে পাবে? সোনামদ্দি তাকিয়ে রইল দুর্বলের মত।

তার মানে? আমরা পাইনি?

আমরাই তো পাব। যেদিকে ধর্ম সেই দিকেই তো জিত হবে।

আহলাদে ঘাই মেরে উঠল আমিরন। আমরা পেয়েছি? আমাদের দিকে রায় হয়েছে? ঠকে গেছে জলিল মুন্সি? বলো কি, খোদাতালার এত রহমৎ হয়েছে আমাদের উপর? জমি-জায়গা আমাদের থেকে গেল নিজ চাষে?

মোকদ্দমা জিতলাম তবু তুমি অমন মনমরার মত তাকিয়ে আছ কেন? তোমার জেল্লা-জলুস সব গেল কোথায়?

এরপর আবার আপিল আছে। জলিল মুন্সি আপিল করবে বলেছে।

সে পরের কথা পরে। এখন তো আমোদ করে নাও। কাল উপোস করতে পারি ভেবে আজকের বাড়া ভাতে তো ছাই দিতে পারি না। নাও, তামাক সেজে দি এক ছিলিম। উজুর পানি এনে দি। আছরের নামাজ পড়ো। মজিদে যাও, মজিদে পয়সা দিয়ে এস কারীর হাতে। দরগার খাদেমের কাছে চেরাগী দিয়ে এস। সঙ্গে মহবুবকে নিয়ে যাও। আমাদের বুকচেরা ধন মহবুব। পাকা স্বত্বের জমি পেলাম। এবার আর ভাবনা কি। থিত-ভিত হল এতদিনে।

কিন্তু না, এরপর আবার আপিল আছে। আবার খরচান্ত, আবার ভোগান্তি, আবার আইনের খাম-খেয়াল।

তোমার কোনো ভয়-ডর নেই। কড়া করে তামাক সেজে আনে আমিরন। জলিল মুন্সির সাজানো মোকদ্দমা ফেঁসে যাবে নির্ঘাত। জুলুমদারি টিকবে না শেষ পর্যন্ত। আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাক, জমি ছাড়িয়ে নিতে দেব না।

রায়তি স্বত্বের জমি ছিল হুকুমালির। লড়াইয়ে গেছে সে কুলি-মজুরের ঠিকাদারি হয়ে। যাবার আগে বেচে দিল সে সোনামদ্দির কাছে প্রায় মাটির দরে। উনিশ গণ্ডা জমি, মোটে আড়াই শো টাকা বহায়। সোনামদ্দির বউটা সোনাচাঁপার মত দেখতে। সেই একটু দর কষাকষি করেছিল। না, শাড়ি-জেওর টাকা-পয়সা কিছুই যে চায় না। সে জমি চায়, জোরের জমি। শুধু ফসলের জোর নয়, স্বত্বের জোর। পাকাপাকি স্বত্ব। যাতে কায়েম হয়ে থাকতে পারে তারা। গাঁথনিটা মজবুত হয়। যাতে না পরের জমিতে বর্গাইত হতে হয়। জমিতে চষি-রুই কিন্তু তা পরের জমি। নিজের জমি চাই। স্থিতিবান স্বত্ব। যাতে না এক নুটিশেই মেছমার হয়ে যায়।

একটু মায়া পড়েছিল কি হুকুমালির?

কি মিয়া, বেচবেই যদি জমি, একবার আমাকে যাচতে পারলে না? না, আমরা উচিত দাম দিতাম না? জলিল মুন্সি পাকড়াল হুকুমালিকে।

রোকের জমি। জলিল মুন্সির বাড়ির বগলে। ডাক নাম আশি-মণি।

এক কানিতে আশি মণ ধান হয়। কবালার কথা শুনে জলিল মুন্সি করাতের পাতের মত লকলক করে উঠল।

বলি দিয়েছে কত সোনামদ্দি? আড়াই শো? এই বাজারে এ জমির দাম আড়াই শো? আমি তোমাকে পাঁচ শো দিতাম।

দলিল এখনও রেজিস্ট্রি হয়নি। চোখ ছোট করল হুকুমালি। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে বলেই বুঝি মন তার শক্ত হচ্ছে।

না হোক, রেজিস্ট্রিতে কিছু এসে যায় না।

হুকুমালির সঙ্গে ষড় করলে জলিল মুন্সি। নগদ দুশো টাকা দিয়ে আরেকটা কবালা লেখাপড়া করিয়ে নিলে। যোগ-সাজস করলে স্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের সঙ্গে। সোনামদ্দির কবালার যে তারিখ, তার চারদিন আগেকার তারিখ বসালে স্ট্যাম্প বেচার তায়দাদে। সেই মোতাবেক দলিল সম্পাদনের তারিখ দিলে। ফলে দাঁড়াল এই, জলিল মুন্সির কবালা সোনামদ্দির কবলার আগুড়ি হয়ে গেল। সোনামদ্দির কবালা যদি পাঁচুই, জলিল মুন্সির হল পয়লা। স্ট্যাম্প বেচার খাতা-পত্রেও সেই পয়লা লেখা। কোথাও আর ফাঁক-ফোঁকড়া রইল না। তক্তায় তক্তায় মিশ খেয়ে গেল।

ওয়াকিবহাল লোক এই জলিল মুন্সি। সে জানে দলিলের স্বত্ব হয় দলিল লেখাপড়ার তারিখ থেকে, রেজেস্টারির তারিখ থেকে নয়। কারসাজি করে তারিখ পিছিয়ে দিতে পারলেই তার স্বত্ব প্রবল হয়ে উঠবে।

কোনো ভেজালে পড়ব না তো? হুকুমালি ভয়ে ভয়ে জিগগেস করলে।

তোমার ভয় কী! তুমি তো যুদ্ধে যাচ্ছ কুলির জোগানদার হয়ে। তোমার লাগ তখন পায় কে? যখন মামলার ডাক হবে, আদালত জিগগেস করবে, বায়া কোথায়, বায়া কী বলে? কোথায় বায়া. কে তাকে সমন ধরায়! আমি বলব, বাধ্য হয়েছে সোনামদ্দির। সোনামদ্দি বলবে, দায়াদী আছে জলিল মুন্সির সঙ্গে। শুধু দলিল তজদিগ করে হাকিমের বিচার করতে হবে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধোঁকা লাগিয়ে দেব।

সেই মামলার রায় বেরিয়েছে আজ।

দলিল লেখক, ইসাদী সাক্ষী নিশান দায়ক সবাই হলফান জবানবন্দি দিয়েছে জলিল মুন্সির দিকে। রেজেস্ট্রি আফিসের টিকিটবরাত, ভেণ্ডারের খাতা তলব—সব কিছুরই তজবিজ হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

লখাইর বজ্রসার লোহার ঘরে কোথায় একটি ফুটো লুকানো ছিল ঢুকল কাল-কেউটে। জলিল মুন্সির তণ্ডকী মামলা বেফাঁস হয়ে গেল।

দখল ছাড়েনি সোনামদ্দি। একদিনের জন্যেও নয়। একবার হাল-গরু নিয়ে জবরান দখল করতে এসেছিল জলিল মুন্সির কিরষান। সোয়ামী-স্ত্রীতে মিলে হাল তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজ হাতে জয়ালি খুলে দিয়েছিল আমিরন। বলেছিল, বুকের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু জমি নিতে দেব না। হাট-ঘাট বাজারবন্দর করতে সোনামদ্দি বাইরে যায়, ততক্ষণ আমিরন চোখ রাখে। পাখির নখের মতন চোখ। জমি তার বাড়ির বন্দের সামিল এক ঘেরের মধ্যে। খাটে-পিটে খায়-লয় আর সব সময় চোখ রাখে জমির কিনারে। ঘেঁসতে সাহস পায় না জলিল মুন্সি।

তাই জলিল মুন্সিকেই আর্জি করতে হল। নিজের দখল-স্থিরতরের নয়, বিবাদীর জবরদখল উচ্ছেদের।

কিন্তু টেঁকাতে পারল না মামলা। ডিসমিস খেয়ে গেল। আদালত রায় দিল, সোনামদ্দির কবালাই খাঁটি বাদীরটা জাল-সাজ, ফেরেবী। তাই জমির স্বত্ব শুধু সোনামদ্দির। তার আইনী দখল। জলিল মুন্সি বেমালেক।

আপিল করবে জলিল মুন্সি। এই আদালতই শেষ নয়। আছে আরো উপরতলা। সেই ঘরে উঠবে সে সিঁড়ি ভেঙে।

উঠুক। উঠতে দাও। আমরা নিচে থেকেই আসমান দেখি। উপরের দিকে তাকাল আমিরন।

আপিল করলে আর ওর সঙ্গে পেরে উঠব না। বললে সোনামদ্দি।

আমরা না পারি ধর্ম পারবে। আপিল করুকই না আগে। আগেই তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? প্রথম জিতের পর যে একটু আমোদ করব তা করতে দিচ্ছ না।

কাঁচা চিকণ ধান ফলেছে জমিতে। কালচে ধরেছে এখন, কদিন পরেই পাকা সোনার রং ধরবে। আলের আগায় দাঁড়িয়ে যে একটু রূপ দেখি তার তুমি ফরসুৎ দেবে না। দাঁড়াও, বালি দিযে কাস্তে-কাঁচি ধার করি আগে, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে ধান দাইব। ঢেঁকিঘরের তদবির করি, "সুন্দুইরার হাতি" ঢেঁকিগাছটাকে ঝাড়ি-পুঁছি। একদিন ফিরনি-পায়েস তৈরি করি, একদিন বা চিটে গুড় দিয়ে চিতই পিঠা খাই। তুমি আগে থেকেই কু ডেকো না।

সব বিষয়ে বুঝজ্ঞান হয়নি এখনো আমিরনের। কড়ি খেলতে বসে কখন চার চিতে চক আর কখন পাঁচ চিতে পাঞ্জা—এ কে বলতে পারে। কে বলতে পারে মোকদ্দমার ফলাফল। সাজানো বাগান শুকিয়ে যায় এক শ্বাসে। আবার কখনো বা মরা গাছে বউল-মউল ধরে। কেউ বলতে পারে না। হয়তো ঘাটে এসে ঘাটের নৌকো ঘাটে পচল আর পাল মেলল না।

আর এমনও তো হতে পারে যে আমাদের জিৎ বহাল থাকল শেষ পর্যন্ত। যা সত্য তার আর রদবদল হল না। হতে পারে না এমন? কুচকুচে কালো চোখে ঝিলিক খেলে গেল আমিরনের।

এতটা যেন সোনামদ্দির বিশ্বাস হয় না। যে দুর্বল তাকে নিয়ে ধর্ম শুধু খেলা দেখায়. ছলচাতুরি করে। দরজার গোড়ায় স্থির হয়ে বসে থেকে সারা জীবন পাহারা দেয় না। কখন আবার চলে যায় একলা রেখে।

আপিলের শুনানি তো আর কালকেই হয়ে যাচ্ছে না। রায়ও উল্টে যাচ্ছে না রাতারাতি। এখুনি মুখ কালো করব কেন? বাজার-সওদা করো, কুটুম্বিতেয় যাও, ভাই-বন্ধুর সঙ্গে হৈ-হল্লা করো, পান-তামুক খাও। আমিও কটা দিন একটু হালকা পায়ে হাঁটা-চলা করি, মেন্দি পাতায় হাত পা রাঙাই, চোখের কোলে কাজল আঁকি। ছেলেটাকে নাচাই-খেলাই।

তুমি কিছু ভেবো না, মন খারাপ কোরো না। আমিরন বসে এসে সোনামদ্দির পাশ ঘেঁসে। আমার মন বলছে আমাদের পাওয়া জমি আমাদেরি থাকবে। দেখছ না জমি কেমন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বান্ধবের মতন।

তা তো দেখছি। কিন্তু খরচ-তখরচ করতে হবে আপিলের মোকদ্দমায়। তা জুটবে কোত্থেকে?

আমিরন ঝাঁকরে উঠল : আমরা তো জিৎপার্টি। আমাদের আবার খরচ কি?

আনাড়ি অবুঝ, আদালতী কান্ড কিছুই জানে না। জলিল মুন্সি এরি মধ্যে কত তলাসী-তদবির আরম্ভ করে দিয়েছে। আপিলের মামলা কার ঘরে চালান করে নিয়ে সুফল হবার আশা তার তদবির। অমুক হাকিম নুতন সবজজ হয়েছে, আপিল পেলেই হাতে মাথা কাটে, তার ঘরে নিয়ে চলো। এর আবার উল্টোবুঝ আছে অমুক হাকিম। বোঁটা খসতে আর দেরি নেই, বেশি লিখতে-বকতে চায় না, নম-নম করে সেরে দেবে। যা আছে তাই বহাল রাখবে। তার ঘরে নিয়ে চলো। অমুক না তমুক তার দরবিট চলবে। তারপর উকিল

নিয়ে টানাটানি। কোন ঘরে কোন উকিলের পসার তার খোঁজ-তালাস। প্রতি পদে তহরি, প্রতি পদে মেহেনতানা।

তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আল্লার নাম করে বসে থাকো।

বুঝজ্ঞান থাকলে এমন কথা কেউ বলে না। ঘরগৃহস্থি করে, সংসার-সৃষ্টির জানে কী? শেষকালে জেতা মামলা বে-তদবিরে না ফস্ত হয়ে যায়। ওষুধে সারা ভালো রুগী না শেষকালে পথ্যের অভাবে মারা পড়ে।

নিম্ন আদালতের খরচ টানতেই সোনামদ্দি নাকাল হয়ে পড়েছে। উপরো-উপরি গত দুই খন্দে ধান বেচে কতক টাকা পেয়েছিল, জমি কিনে বাকি সব গিয়েছে মামলার অন্দরে। তাতেও কুলোয়নি পুরোপুরি। ভাণ্ড-বাসন বেচতে হয়েছে, বেচতে হয়েছে আমিরনের বাউ-খাড়ু। হয়েছে কিছু হাওলাত-বরাত। তবু আমিরন জমি ধরতে দেয়নি। খবরদার, জমির গায়ে হাত দিতে পারবে না। জমি আমাদের নিটুট থাকবে। একেবারে নিষ্পাপ। বাঁধা-বেচা করতে পারবে না ওকে নিয়ে। ও আমাদের বুকের মাংস, কলজের রক্ত।

অনেক রকম লোয়াজিমা। হাঁপিয়ে উঠেছিল সোনামদ্দি। মহাফেজখানা থেকে নথি তলব করে আনতে হবে, তার তদবির চাই। সাক্ষীর বার-বরদারি লাগবে, অন্য পক্ষকে দিতে হবে মুলতুবি খরচ। সোনামদ্দির হাত খালি। আমিরন খোরাকির ধান বের করে দিল। বললে, বাঁধা মাইনের চাকর খেটে খাব দুজনে, তবু তোমাকে আমি জমি বেচতে দেব না। না, না, পত্তন রেহানও না, কিছু না, আমার লক্ষ্মীকে পরের হাতে সঁপে দেব না কিছুতেই।

খরচ যখন আর টানতে পারে না, ভাই-বন্ধুরা বলেছিল জলিল মুন্সির সঙ্গে আপোসরফা করে ফেল। আপোসের শর্ত আর কিছুই নয়, যে দামে কিনেছিলে কিছু নাহয় বেশি নিয়ে জমি বেচে দাও জলিল মুন্সিকে। কিছুটা গড়িমসি হয়ত করেছিল সোনামদ্দি, কিন্তু আমিরন হাঁকার দিয়ে উঠল : কিছুতেই না। ধর্মের কাছে ঠকি, বুকে ধরে জমি ওকে দিয়ে দেব স্বচ্ছন্দে। অধর্মের কাছে ঠকে জমি জিরাত খোয়াতে পারব না। ভিখ মেগে খেতে হয়, সাধু গৃহস্থের বাড়ি ভিখ মাগব, চোরের কাছে খয়রাত নেব না।

সেই কষ্টের জমি তাদের বজায় রয়েছে। বলবৎ রয়েছে ধর্ম। তার আবার ফির-যাচাই হবে আপিলের আদালতে। কিন্তু তার খরচ কই? খন্দ উঠতে এখনো ঢের দেরি আছে। আংটি-চুংটিও নেই আর আমিরনের কানে নাকে। হাঁড়ি-পাতিলের দাম কি!

ছুটা খতে আর ধার পাওয়া যায় না। জমি এবার বন্ধক রাখতে হবে। ভয়ে-ভয়ে বললে সোনামদ্দি।

কী করবে?

বন্ধক রাখব।

পাপ কথা মুখেও এনো না। বন্ধক উদ্ধার করবে কি করে?

খন্দ উঠলে ধান-পান বেচে শোধ করে দেব।

ওসব শোধবোধের ধার দিয়েও যাবে না মহাজন। সে শুধু ফন্দি দেখবে কি করে জমিতে ঢুকতে পারে। ওয়াশিল দিয়ে শুধু তামাদি বাঁচাবে। তাই যেই একবার খন্দ খারাপ হবে, ঝোপ বুঝে কোপ মেরে জমি দখল করে নেবে। তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের জমি তুমি পরাধীন করে দিও না।

ভাই-বন্ধুর সল্লা-পরামর্শ নিল সোনামদ্দি।

বউ বলে, ধর্মের দুয়ার ধরে বসে থাকো। এক আদালতের রায় যখন আমাদের দিকে হয়েছে তখন সব আদালতের রায়ই আমাদের দিকে হবে। বলে আপিলে আমাদের হাজির হবারই দরকার নেই। দেখি ধর্মের রায় কে ওলটায়!

মুরুব্বি-মাতব্বররা হেসে উঠল। ঠাট্টা করে উঠল। বলল, শুধু সদরে আপিল কি, দরকার হলে হাইকোর্ট করতে হবে। তার জন্যে তৈয়ার হও, মিয়া। কারবার-দরবারের কথায় বউকে ডেকো না।

সত্যিই তো। যদি সদরে সোনামদ্দি ঠকে যায় তবে চুপ করে সে-হার সে মেনে নেবে নাকি? শেষ চেষ্টা সে দেখবে না? কুটুমমহলে সে বলবে না বুক ফুলিয়ে হাইকোর্ট করেছিলাম?

আমিরন ঘরের বৌ, সে আইন বেআইনের জানে কী!

সে কিছু জানতে না পারলেই হল। জমির চাষদখল ঠিক থাকলেই সে নিশ্চিন্ত থাকবে।

কিন্তু বন্ধকী মহাজন কই আজকাল দেশ-গাঁয়ে। ঋণসালিশী আর মহাজনী আইন তাদেরকে কাবু করেছে। তবে যদি খাইখালাসী দাও, দেখতে পারি। তাতে সোনামদ্দি রাজী হতে পারে না। তা হলে তাকে জমির দখল ছেড়ে দিতে হয়। তা কি করে চলে? তা হলে যে আমিরন জেনে ফেলবে।

অগ্রিম পাট্টা নেবার লোক আছে। ওয়াদা করে নগদ খাজনায় লাগিয়ে এক থোকে বেবাক টাকা নিয়ে নাও আগাম। কায়েমী প্রজা নয়, ওয়াদা অন্তে

জমি আবার ফেরৎ পাবে। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের জন্যেও জমির উপর রায়ত বর্গাইত সইতে পারবে না আমিরন। , অশান্তি করবে। চোখের জলে নিবিয়ে ফেলবে আখার আগুন।

এখন শুধু সাফ-কবলার দিন। যদি বলো জমি বেচব, রায়তি স্বত্বের জমি, কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। ঢোল দিতে লাগবে না দেশ-বিদেশের লোক এসে হাজির হবে। কিন্তু জমিই যদি বেচে ফেলল তা হলে থাকল কি? আপিলও যদি সে পায়, সে কেবল রায়ই পাবে, জমি পাবে না।

এক উপায় শুধু আছে। রায়তি স্বত্ব বেচে ফেলে তার তলায় কোলরায়তি বন্দোবস্ত নেওয়া। জমিতে জমি রইল কাবেজের মধ্যে, শুধু স্বত্বের যা একটু বরখেলাপ হল। স্বত্বের কারিকুরি অতশত বুঝবে না আমিরন। আমল-দখল ঠিক থাকলেই সে খুশি। বছর-বছর খাজনা টানতে হবে বটে, তা জমির দোয়ায় আটকাবে না। জানতে দেওয়া হবে না আমিরনকে। সালিয়ানা খাজনা দিয়ে যেতে পারলে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না জমিতে। তাদের ভোগ-তছরুপ ঠিক থাকবে।

আশ্চর্য, সহজেই খদ্দের পাওয়া গেল। আপিলের আদালতে স্বত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগে কেউ কিনতে চাইবে না এই সবাই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু যুবনালি এল এগিয়ে। মোলায়েম ভাবে বললে, আমি নিতে রাজী আছি। জমি নিয়ে অমন ফটকা খেলি। যদি আপিলে সোনামদ্দি ঠকে, আমিও না হয় ঠকব। সরল কিস্তিতে শোধ করে দেয় দেবে, না দেয় তো মারা পড়ব না।

নগদ তিনশো টাকায় কিনল যুবনালি। দশ টাকা জমায় কোলরায়তি পত্তন নিল সোনামদ্দি। কবালা হল। কবুলতি হল। জমি রইল সোনামদ্দির চাষে।

আমিরন টুঁ শব্দটিও জানতে পেল না। দাওয়া ধান আগের মতই আঁটি বেঁধে এল তার উঠানে। ধান ঝাড়ল, ধান সারল নিজের হাতে। এবার আগের মতই ধান কাড়বে ঢেঁকিতে। পাড়ার গরিব চাষানীরা আসবে তার ধানের খিদমতে। এক সঙ্গে ধান-ভানার গান গাইবে তারা।

খবর এল, আপিলেও সোনামদ্দি জিতেছে।

আমিরন উছলে উঠল : এবার কী খাওয়াবে খাওয়াও। বাউ-খাড়ু গড়িয়ে দাও নতুন করে, গড়িয়ে দাও পাশি-মাকড়ি। এবার একখানা শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি কিনে আনো।

কিন্তু সোনামদ্দির মন খারাপ। বললে, অনেক তত্ত্বতাউত করেছি বলেই না জিততে পারলাম। সব চেয়ে বড় উকিল লাগিয়েছি। টানাটানি করে আপিল রেখেছে খোদ জজসাহেবের কামরাতে। বহুৎ টাকা খরচ হয়ে গেছে।

কোনো কথা আর গায়ে মাখে না আমিরন, দেখে না তলিয়ে। বললে, হোক খরচ, জমি তো আমাদের থাকল। লক্ষ্মী তো বাঁধা রইল ঘরের কানাচে। পাকাপোক্ত স্বত্বে কায়েম হলাম। যার জমি আছে তার ভাত আছে। যার ভাত নেই তার জাতও নেই।

কিন্তু সোনামদ্দি কী করে বলে তার সত্যিকারের হারের কথা? মামলায় সে নিচু হল না বটে, কিন্তু জমির স্বত্ব দিল নিচু করে। সব সময়ে ভাঙা-নদীর মুখে ছাড়া বাড়ির মত বসে থাকবে এখন থেকে। ফুকা, ঠুনকা স্বত্ব। দায়রহিতের একটা নুটিশ জারি হলেই ফাক্কিকার। এক সন খাজনা না দিলেই ডিক্রি, আর ডিক্রির টাকা তিরিশ দিনের মধ্যে না দিলেই উৎখাত।

কিন্তু তা না হলে টাকার সে জোটপাট করত কি করে? মোকদ্দমা চালাত কি করে? স্বত্ব সাব্যস্ত করত কি করে?

হুঁশিয়ার থাকবে সব সময়। যুবনালি দেবতার লোক, সে কখনও দিললাগি করবে না। অনেক জমি আছে তার, এ উনিশ গণ্ডার জন্য তার লোভ নেই। হয়তো বা কবালার পণ সুদ সমেত ফেরত পেলে সে স্বত্ব ফিরিয়ে দেবে, ফির-বিক্রি করবে। তা না দিক, ঘোর দুর্দিনে কিস্তি খেলাপ হলেও উচ্ছেদ করে দেবে না।

কিন্তু শুনতে পেল যুবনালি জলিল মুন্সির বেনামদার। কবলার টাকা যুবনালি দেয়নি, জলিল মুন্সি দিয়েছে। তার হিসাবের খাতায় ঐ তারিখে ঐ টাকা খরচ লেখা। কবলাও এখন তার হেপাজতে। শুধু তাই নয়, যুবনালি জলিল মুন্সির বরাবর মুক্তিপত্র করে দিয়েছে। মুক্তিপত্রে কবুল করেছে কবালার স্বত্ব জলিল মুন্সির।

ফল দাঁড়াল, জমিতে সোনামদ্দি কোর্ফা প্রজা, আর জলিল মুন্সি তার মুনিব। বছর-বছর তার দশ টাকা খাজনা। আমিরন শুনতে পেলে গাঙে ডুবে মরবে।

সোনামদ্দির শরীরে-মনে সুখ নেই। খেতে-মাখতে আহ্লাদ নেই। তামুকে-বিড়িতে ঝাঁজ নেই।

কেন, তোমার কী হয়েছে? মনের মধ্যে যেন কী ভার বেঁধে বেড়াচ্ছ।

রাগ-রঙ্গ করে আর কথা কও না আমার সঙ্গে!

জোর করে হাসল সোনামদ্দি। বললে, বা, বয়স বাড়ছে না দিন দিন?

সত্যি বলো তো, জমির কিছু করেছ?

বা, জমির কী করব? আমাদের যেমন জমি তেমনি আছে।

বেচা-বাঁধা নেই তো কোথাও?

বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি। জমি রইল আমাদের নিজ চাষে ধান আমরা গোলাজাত করেছি, আউশ বুনলাম এ বছর, জমি বেচা-বাঁধা হয়ে গেল?

না জমি যদি তোমার ঠিক থাকে আমি যদি তোমার ঠিক থাকি, তবে তোমার আর দুঃখ কী! তবে তুমি কেন মন ভার করে থাকো?

না গো বউ না, জমি ঠিক আছে। মানুষই আর ঠিক নেই।

এক কিস্তিও খাজনা খেলাপ করে না সোনামদ্দি, ঠিক জলিল মুন্সির তশিলদারকে পেঁাছে দিয়ে আসে। রসিদ নেয়। সালিয়ানা হলে দাখিলা আদায় করে। যাতে খাজনার বকেয়ায় না উচ্ছেদের আর্জি পড়ে তার নামে। আর উচ্ছেদের আর্জি পড়লেই বা কি, ডিক্রির তিরিশ দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে দিলেই খালাস। শুধু আমিরন না টের পায়।

জলিল মুন্সি সে পথে গেল না। নিজে খাজনা বাকি ফেলে নিজের রায়তিস্বত্ব নিলাম করালে। কেনালে চাচাত বোনাই দরবার মোল্লাকে দিয়ে। টাকা দিলে নিজে। নিলাম ইস্তাহার গোপন করলে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনামদ্দির উপর। দায রহিতের নুটিশ নিয়ে। সোনামদ্দির কোলরায়তি বিলোপ হয়ে গেল।

এবার সোনামদ্দির দখল জবর দখল বলে সাব্যস্ত হতে দেরি হল না। জলিল মুন্সি ঘব ভেঙে খাসদখলের ডিক্রি পেল একতরফা।

এল দখল জারির পরোয়ানা। ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে যাও হালট ধরে। পাঁচ দোরের কুকুর হয়ে।

এসব কী? আমিরন চোখে আগুনের হলকা নিয়ে তাকাল সোনামদ্দির দিকে।

তোকে ফতুর করে দিয়েছি আমিরন। জমির জন্য মামলা করলাম, মামলার জন্য জমি গেল। পথের থেকে নতুন করে আবার আমাদের আরম্ভ করতে হবে। সোনামদ্দির চোখ ছলছল করে উঠল।

রাস্তায় নেমে এল তারা মহবুবের হাত ধরে। বাড়ি-ঘর ভূমিসাৎ হয়ে

গেল চোখের সামনে। জমির দিকে তাকাল। মনে হল যেন গৃহহারার মত তাকিয়ে আছে।

কোথায় আর যায়! আতুর-এতিমের জন্যে কোথায় কোন মুসাফিরখানা! তাদের কে আশ্রয় দেবে?

জলিল মুন্সিই তাদেরকে আশ্রয় দিল। জমিতে সোনামদ্দি হালিয়া খাটবে আর বাড়িতে আমিরন দাসী-বাঁদি হবে।

উপায় কি। জমি যখন নেই তখন ভাত নেই। আর যার ভাত নেই তার জাত কোথায়!

আমিই তোকে পথের কাঙাল করলাম! বলে সোনামদ্দি।

আমার জন্যে তুমি ভাবো কেন? জমির জন্যে ভাবো। আমার চেয়েও জমির দাম অনেক বেশি।

বেশি দিন থাকতে হল না সে-বাড়ি। আমিরনকে জলিল মুন্সি নিকা করলে। মহল্লার মোল্লা এসে কলমা পড়াল।

সোনামদ্দি হতবুদ্ধির মত বললে বা, তালাক দিলাম কখন?

ঐ হয়েছে তোমার তালাক দেওয়া। ওর কাছে নিকা বসে জমি আবার ফিরিয়ে দিলাম তোমাকে। এই দেখ কবালা। আমিরন কবালা দেখাল।

জলিল মুন্সিকে দিয়ে ফির-বেচার কবালা করিয়ে নিয়েছে আমিরন। রেজেস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। রায়তি স্বত্ব আবার চলে এসেছে সোনামদ্দির দখলে। ঘর তুলে দিয়েছে নতুন করে।

আর তুই?

আমিই কবালার পণ। আমার জন্য মন খারাপ কোরো না। আমার চেয়ে তোমার জমির দাম অনেক বেশি। আমি গেলে কী হয়? কিন্তু জমি তো তোমার ফিরে এল। তোমার জমির গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারল না।

মহবুব?

যদি রাত্রে খুব কাঁদে, চুপি-চুপি দিয়ে আসব তোমার কাছে।

নুরবানু

কুরমান হাটে কাঁচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালি কিনবে না বেগুনি কিনবে চট করে ঠাহর করতে পারে না।

অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনত, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনত, তিতপুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাঁচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রং পছন্দ হয় না, রং মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাঁচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর-কবুলত নেই, বর্গায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ-বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভাল করে। যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড় দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটনিতে চলে না। নুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব-গিন্নির খেজমৎ করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভাল-মন্দ খেতে পায় মাঝে-মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব, উকিলদ্দি দফাদার, নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে!

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নূরবানু : মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।

কেন, কি করে?

খুক-খুক করে কাশে বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।

তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।

না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয় নি। একদিন নূরবানুর হাত চেপে ধরল।

সেদিনও কাঁদতে-কাঁদতে নূরবানু বললে, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময় খামচে দিয়েছে।

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠল কুরমানের। বললে, তুই সামনে গেছিলি কেন?

কে বললে? যাইনি তো সামনে।

সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কি করে?

আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে বীজ আছে ক-কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

তবু সেদিনও সে মারেনি নূরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য, গরিবের বউএর কি একটু ছুরতও থাকতে পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলাও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা-পুলিশ সব ওদের হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদেব হাঁটা-চলা। কাজ-কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাঁচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বিনুনি পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নূরবানু, কুরমানের মুখের চেহাবা দেখে ঝিম মেরে গেল।

এসব কোত্থেকে?

মুনিবগিন্নি দিয়েছে।

কিন্তু, জিগগেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পিছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাঁচের চুড়ি, কাল আংটি-চুংটি। নোনা জমি

এমনি করেই আস্তে-আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

খুলে ফ্যাল শিগগির। গর্জে উঠল কুরমান।

সাজবার ভারি সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টালমাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। পটপট করে ভেঙে গেল কতকগুলি। হেঁচকা টান মারল খোঁপায়। একটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠল।

ডুকরে কেঁদে উঠল নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনো দিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে। কিষানের বউ সে, ঠুঁটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কি।

কিন্তু এ কি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক-টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগল নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কি করে?

তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে? এদিকে তোমার একটা ভালো গামছা নেই, লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।

যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

তোর চুলবাঁধা দেখিনি কোনো দিন—

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুলবাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন-ঠুন।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি একবেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এল। ফলসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

এ শাড়ি এল কোত্থেকে? বর্শার মুখের মত চোখা হয়ে উঠল কুরমান।

আজ যে ঈদ, খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নি দিয়েছে শাড়িখানা।

ঈদের দিন হলেও নরম পড়ল না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিটে-ফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়ল না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘসা জিভ। ফাঁই-ফাঁই করে সে ছিঁড়ে ফেলল।

এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে? গা বেয়ে-বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপ-মারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতই এ শাড়িখানি। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনল নুরবানুকে। নিয়ে এল পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে-টিপে দুপুর বেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্যে পঞ্চম, গলার জন্য দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, কই গো বিবিজান। দেখ এসে কী এনেছি।

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপরে বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটা মাংসখেকো জানোয়ার।

চলে যান এখান থেকে। চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখ, জেওর এনেছি গড়িয়ে।

দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে সোর তুলব এখুনি।

কিন্তু সোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুসির ঝলকানি। কত না জানি ঠাট্টা-বটখেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রং-সং, আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কতো না-জানি যোগসাজসের সর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের। চার পাশে চেয়ে দেখল সে অসহায়ের মত। দেখল ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

এখানে কেন?

ধানাই-পানাই করতে লাগল উকিলদ্দি। শেষ কালে বললে, লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কি না দেখতে এসেছিলাম।

তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?

বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার। আমার যেখানে খুশি আমি যাব আসব।

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরল। লাগল ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর-জেল্লা নেই শরীরে, সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগাছটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল নুরবানু। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এল সে হন্ত-দন্ত হয়ে, শিকরে-পাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না, শুধু শুরু হয় লাটপাট।

কি চোখে দেখল ব্যাপারটা কে জানে, কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুটি ধরে : তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে? কেন পর-পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস? উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর, যেমনি এল এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়ল কুরমানের মাথায়। মনে হল নুরবানুই যেন লাঠি মারলে। মনে হল কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মত চেঁচিয়ে উঠল : এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন।

ব্যস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগত না। আঁধার দেখতে লাগল চারদিক। নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। ফকির-ফতুরের মত তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা মুখে হাসতে লাগল উকিলদ্দি।

লোক জমতে শুরু করল আস্তে-আস্তে।

কুরমান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বললে নুরবানুকে, ও কিছু হয়নি, তুই চলে যা ঘরের মধ্যে।

সত্যিই যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে নুরবানু চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউএর মত।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে-আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি সমাজ বরদাস্ত করতে পারবে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রী পর হয়ে যাবে? কুরমান কেঁদে উঠল।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

মুখের কথাটাই বড় হবে? মন দেখবে না কেউ?

মুখের জবানের দাম কি কম? রং-তামাসা করে বললেও তালাক তালাক।

আর এ তো জল-জীয়ন্ত রাগের কথা। গলা দরাজ করে দিনে-দুপুরে তালাক দেওয়া।

আর দস্তুরমত সাক্ষী রেখে। ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

এখন উপায়? নূরবানুকে আমি ফিরে পাব না?

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসল ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নূরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নূরবানুকে? আর কে! দাড়িতে হাত বুলতে-বুলতে উকিলদ্দি বললে, আমি বিয়ে করব।

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইমাম, মোল্লা-মুনসি, ইউনিঅন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মানী-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেল কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবে না আর নূরবানু। বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল নূরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নিচে।

তা ছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালির মধ্য দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে সে ধরে রাখতে পারল না।

সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে।

দাউলে হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নূরবানু ছাড়া তার আর ঘর-দুয়ার কি! ঘরের উইয়ে খাওয়া পাটখড়ির বেড়া ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাপ খোলে। কোথায় নূরবানু! চৈতী

মাঠের মত বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নূরবানু। যেন খুব একটা অন্যায় করেছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নূরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নূরবানু বলে, না। এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।

বলে, তোমাকে শুধু একটিবার দেখতে এলাম। বড় মন কেমন করে।

বড় কাহিল হয়ে গেছে নূরবানু। বড় মন মরা। গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা ওটা একটু আধটু গোছগাছ করে দেয় নূরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে।

তোকে কি আর ফিরে পাব নূরু?

নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায় উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেয়া।

আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এ'টে দেবে। বলবে দেব না তালাক।

ইস? নূরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল · দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?

না ছাড়লেই বা কি, ও স্পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়?

ইস্, করুক দেখি তো এমন বেইমানি। আবার ফোঁস করে ওঠে নূরবানু: বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।

নূরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

গা-টা তেতো-তেতো করছে, জ্বর হবে বোধ হয়।

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নূরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নূরবানুর ঘরের দরজায়। নূরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে।

বলে, কেন পাগলের মত ঘ্রে বেড়াচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।

কবে আসবি?

দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জ্মাবার কলমা পড়বে তার পরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে ব্কের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে? যেখানে এত প্যাঁচঘোঁচ নেই, যেখানে শ্ধ্ দেদার মাঠ আর দেদার আসমান।

শিগগির বাড়ি যাও। কুরমান চোর। কুরমান পরপ্র্ষ।

জ্মাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কই, শনিবার তো তালাক নিয়ে চলে এল না ন্রবান্।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের ম্ঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবে না ন্রবান্কে। গলা টিপে ধরলেও তার ম্খ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কার্র সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মত নয়, দেনদারের মত।

উকিলদ্দি বললে, আমার কোনো কস্র নেই। বিয়ে হয়েছে তব্ ন্রবান্ এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না। ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে?

যত সব ফাঁকিজ্কি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে ন্রবান্কে রেখে দেবে কবজার মধ্যে। রাখবে অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসাল। জানাল তার ফরিয়াদ।

ডাকো উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না ন্রবান্কে? কেন এজহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই যে এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকান্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকা-পোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছে ন্রবান্। ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না। শ্তে আসছে না দরজায় খিল দিয়ে। ও ভেবেছে কলমা পড়ার পরেই ব্ঝি ও তালাকের কাবিল হল। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিম্খ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাটন-ছিঁড়েন হতে পারে কি করে?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিলে। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি

সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না ন্রবান্র।•

উপায় নেই, হালাল হতে হবে ন্রবান্কে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষ্কের মত।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল ন্রবান্।

পর দিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই উকিলদ্দি ন্রবান্কে তালাক দিল।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, ন্রবান্ চলে এল কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হ্ঁকো ধরা, কিন্তু কলকেতে আগ্ন নেই। কখন যে নিবে গেছে তা কে জানে। চেয়ে আছে—শ্না মাঠের মত চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের। ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মত চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমন চোখে কুরমান তাকাল ন্রবান্র দিকে। তার চোখে গত রাতের স্র্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শ্কনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফ্র্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙের নতুন শাড়ি। পরলে-পরলে যেন খ্শির জলের স্রোত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা-মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ।

সে জলে আর স্নান করা যায় না।

ইদ্দত আমি এখানেই কাবার করব। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি। ন্রবান্ ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নেবা হ্ঁকোয় টান মারতে-মারতে কুরমান বললে, না। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।

দাঙ্গা

শিশেখাল। এপারে আদমপুর ওপারে ধুলেশ্বর। দুই গ্রাম। মাঝখানে অনেক আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল ছিল একটা। তার কাঠ আর লোহা দুই গ্রামের লোক চুরি করে নিয়েছে। এখন শুধু একটা দুই-বাঁশের সাঁকো। বাঁশের ধরুনি আছে উপর দিকে। হেলে বেঁকে।

কাঁকালে কলসী, চলেছে মমিনা। ত্যাড়াব্যাঁকা সাঁকোর উপর দিয়ে। ধরুনিটা না ধরেই। হাতে খোঁটা দড়ি, চলেছে জিন্নাতালি, তেমনি নড়বড়ে সাঁকোর উপর দিয়ে। তেমনি ধরুনি না ধরেই।

এপারে পুকুর. ওপারে গোবাট। গোরু আগেই হেঁটে পার হয়ে গেছে খাল, জলের থেকে নাকের তুলতুলে ডগাটা উঁচুতে তুলে ধরে। নদীর জল লোনা, পুকুরের জল ছাড়া খাওয়া যায় না। গোরুকে খোঁটায় বেঁধে না রাখলে কার খেতের ফসল কখন তছরুপ করে।

মমিনা আর জিন্নাত। ধুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর। দুজনে দেখা হল মুখোমুখি।

মমিনা বলে, পথ দাও।

জিন্নাত বলে, পিছু হাঁটো।

মমিনা বলে, সে মেয়ে, তার দাবি সকলের আগে। জিন্নাত বলে, তার দাবি মমিনার আগে, কেননা সে আগে এসে সাঁকো ধরেছে। পথ এগিয়ে এসেছে আদ্দেকেরও বেশি। এখন সে আর ফিরে যাবে না। এমন কোনোই নুটিশ টাঙানো নেই যে মেয়ে দেখলেই সাঁকোর থেকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

হ্যাঁ, দিতে হবে। আগুনে পর্যন্ত দিতে হবে। চোখ ঝিলকিয়ে বললে মমিনা। কলসীটা ঢলে পড়েছিল, কোমরের খাঁজের উপর তুলে চেপে ধরল আঁট করে। বাঁকা বাহুর বন্ধনীতে ফোটালে বা একটু নব-যৌবনের গরিমা।

আগে আগুনে ঝাঁপ দিই. পরে না হয় পানিতে দেব। জিন্নাতালি বললে।

পথ ছাড়ো বলছি। রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় এটা। ঝলসে উঠল মমিনা : যদি না ছাড়ো তো বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।

আমিও বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলতে পারি।

কি বলবে তুমি?

বলব মকবুল মুছল্লির মেয়ে মমিনা বলেছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

ওমা কখন বললাম!

ঘরে নয়, বলেছে আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।

দেবই তো একশোবার। নুড়ো জেবলে দেব।

তাই, বাজানদের বললে লাভ হবে না দাঙ্গা বেধে যাবে দুই বাপে। আমার মুখে জবলুক নুড়ো, ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাও মমিনা।

মমিনা চোখ নামাল। বললে, হাসির গল্প নেই, তবু হাসি কি করে? শুধু শুধু কারু ফরমায়েসে হাসা যায়?

চাঁদ কি কারুর ফরমায়েসে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল রুপুলি চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল জিন্নাত। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী ভেঙেছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম গফুরালি। সে বলে, আমাব ভাঙা জমি আবার ভেসে উঠেছে। শিকল জরিপ করে জমি ভাঁউরে নিলেই বোঝা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যা কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির লগ্ন, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্ক-বিতর্ক। মন কষাকষি। শত্রুতালি। পক্ষাপক্ষি।

দুপক্ষের জমিদার দুপক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দিয়ে মামলা বসিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছনে থেকে উস্কে দেয় ঘন ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়জোড় লাগে, অনেক কাঠখড়। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া, এই নিয়ে সল্লা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনঝাউ।

একদিকে আদমপুর, অন্যদিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। দেওয়ানি আদালতের ফেরফার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাজা-লাঠির তদারক করে। আমি হামি হব, বলে গফুরালি। মকবুল বলে, আমি হামি হব। লাঠিতে তেল মাখায়, ল্যাজার মুখে শান পড়ে। শুরু হয় বুঝি হামলা-হামলি।

পলিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উঁড়ি ধান। সমর্থ হয়ে উঠেছে আবাদের জন্যে। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দুদিকে। গাজী-গাজী। ঢাল-সড়কি, বর্শা-বল্লম ল্যাজালাঠি কোঁচা-টাঙ্গি দা-কুড়ুল দুদিকেই ঝকমকিয়ে উঠল। চরের দখল নিয়ে বাধে বুঝি হাঙ্গামা।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি, ধুলেশ্বরের মোড়ল মকবুল। দুজনেরই হাল-হালুটি বিস্তর পাকা ভিতের উপর টিনের ঘর অনেকগুলি। তাঁবেদার লোক-লস্করের অভাব নেই। মোড়লে-মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে-দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

অকু হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি দাঙ্গা ফ্যাসাদ। হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিশে এত্তেলা দেবে না কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও রাজী। বুকের মাংসের চেয়ে দামি যে জমি, সেই জমির চেয়ে মান বড়। স্বত্বের চেয়েও বড় হচ্ছে দখল।

উলু মাঠ ভেঙে চাষ শুরু করে দিল জিন্নাত। লাঙল দিলেই খড় ভেঙে-ভেঙে যায়। মাটি ফেটে-ফেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-তিয়ারে দরকার নাই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে-দলে। পাখা-মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মতো।

গফুরালি হুকুম দিল, কোট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। দখল যখন নিয়েছি একবার ,বেদখল হতে পারব না। ও হটে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আমাদের গায়ের বস্ত্রের মতো জমি কামড়ে পড়ে থাকব।

উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ-করা শানানো লৌহমুখ, উড়ল অনেক ধুলো মাটি ফিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেওয়ার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে। হেরে গেল গফুরালির

দল। ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চম্পট দিল খাল-নালা সাঁতরে। কিন্তু জিন্নাতালি ফিরল না।

জিন্নাতালি আটক পড়েছে শত্রুর কব্জার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা করতে চাও তো করোগে, কিন্তু তার আগেই গুম হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুছল্লির। দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল করতে দাও বারো বচ্ছর। রাজী হও তো ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো কচু কাটা করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে পায়ে কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লকড়ি-ঘরে। শুকনো হোগলার উপর।

রাত গহিন ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোছা-মোছা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিন্নাতের। তার জ্বরো কপালের উপর কার মিঠে হাতের ছোঁয়া।

কে?

আমি গো আমি। মমিনা।

স্বরের মিঠানিতে জ্বর জুড়িয়ে গেল গায়ের। যেন স্বপন দেখছে, স্বপন শুনছে জিন্নাত।

জখম হয়েছে তোমার?

লাঠি লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের উপর। ব্যাথায় ছিঁড়ে পড়ছে দুহাত। বেতাগী ল্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারে নি বুকের মধ্যে।

এইখানেই লেগেছে? হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে বাহুর উপর।

এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।

সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা, ব্যথা-বেদনা যেন সব উবে গিয়েছে এক পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু। দড়ির গিঁট খুলে দিতে লাগল মমিনা।

এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে?

হ্যাঁ, ছোট-ছোট আঙুলে বিন্দু-বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে-ঢেলে মমিনা বললে, এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্টে। প্রথম রাতে

সর্দার-চাঁইরা হল্লা-ফুর্তি করেছে। জবর দখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিপক্ষদের। তার উপরে কয়েদ করেছে ও দলের সাজোয়ানের ছেলে। কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি।

এ-কি, ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে? জানতে পারলে তোমার কি সর্বনাশ হবে জানো?

জানতে পারবে না।

পারবে না মানে?

মানে জানতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না আমার।

তা কি করে বলছ?

বলছি আমি ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।

তুমি?

হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব।

চলে যাবে? কোথায়?

বল্লভপুরের কাজীর কাছে। জানো তো, কাজি কুরমান মোল্লা আমার খালু। নদীর দুবাঁক পরেই বল্লভপুর।

সেখানে কি?

সেখানে গিয়ে কাজির দরবারে কাবিননামা রেজেস্ট্রি করব; তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে। তুমি দুলহা আর আমি দুলহিন। কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।

গায়ের রক্ত শিরশির করে উঠল জিন্নাতের। বললে, তোমার বাপ-চাচা রাজী হবে?

না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে। আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছি আমি। তা আমি সাবিদ করতে পারব। আমাদের বিয়ে তুড়তে পারবে না কেউ।

বিয়ে হবে আমাদের? ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপন দেখছে জিন্নাত?

হ্যাঁ, তোমার খেদমতে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া বিবাদ মিটে যাবে দু পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলেছে আমার, আর তোমার বাজান বলেছে তার, সে চর তারা দুয়ে মিলে আমাদের দুজনকে দিয়ে দেবে। নাইয়র যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু গ্রামে ফিরে আসবে মিল-মহব্বত।

তা ছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকাল দু-দল কেবল মারামারি করবে? আমার মনের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি!

কি করে যাবে মমিনা? জিন্নাত উঠে বসল।

ঘাটে ডোঙা আছে মাছ ধরার। তাতে করে পালাব। কালো চোখে আলো জ্বলল মমিনার।

আমার হাত যে ভাঙা। নৌকো বাইবে কে?

আমি দাঁড় টানব। তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না?

পারব।

তবে চলো। নদীর নাম আঁধার মানিক। আঁধার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।

দুজনেই গ্রস্ত হালকা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নিচে নৌকা বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

হাল-দাঁড কই? জিগগেস করল জিন্নাত।

ও! বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা সোটা হয়েছে দাঙ্গার উরদিশে। বললে, তুমি একটু বোসো। উঠোনে মুলি-বাঁশ আছে, তাই দুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব দুজনে। তুমি যদি না পার আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে। মমিনা ফিরে গেল।

এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের, আক্রোশ-আক্রমণের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়-দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, চোট-জখম, এত রক্তপাত—সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এমনিভাবে ভুলে যেতে হবে হার-মার, ঘায়ে মলম লাগাতে হবে মোলাম করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা?

কিন্তু উপায় কি। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি এ যে মমিনা। নদীর নামে তারও নাম। সে যে আঁধারমানিক।

ছোট দেখে দুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে জিন্নাত নেই, ডোঙাও নেই। দু হাতে জল কেটে-কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ঐ দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদা ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধারমানিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিন্নাতের দু হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে?

তিরশ্চী

সকলের মুখের উপর সটান বলে বসলুম : বিয়ে যখন আমিই করছি, মেয়েও আমিই দেখতে যাব। তোমরা সব পছন্দ করে এলে পরে আমি গিয়ে হয়কে নয় করে দিয়ে এলুম—সেটা কোনো কাজের কথা নয়। মাথার দিকে হোক, ল্যাজের দিকে হোক, পাঁঠাটা যখন আমার, আমাকেই কাটতে দাও। যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

প্রস্তাবটায় কেউ আপত্তি করলে না। তার প্রধান কারণ আমি চাকরি করছি, আর সেটা বেশ মোটা চাকরি।

বাবা দিন ও সময় দেখে দিলেন, আমার মামাতো ভাই রাধেশ আমার সঙ্গে চলল।

বলা বহুলতরো হবে, সেদিনের সাজগোজের ঘটাটা আমার পক্ষে একটু প্রশস্তই হয়ে পড়েছিল। ইদানীং বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল বলে আমি আমার কোঁচার ঝুলটা পঞ্চাশ-ইঞ্চিতে নামিয়ে এনেছিলুম কিন্তু সেদিন যেন পঞ্চাশ ইঞ্চিতেও আমার পায়ের পাতা ঢাকা পড়ছিল না। চাকরকে বিশ্বাস নেই, জুতোয় নিজেই বুরুশ করতে বসলুম। এবং রাধেশ যখন আমাকে তাড়া দিতে এল, দেখলুম মুখটা নির্মূলে নির্মল করে এক মুঠো কিউটিকুরা ঘষে আমি তার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারি নি।

ব্যাপারটা নির্জলা ব্যবসাদারি, তবু মনে নতুন একটা নেশার আবেশ আসছিল। বলতে গেলে, বইয়ের থেকে মুখ তুলে সেই আমার প্রথম বাইরের দিকে তাকানো। শরীরে মনে এত সচেতন হয়ে জীবনে এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিয়ে করব এই ঘটনাটার মধ্যে তত চমক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে একবার একটি 'হাঁ' বললেই এত বড়ো পৃথিবীর কে-একটি অপরিচিতা মেয়ে এক নিমেষে আমার একান্ত হয়ে উঠবে—এটাই নিদারুণ চমৎকার লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি নিয়ে আসতে পারি, কারুর কিছু বলবার নেই, বাধা দেবার নেই। অহরহই তো আমরা 'না' বলছি কিন্তু সাহস করে একবার 'হাঁ' বলতে পারলেই সে আমার।

গ্রহ-নক্ষত্রদের চক্রান্তে অন্ধ, অভিভূত হয়ে রাধেশের সঙ্গে কালীঘাটের ট্র্যাম ধরলুম।

ভাগ্যিস রাধেশ গোড়াতেই আমাকে কন্যাপক্ষীয়দের কাছে চিহ্নিত করে দিয়েছিল, নইলে তার সাজগোজের যে বহর তাকেই তাঁরা পাত্র বলে মনে করতেন, অন্তত মনে করতে পারলে সুখী যে হতেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুরুষের শোভাই নাকি তার চাকরি সেই ভরসায় রাধেশের ভ্রাতৃভক্তিকে ভূয়সী স্তুতি করতে-করতে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দোতলায় উঠে এলুম।

যবনিকা কখন উঠে গেছে, রঙ্গমঞ্চে আমাদের আবির্ভাব হল। প্রকাণ্ড ঘরটা যেন রুদ্ধশ্বাস নিঃশব্দতায় পাথর হয়ে আছে। মেঝের উপর ঢালা ফরাস, তারই মাঝখানে ছোট একটি চেয়ার। টিপয়ের উপর কড়া ইস্ত্রির ফর্সা একটি ঢাকনি : একপাশে দোয়াত-দানিতে কালি-কলম, অন্যদিকে স্তূপীকৃত কতক-গুলো বই। ওধারে লম্বাটে একটা খালি টেবিলের দুধারে যে অবস্থায় মুখোমুখি কখানা চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মনে হল, ওখানে উঠে গিয়েই আমাদের মিষ্টিমুখ করবার অবশ্যকর্তব্যটা পালন করতে হবে। মনে হল, রিহার্স্যাল দিয়ে-দিয়ে ভদ্রলোকদের পার্টগুলি আগাগোড়া মুখস্থ।

টিপয়টার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে দুজন বসলুম।

অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শকের, সত্যি করে বলা যাক, দর্শিকার অভাব দেখলুম না। জানলার আনাচে-কানাচে মেয়েদের চোখের ও আঙুলের সঙ্কেত-গুলি রাধেশের প্রতি এমন অজস্র ও অবারিত হয়ে উঠতে লাগল যে হাতে নেহাত চাকরিটা না থাকলে তাকে জায়গা ছেড়ে সটান বাড়ি চলে যেতুম। রাধেশ যে বছর দুয়েক ধরে বি-এ পরীক্ষায় খাবি খাচ্ছে সেইটেই আমার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাঁচোয়া।

হ্যাঁ, মেয়েটি তো এখন এসে গেলেই পারে। ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি।

চক্ষু থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়টাই এখন দ্রুত ও তীক্ষ্ণ কাজ করছে। অস্পষ্ট করে অনুভব করলুম পাশের ঘরেই মেয়ে সাজানো হচ্ছে—বিস্তৃত শাড়ির খশখশ ও চুড়ির টুকরো-টুকরো টুং-টাং আমার মনে নতুন বৃষ্টির শব্দের মতো বিবশ একটা তন্দ্রার কুয়াশা এনে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে অনেকগুলো চাপা কণ্ঠের অনুনয় ও তারো অনুচ্চারিত গভীরে কার যেন রঙিন খানিকটা লজ্জা। সেই লজ্জা গায়ের উপর স্পর্শের মতো স্পষ্ট টের পেলুম।

রাধেশের কনুইয়ের উপর অলক্ষ্যে একটা চিমটি কাটতে হল।

কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে রাধেশ বললে—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে নটা পর্যন্ত ভালো সময়।

তাড়া খেয়ে ভদ্রলোকদের একজন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ফিরতে তাঁর দেরি হল না; বললেন : এই আসছে।

এবং নতুন করে প্রস্তুত হবার আগেই মেয়েটি ঢুকে পড়ল। ঠিক এল বলতে পারি না, যেন উদয় হল। অনেকক্ষণ বসে থাকার জন্যে ভঙ্গিটা শিথিল, ক্লান্ত হয়ে এসেছিল, তাকে যথেষ্ট রকম ভদ্র করে তোলবার পর্যন্ত সময় পেলুম না। সবিস্ময়ে রাধেশের মুখের দিকে তাকালুম।

দেখলুম রাধেশের মুখ প্রসন্নতায় বিশেষ কোমল হয়ে আসে নি। তা না আসুক, আমি কিন্তু এক বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হলুম। আর যাই হোক, মেয়েটি রাধেশের যোগ্য নয়। আর যাই থাক বা না-থাক মেয়েটির বয়েস আছে।

টিপয়ের সামনের চেয়ারটা একেবারে লক্ষ্যই না করে মেয়েটি ফরাসের এক-কোণে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। তার আসা ও বসার এই ত্বরাটা একটা দেখবার জিনিস। তার শরীরে লজ্জার এতটুকু একটা দুর্বল আঁচড় কোথাও দেখলুম না। প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, চঞ্চল সেই শরীর একপাত নিষ্ঠুর ইস্পাতের মতো ঝকঝক করছে। কোনো কিছুকেই যেন সে আমলে আনছে না, সব কিছুর উপরেই সে সমান উদাসীন।

বৃথাই এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে তার সাজগোজের শব্দ শুনছিলুম, আমার জীবনের আজকের ভোরবেলাটির মতোই মেয়েটি একান্ত পরিচ্ছন্ন, বোধহয় বা বিষাদে একটু ধূসর। পরনে আটপৌরে একখানি শাড়ি, খাটো আঁচলে দুই কাঁধ ঢাকা, হাতে দু-এক টুকরো ঘরোয়া গয়না, কালকের রাতের শুকনো খোঁপাটা ঘাড়ের উপর এখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই তো তাকে দেখবার। এড়িয়ে এসেছে সে সব আয়োজন, ঠেলে ফেলে দিয়েছে সব উপকরণের বোঝা : সে যা, তাই সে হতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু কেন এই ঔদাস্য? মনে-মনে হাসলুম। আমি ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে তার এই বিষাদের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর তাকে লোলুপদৃষ্টি পুরুষের সামনে রূপের পরীক্ষা দিতে এসে ক্লান্ত, বিরক্ত, কলুষিত হতে হয় না।

গায়ের রঙটা যে রাধেশের পছন্দ হয় নি তা প্রথমেই তার মুখ দেখে অনুমান করেছিলুম। বিনয় করে লাভ নেই, মেয়েটি দস্তুরমতো কালো। চামড়ার

তারতম্য-বিচারের বেলায় এমন রঙকে আমরা সাধারণত কালোই বলে থাকি। শুদ্ধ ভাষায় শ্যামবর্ণ বলতে পারো বটে, কিন্তু টুইডলডাম ও টুইডলডিতে কোনো তফাত নেই।

ভদ্রলোকের পার্ট সব মুখস্থ। একজন অযাচিত বলে বসলেন : এমনিতে গায়ের রঙ ওর বেশ ফর্সা, কিন্তু পুরীতে চেঞ্জে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে-করে এমনি কালো হয়ে এসেছে।

কিন্তু, মনে-মনে ভাবলুম, এর জন্যে এত জবাবদিহি কেন? মেয়েরা যেমন শুধু আমাদের অর্থোপার্জনের দৌড় দেখছে, তাদের বেলায় আমরাও কি তেমনি শুধু তাদের চামড়ার বুনট দেখব?

ভদ্রলোকের একজন আমাকে অনুরোধ করলেন : কিছু জিগগেস করুন না।

একেবারে অথই জলে পড়লুম। এমন একখানা ভাব করলুম যেন আমাকেই যদি আলাপ করতে হয় তবে ঘরে রাজ্যের এত লোক কেন?

ভদ্রলোকদের আরেকজন টিপয় থেকে একটা বই তুলে বললেন—কিছু পড়ে শোনাবে?

আমার কিছু বলবার আগেই রাধেশ এগিয়ে এল : না। ফার্স্ট ডিভিশনে যে ম্যাট্রিক পাশ কবেছে তাকে পড়াশুনার বিষয় কিছু প্রশ্ন করাটাই অবান্তর হবে। চেয়ারের মধ্যে রাধেশ উশখুশ করে উঠল, গলাটা খাঁখরে মেয়েটিকে জিগগেস করলে : তোমার নাম কি?

কী আশ্চর্য প্রশ্ন! ম্যাট্রিক পাশের খবর পেয়েও তার নামটা কিনা সে জেনে রাখে নি।

দেয়ালের দিকে মুখ করে মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় বললে,—সুমিতা ঘোষ।

মনের মধ্যে যুগপৎ দুটো ভাব খেলে গেল। প্রথমত, দিন কয়েক পরে নাম বলতে গিয়ে দেখবে তার ঘোষ কখন আমারই মিত্র হয়ে উঠেছে—দেহ-মনে এমন কি নামে পর্যন্ত তার সে কী অদ্ভুত পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, রাধেশের এই ইয়ার্কি আমি বার করব। তার মাস্টারের এই সম্মানিত, উদ্ধত ভঙ্গিটা যদি সুমিতার পায়ের কাছে প্রণামে না নরম করে আনতে পারি তো কী বলেছি!

আলাপের দরজা খোলা পেয়ে রাধেশের সাহস যেন আরো বেড়ে গেল। বললে,—খবরের কাগজ পড়ো?

সুমিতা চোখ নামিয়ে গম্ভীর গলায় বললে—মাঝে-মাঝে।

তবু রাধেশের নির্লজ্জতার সীমা নেই। জিগগেস করলে : বাঙলা গভর্নমেন্টের চিফ সেক্রেটারির নাম বলতে পারো?

ভুরু দুটি কুটিল করে সুমিতা বললে,—না।

—উনিশ শো বাইশে গয়ায় যে কংগ্রেস হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট কে ছিল?

সুমিতা স্পষ্ট বললে,—জানি না।

রাধেশের তবু কী নিদারুণ আস্পর্ধা! জিগগেস করলে : আন্নামালায়ে যে একটা নতুন ইউনিভার্সিটি হয়েছে তার খবর রাখো? জায়গাটা কোথায়?

সুমিতা বললে,—কী করে বলব?

রাধেশ যেন তার দু-বছরের পরীক্ষা-পাশের অক্ষমতার শোধ নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেখানে বসে তার কান মলে দেয়া সম্ভব ছিল না, গোপনে আরেকটা চিমটি কেটে তাকে নিরস্ত করলুম।

সত্যিকারের দেখাটা মানুষের সুদীর্ঘ উপস্থিতিতে নয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবে ও অন্তর্ধানে। সুমিতাকে তাই লক্ষ্য করে বললুম,—এবার তুমি যেতে পারো।

যা ভেবেছিলুম তাই, তার সেই শরীরের নির্ঝরিণীতে ভঙ্গুর বিশীর্ণ কটি রেখা মুক্তির চঞ্চলতায় ঝিকমিক করে উঠল। বসার থেকে তার সেই হঠাৎ দাঁড়ানোর মাঝে গতির যে তীক্ষ্ণ একটা দ্যুতি ছিল তা নিমেষে আমার দুচোখকে যেন পিপাসিত করে তুললে। সুমিতা আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না, যেন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, এমনি তাড়াতাড়ি পিঠের সংক্ষিপ্ত আঁচলটা মুক্তিতে আলুলায়িত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিক চলে গেল বলতে পারি না, যেন গেল নিবে, গেল হারিয়ে।

মনে মনে হাসলুম। দিন কয়েক নেহাত আগে হয়ে পড়ে, নইলে ঐ তার পাখির পাখার মতো মুক্তিতে বিস্ফারিত উড়ন্ত আঁচলটা মুঠিতে চেপে ধরে অনায়াসে তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতুম, কিংবা আমিও যেতে পারতুম তার পিছু-পিছু। আজ যে এত বিমুখ, সে-ই একদিন অবারিত, অজস্র হয়ে উঠবে ভাবতেও কেমন একটা মজা লাগছে। যে আজ পালাতে পারলে বাঁচে, সে-ই একদিন আমার কণ্ঠতট থেকে তার বাহুর ঢেউ দুটিকে শিথিল করতে চাইবে না।

আমি যেন ঠিক তাকে চলে যেতে বললুম না তাড়িয়ে দিলুম—ভদ্রলোকের দল চিন্তিত হয়ে উঠলেন। একজন বললেন—অন্তত গানটা ওর শুনতেন। স্কুলে ও উপাধি পেয়েছে গীতোর্মিমালিনী।

আরেকজন বললেন—এই দেখুন ওর সব সেলাই। স্কার্ফ, মাফলার, টেপেস্ট্রি—যা চান।

আরেকজন যোগ করে দিলেন : অন্তত ওর হাতের লেখার নমুনাটা একবার—

রুমাল দিয়ে ঘাড়টা সবলে রগড়াতে-রগড়াতে বললুম,—কোনো দরকার নেই। এমনিতেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

রাধেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চেয়ে তার পিঠে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেও যেন সে বেশি আরাম পেত।

পুরাঙ্গনারা, যারা এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, সমমুহূর্তে সবাই কলধ্বনিত হয়ে উঠল। তার মাঝে স্পষ্ট অনুভব করলুম একজনের সুন্দর স্তব্ধতা।

তারপর শুরু হল ভোজনের বিরাট রাজসূয়। এত বড়ো একটা ভোজের চেহারা দেখেও রাধেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না।

আমি যে কী ভীষণ উজবুক ও আনাড়ি. বাড়িতে ফিরে রাধেশ সেইটেই সাব্যস্ত করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। এক কথায় মেয়ে পছন্দ করে এলুম, অথচ খোঁপা খুলে না দেখলুম তার চুলের দীর্ঘতা, না বা দেখলুম হাঁটিয়ে তার লীলা-চাপল্য। সামান্য একটা হাতের লেখা পর্যন্ত তার নিয়ে আসি নি।

—তারপর. রাধেশ মুখ টিপে হাসতে লাগল : এমন তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিলে যে মেয়েটার চোখ দুটো পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পেলুম না। দেখবার মধ্যে দেখলুম শুধু একখানা গায়ের রঙ।

বাড়ির মহিলারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : কী রকম? আমাদের মিনির মতো হবে?

রাধেশের একবিন্দু মায়া-দয়া নেই, অভদ্র, রূঢ় গলায় বললে,—য়্যাপলোজেটিক্যালিও নয়।—আমাদের মিনি তো তার তুলনায় দেবী।

আমার রুচিকে কেউ প্রশংসা করতে পারল না। বাড়ির মহিলারা, যাঁরা তাঁদের যৌবদশায় এমনি বহুতর পরীক্ষার ব্যূহ ভেদ করে অবশেষে আমাদের বাড়িতে এসে বহাল হয়েছেন, টিপ্পনী কাটতে লাগলেন : এমন মেয়ে-কাঙাল পুরুষ তো কখনো দেখি নি বাপু। এমন কী দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে খাদ্যাখাদ্যের আর বাছবিচার করতে হবে না। সাধে কি আর পাত্রকে গিয়ে নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে দেয়া হয় না? ডবকা বয়সের একটা যেমন-তেমন মেয়ে দেখলেই কি এমনিধারা রাশ ছেড়ে দিতে হয় গা?

প্রশ্রয় পেয়ে রাধেশ তার রসনাকে আরো খানিকটা আলগা করে দিল : মা হয়তো বা কোনোরকমে পার হলেন, কিন্তু তাঁর মেয়েদের আর গতি হচ্ছে না, এ আমি তোমাদের আগে থাকতে বলে রাখছি।

সে অপরিচিতা মেয়েটির হয়ে শুধু আমি একা লড়াই করতে লাগলুম। তাকে পছন্দ না করে যে আর কী করতে পারি কিছুই আমি ভেবে পেলুম না। আমার চোখ না থাক, অন্তত চক্ষুলজ্জা তো আছে।

মা প্রবল প্রতিবাদ শুরু করলেন : কালো বলেই ওরা অতো টাকা দিতে চায়। কিন্তু তোর টাকার কী ভাবনা? আমি তোর জন্যে টুকটুকে বৌ এনে দেব।

হেসে বললুম,—টাকা অবিশ্যি আমি ছেড়ে দেব, মা, কিন্তু মেয়েটিকে ছাড়তে পারব না। তাকে যখন আমি দেখতে গেছলুম, তখন তাকে বিয়ে করব বলেই দেখতে গেছলুম। একটি মেয়েকে তেমন আত্মীয়তার চোখে একবার দেখে তাকে আমি কিছুতেই আর ফেরাতে পারব না। তোমরা তাকে পরীক্ষা কবতে পারো, কিন্তু আমার শুধু পছন্দ করবার কথা।

এই যে আমার কী এক অন্যায় খেয়াল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান হয়ে উঠল। কিন্তু বাবা আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন : ওর যখন ওখানেই মত হয়েছে, তখন ওখানেই ওর বিয়ে হবে।

তোমরা ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা নেই সুমিতাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কথাটা একটু হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু ভালো লাগার একটা বিশেষ অবস্থার নামই কি ভালোবাসা নয়? তাকে এত ভালো লেগেছে যে তার সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এইটেই কি আমার ভালোবাসার প্রমাণ নয়?

সুমিতা কালো এবং তারি জন্যে সমস্ত সংসার প্রতিকূলতা করছে, মনে হল, এ-ব্যাপারে সেইটেই আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ। সুমিতাকে যে আমি এই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারব সেইটেই আমার পুরুষত্ব।

বাবা দিন-ক্ষণ ঠিক করে ওদের চিঠি লিখে দিলেন।

পাশাপাশি সে কটা দিন-রাত্রি আমার একটানা একটা তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। কে কোথাকার একটি অচেনা মেয়ে পৃথিবীর অগণন জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারি বিস্ময়ের রহস্যে মুহূর্ত-গুলি আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তার জীবনের এতগুলি দিন শুধু আমারই

জীবনের একটি দিনকে লক্ষ্য করে তার শরীরে-মনে স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরীতে যখন সে সমুদ্রে ডুব দিত, তখনো সে ভাবে নি তীরে তার জন্যে কে বসে আছে। ঘটনাটা এমন নতুন, এমন অপ্রত্যাশিত যে কল্পনায় অসুস্থ হয়ে উঠতে লাগলুম। কাজের আবর্তে মনকে যতোই ফেনিল করে তুলতে চাইলুম, ততোই যেন অবসাদের আর কূল খুঁজে পেলুম না।

হয়তো সুমিতারো মনে এমনি দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে। বাইরে থেকে কে কোথাকার এক অহঙ্কারী পুরুষ নিমেষে তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠবে এর বিস্ময় তাকেও করেছে মুহ্যমান। হয়তো সেদিনের পর থেকে তার চোখের দীর্ঘ দুই পল্লবে কপোলের উপর ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জার শীতল একটু ছায়া পড়ছে, হয়তো আয়নাতে চুল বাঁধবার সময় তার শুভ্র সীমন্তরেখাটির দিকে চেয়ে সে একটি নিশ্বাস ফেলছে, হয়তো আমারি মতো রাতের অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারছে না।

বলা বাহুল্য, নইলে এ কাহিনী লেখার কোনো দরকার হত না, সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠে নি।

কেন ওঠে নি, সেইটেই এখন বলতে হবে।

বাবা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মেয়েকে পাকা দেখতে বেরোবেন, সকালবেলার ডাক এসে হাজির। আমারই নামে খামে মোটা একটা চিঠি। মোড়কটা ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেলে নিচে নাম দেখলুম : সুমিতা।

বলতে বাধা নেই, সেই মুহূর্তটা আনন্দে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলুম। বিয়ের আগে এমন একখানি চিঠি যেন বিধাতার আশীর্বাদ।

তারপরে লুকিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে গেলুম চিঠিটা পড়তে। মেয়ের চিঠি, তাই চিঠিটা একটু বিস্তারিত। সুমিতা লিখছে :

মান্যবরেষু,

আপনাকে চিঠি লিখছি দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন, কিন্তু চিঠি না লেখা ছাড়া সত্যি আর আমার কোনো উপায় নেই। রূঢ়তা মার্জনা করবেন এই আশা করেই চিঠি লিখছি।

আপনি যে আমাকে পছন্দ করবেন, কেউই যে আমাকে এইভাবে পছন্দ করতে পারে, একথা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারি নি। আপনার আগে আরো অনেকের কাছে আমাকে রূপের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, কিন্তু সব জায়গাতেই আমি সসম্মানে ফেল করে বেঁচে গিয়েছিলুম। শুধু আপনিই আমাকে এই অভাবনীয় বিপদে ফেললেন। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভয়াবহ একটা টাকা পর্যন্ত দাবি করলেন না। সব দিক থেকেই আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এর আগে আর কাউকে চিঠি লেখার আমার দরকার হয় নি, একমাত্র আপনাকে লিখতে হল। জানি আপনি মহানুভব, তাই আমি এত সাহস দেখাতে সাহস পেলুম।

আপনি আমাকে মুক্তি দিন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। বিয়ে করে নয়, বিয়ে না করে। পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করে-করে আমি ক্লান্ত, প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছি—কী যে আমি করতে পারি, কোনোদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। জানি এই ক্ষেত্রে আপনিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারেন, তাই কোনোদিকে না চেয়ে শেষকালে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি।

কেন বিয়ে করতে চাই না, তার একটা স্থূল, স্পর্শসহ কারণ না পেলে আপনি আশ্বস্ত হবেন না জানি। সে কারণ আপনাকে জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই।

আমি একজনকে ভালোবাসি—কথাটা মাত্র লিখে আমি তার গভীরতা বোঝাতে পারব না। তার জন্যে আমাকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যতোদিন না সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, ততোদিন, তারি জন্যে, আমাকে নানা কৌশল করে এই সব ষড়যন্ত্র পার হতে হচ্ছে। রূপের পরীক্ষার চাইতেও সে কী কঠিনতর সাধনা।

আশা করি, আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছে আমি সহানুভূতি না পেলেও করুণা পাব। আমার এই অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জনা করুন। একজন বন্দিনী বাঙালী মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমের পরমায়ু ভিক্ষা করছে।

তবু এততেও যদি আপনি নিরস্ত না হন তো আমার পরিণাম যে কী হবে আমি ভাবতে পারছি না। ইতি।

বিনীতা
সুমিতা

চিঠি পড়ে প্রথম কিন্তু মনে হল সুমিতার হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর লাইন কটি সোজা ও পাশাপাশি দুটো লাইনের অন্তরালগুলি সমান। বানান-গুলি নির্ভুল, এবং দস্তুরমতো কমা, দাঁড়ি ও প্যারাগ্রাফ বজায় রেখে চিঠি লেখে। তার উপর শ্রদ্ধা আমার চতুর্গুণ বেড়ে গেল এবং যে-পাত্রী আমি মনোনীত করেছি সে যে নেহাত একটা যা-তা মেয়ে নয়, সে-কথাটা বাড়ির মহিলাদের কাছে সদ্য-সদ্য প্রমাণ করতে এ-চিঠিটা তাঁদেরকে দেখাবার জন্যে পা বাড়ালুম।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ল, তার চিঠির কথা নয়, চিঠির ভিতরকার কথা। সুখ হল না দুঃখ হল চেতনাটার ঠিক স্বাদ বুঝলুম না। খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ওদিকে বাবা দলবল নিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি চোখ-কান বুজে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। বললুম,—থাক, ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই। ও-মেয়ে আমি বিয়ে করব না।

বাবা তো প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন : সে কী কথা?

—হ্যাঁ, আমি আমার মত বদলেছি।

সে একটা বীভৎস কেলেঙ্কারিই হল বলতে হবে, কিন্তু সুমিতার জন্যে সব আমি অক্লেশে সহ্য করতে পারব।

কথাটা দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আমাকে আষ্টেপৃষ্টে ছেঁকে ধরলে : মত বদলাবার কারণ কী?

হাসবে না কাঁদবে কেউ কিছু ভেবে পেল না। বললে,—বা, এই কালো জেনেই তো এত তড়পেছিলি! এই কালোই তো ছিল ওর বিশেষণ!

কী যুক্তি দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। বললুম,—বিয়েতে আমার টাকা চাই।

—বেশ ছেলে যা হোক বাবা। তুইই না বলতিস বিয়েতে টাকা নেয়ার চাইতে গণিকাবৃত্তিতে বেশি সাধুতা আছে। ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে এখন পিছিয়ে যাবার মানে কী?

বললুম,—বেশ তো, তাঁদের অকারণ মনস্তাপের দরুন না হয় যথাযোগ্য খেসারত দেয়া যাবে।

সবাই বিদ্রূপ করে উঠল : এদিকে পণ নিয়ে বিয়ে করবার মতলব, ওদিকে গরচা খেসারেত দেয়া হচ্ছে। মাথা তোর বিগড়ে গেল নাকি?

কিন্তু এদের পাঁচজনকে আমি কী বলে বোঝাই? শুধু নিজের মনকে

নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বোঝাতে পারি : সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি।

সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি, নিশ্চয়, ভালোবেসেছি তার ঐ প্রেম। তাই, তাকে অপমান করি, আমার সাধ্য কী! তাকে যে আমার কেন এত পছন্দ হয়েছিল, এ কথা এখন কে বুঝবে?

আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাটা সমূলে ভেঙে দিলুম। নিরীহ একটি মেয়ের অকারণ সর্বনাশ করছি বলে চারিদিক থেকে একটা নিদারুণ ধিক্কার উঠল, কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, আমার এই আত্মবিলোপের অন্তরালে কার একখানি বেদনায় সুন্দর মুখ সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাউকে ভালো না বাসলে আমরা কখনো এতখানি স্বার্থ ত্যাগ করতে পারি না। সুমিতাকে এত ভালোবেসেছিলুম বলেই তার জন্যে নিজের এত বড়ো ঐশ্বর্য অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার ত্যাগ তার প্রেমের মতোই মহান হয়ে উঠুক।

প্রাগবিচার করা বৃথা, জীবনে সত্যিই সুমিতা সুখী হতে পারবে কিনা; কিন্তু প্রেমের কাছে সুখের কল্পনাটা সূর্যের কাছে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি। তার সেই প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি আমার ছোটো সুখ নিয়ে ফিরে এলুম।

তারপর বছর তিনেক কেটে গেছে, আমি বারাসত থেকে দুবরাজপুরে বদলি হয়ে এসেছি।

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার বৈবাহিক ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়ে গেছে, এবং এবার অতি নির্বিঘ্নে। বলা বাহুল্য, এবার আমি নিজে আর মেয়ে দেখতে যাই নি, মা তাঁর কথামতো দিব্যি একটি টুকটুকে বৌ এনে দিয়েছেন। নিতান্ত স্ত্রী বলেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছি না।

আমার স্ত্রী তখন বাপের বাড়ি, আসন্নসন্তানসম্ভবা। আমার কোয়ার্টারে আমি একা, নথি-নজির নিয়ে মশগুল।

এর মধ্যে যে কোনো উপন্যাসের অবকাশ ছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

সেরেস্তাদার তাঁর এক অধীন কেরানির নামে আমার কাছে নালিশের এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করলেন। পশুপতির চুরিটা অবিশ্যি আমিই ধরে ফেলেছিলুম। আমারই শাসনে এতদিনে সেরেস্তাদারের যা-হোক ঘুম ভাঙল।

নতুন হাকিম, মেজাজটা সাধারণতই একটু ঝাঁঝালো, পশুপতিকে আমি ক্ষমা করলুম না।

আমারই খাসকামরায় পশুপতি দুহাতে আমার পা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে—হুজুর মা-বাপ, আমার চাকরিটা নেবেন না। এমন কাজ আর আমি কখনো করব না—এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।

পা দুটো তেমনি অবিচল কঠিন রেখে রুক্ষ গলায় বললুম,—তুমি যে-কাজ করেছ, আর শত করবে না বললেও তার মাপ নেই।

পশুপতি আমাকে গলাবার আরেকবার চেষ্টা করল : ভয়ানক গরিব হুজুর, তারি জন্যে ভুল হয়ে গেছে।

আমারো উত্তর তৈরি : ভুল যখন করেছ, তখন ভয়ানক গরিবই থাকতে হবে।

কিন্তু পশুপতি আরো যে কতো ভুল করতে পারে তা তখনো ভেবে দেখে নি।

রাত্রে শোবার ঘরে লণ্ঠনের আলোতে খুব বড়ো একটা মোকদ্দমার যোজন-ব্যাপী রায় লিখছি, এমন সময় দরজায় অস্পষ্ট কার ছায়া পড়ল, স্ত্রীলোকের মতো চেহারা। অকুণ্ঠ পায়ে ঘরের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়েছে।

কোনো অফিসারের স্ত্রী বেড়াতে এসেছেন ভেবে সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হয়ে বললুম—আমার স্ত্রী তো এখানে নেই—

স্ত্রীলোকটি পরিষ্কার গলায় বললে,—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

লণ্ঠনের শিখাটা তাড়াতাড়ি উস্কে দিলুম। গলা থেকে আওয়াজটা খানিক আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল : এ কী? তুমি, সুমিতা? তুমি এখানে কী করে এলে?

তাকে চিনতে পেরেছি দেখে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুমিতা সামনের একটা চেয়ারে বসল। ঘরের চারদিকে বিষণ্ণ চোখে তাকাতে লাগল যেখানে খাটে পাতা রয়েছে আমার বিছানা, যেখানে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আমার স্ত্রীর ফোটো।

আবার জিগগেস করলুম : তুমি এখানে কি করে এলে?

সুমিতা আগের মতো তেমনি চোখ নামিয়ে বললে,—ভাসতে-ভাসতে!

তার এই কথায় চারপাশে মুহূর্তে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠল তারই ভিতর দিয়ে তার দিকে তাকালুম। দেখলুম সেই সুমিতা আর নেই। যেন অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে। আগে তার শরীরে বয়সের যে একটা বোঝা ছিলো তা-ও যেন খসে শিথিল হয়ে পড়েছে। সে আজ শুধু কালো নয়, কুৎসিত। পরনের শাড়িটাতে পর্যন্ত আটপৌরে একটা সৌষ্ঠব নেই। হাত দুখানি দুটি মাত্র শাঁখায় ভারি রিক্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

গলা থেকে হাকিমি স্বর বার করলুম : আমার কাছে তোমার কী দরকার?

ম্রিয়মাণ দুটি চোখ তুলে সুমিতা বললে,—আমার স্বামীকে আপনি রক্ষা করুন।

মনে মনে হাসলুম। একবার তাকে রক্ষা করেছিলুম, এবার তার স্বামীকে রক্ষা করতে হবে। আদালত সাক্ষীকে যেমন প্রশ্ন করে তেমনি নির্লিপ্ত গলায় জিগগেস করলুম : তোমার স্বামী কে?

সুমিতা স্বামীর নাম মুখে আনতে পারে না, চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

শেষে নিজেকেই অনুমান করতে হল : তোমার স্বামীর নাম কি পশুপতি?

—হ্যাঁ।

চিত্রার্পিতের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেই সুমিতা আর নেই। হাসি মিলিয়ে যাবার পর সে যেন একরাশ স্তব্ধতা। তার ভঙ্গিতে নেই আর সেই ত্বরা, রেখায় নেই আর সেই তীক্ষ্ণতা। মুখের ভাবটি তৃপ্তিতে আর তেমন নিটোল নয়। তার জন্যে মায়া করতে লাগল।

জিগগেস করলুম : কদ্দিন তোমরা বিয়ে করেছ?

যেন বহুদূর কোনো সময়ের পার হতে উত্তর হল : এই তিন বছর।

কথাটার বলবার ধরনে চমকে উঠলুম,—শেষ পর্যন্ত তোমার সেই নির্বাচিতকেই পেলে?

—না।

—না? তবে পশুপতি তোমার কে?

সুমিতার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। বললে,—আমার স্বামী।

—হুঁ। একটা ঢোঁক গিলে ফের প্রশ্ন করলুম : ওকে বিয়ে করলে কেন?

—না করে পারলুম না।

—ওকেও চিঠি লিখেছিলে?

—লিখেছিলুম, কিন্তু শুনলেন না।

—শুনলেন না?

—না।

চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বালা করে উঠল : শুনলেন না কেন?

সুমিতা বললে—তাঁর দৃষ্টি ছিলো তাঁর নিজের সুখের দিকে।

—নিজের সুখ?

—হ্যাঁ, টাকা। বিয়ে করে কিছু তিনি টাকা পেয়েছিলেন।

রুক্ষ গলায় বললুম—তুমিই বা নিজের সুখ দেখলে না কেন? কেন গেলে ওকে বিয়ে করতে?

—পারলুম না, হেরে গেলুম। একেক সময় মানুষে আর পারে না। সুমিতা নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়াল।

বললুম—আমার বেলায় তো মরবার পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলে, তখন মরলে না কেন?

হাসবার অস্ফুট একটি চেষ্টা করে সুমিতা বললে,—মরতে আর কি বাকি আছে!

—না, না, তোমার এই ফ্যাশানেবল মরা নয়, সত্যি-সত্যি মরে যাওয়া। প্রেমের জন্যে তবু একটা কীর্তি রেখে যেতে পারতে।

রূঢ় আঘাতে সুমিতা যেন আমূল নড়ে উঠল। কথার থেকে যেন অনেক দূরে সরে এসেছে এমনি একটা নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে সে বললে,—কিন্তু সে-কথা থাক আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান।

—তোমার স্বামীকে বাঁচাব? তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

তবু কী আশ্চর্য, সুমিতা হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বললে,—অবস্থাব দোষেই এমন করে ফেলেছেন। এবারটি তাঁকে মাপ করুন। তাঁর চাকরি গেলে আমরা একেবারে পথে ভাসব। জলে ভরা চোখ দুটি সে আমার মুখেব দিকে তুলে ধরল।

নথির দিকে চোখ নিবিষ্ট করে বললুম—তোমার মতো আমারো এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি আর তেমন উদার ও মহানুভব নই।

—না, না, আপনি মুখ তুলে না চাইলে—

বাধা দিয়ে বললুম,—কার দিকে আর মুখ তুলে চাইব বলো? তুমি আমাকে যে অপমান করলে—

—অপমান? সুমিতা যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, এতদিন অন্য সংজ্ঞা দিয়েছিলুম. কিন্তু একে অপমান ছাড়া আর কী বলব? তোমার জন্যে, তোমার প্রেমের জন্যে, আমি যে স্বার্থ ত্যাগ করলুম তুমি তার এতটুকু সুবিচার করলে না, এতটুকু সম্মান রাখলে না। শেষকালে পশুপতি কিনা তোমার স্বামী। তোমার স্বামী কিনা শেষকালে পশুপতি! এরপর তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করতে পারো?

—কিন্তু, সুমিতা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল : তবু, আপনি দয়া না করলে—

চেয়ার ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,—কেন দয়া করতে যাব? তুমি আমার কে?

—কেউ না হলে কি আর দয়া করা যায় না?

—না। তুমিই বলো না, কী দেখে আমার আজ দয়া হবে? কঠিন কটু গলায় বললুম—তোমার মাঝে দেখবার মতো আর কী আছে?

সুমিতা উঠে দাঁড়াল। আজ তার বসার থেকে এই দাঁড়ানোর মাঝে কোনো দীপ্তি নেই। সঙ্কোচে নিতান্ত ম্লান হয়ে প্রায় ভয়ে ভয়ে বললে,—সেদিনই বা কী দেখেছিলেন?

উত্তপ্ত গলায় বললুম—সেদিন দেখেছিলুম তোমার প্রেম।

নথি-পত্রের মধ্যে ডুবে যাবার আগে একটা হাকিমি ডাক ছাড়লুম : নগেন।

নগেন আমার পিওন।

বললুম,—এ'কে আলো দিয়ে পশুপতিবাবুর ওখানে পেঁছে দিয়ে এস। দেরি কোরো না।

মুমূর্ষু দীপশিখার মতো সুমিতা একবার কেঁপে উঠল। কী কথা বলতে গিয়ে চমকে বলে ফেললে,—না, আলোর দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারব।

দরজার কাছে এসে সুমিতা তবু একবার থামল। ঘরের চারদিকে মৃত. শূন্য চোখে চেয়ে একবার চোখ বুজল। কী যেন আরো তার বলবার ছিল, কিন্তু একটি কথাও সে বলতে পারল না।

তার সঙ্গে অস্পষ্ট চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

হুইস্‌ল্‌

রতিকান্তর এমন বয়েস নয় যে আবার সে একটা বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু কাকে কে বোঝায়, রতিকান্ত মচকাবে তবু ভাঙবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে যেতেই তার সমস্ত শরীর ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। আবার একটি মেয়ে আসবে, আরেকটি মেয়ে, মাথায় লজ্জা-নোয়ানো আধখানা ঘোমটা, দেহে কামনার অব্যক্ত সম্মতি, সেই আবার মধুর, সুগন্ধ অন্ধকার। সেই আবার পুনঃপুনরুক্ত কথার নির্ভুল আবৃত্তি : তোমার মতো কাউকে আমি আর এত ভালোবাসিনি, এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

ভাবতেই রতিকান্ত সমস্ত শরীরে গলিত একটা অশুচিতা অনুভব করে।

—কিন্তু বিয়ে না করলে সংসার চলবে কি করে রতি? আত্মীয়-বন্ধুরা প্রতিবাদ করে ওঠে : ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে দুটোরই বা কে দেখা শোনা করবে?

রতিকান্তর ঠোঁটের উপর তীক্ষ্ণ একটা হাসি জ্বলে ওঠে : আর তিনি এলেই যে ওদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করবেন তার ঠিক কী! দুদিন যেতে-না-যেতেই হয়তো নিজেরই কোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। সাবি আর ছনুর জন্যে আমি কিছু ভাবি না। বুড়ি—কেন বুড়িই তো ওদের মা'র মতো।

—কিন্তু বুড়ি তো আর এ-বাড়িতে চিরকাল বসে থাকবে না। তার বিয়ে দিতে হবে তো?

—তেমনি সাবি-ছনুরাও চিরকাল ছোট হয়ে থাকবে না, ততদিনে তারাও নিজের-নিজেরটা দেখতে-শুনতে শিখবে।

আত্মীয় বন্ধুরা এইটুকুতেই নিরস্ত হয় না; গলাটা খাদে নামিয়ে বলে : কিন্তু বউ একটা মারা গেলে পর এই তোমার বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া স্বভাবটাই কি বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে?

রতিকান্ত অলক্ষ্যে গম্ভীর হয়ে পড়ে : সব জিনিস সকলের চোখে সমান ভালো দেখায়?

—তোমার এই সতীত্বের তো কোনো মানে বুঝতে পারি না, রতিকান্ত। স্ত্রীর স্মৃতির অবমামনা হবার ভয়ে তুমি বিয়ে করছ না, এদিকে—

—সব জিনিসের মানেও সকলে সমান বোঝে না। রতিকান্ত মুখের উপর ঘন করে গাম্ভীর্যের পরদা টেনে দেয় : পৃথিবীতে যে লোক রুগ্ন, কুৎসিত, সে-ও ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসতে পারে বলেই যে চিরকাল তার আয়ু অক্ষয়, দেহ নিরাময় থাকবে পৃথিবীর আইনে এমন কোনো নিয়ম নেই। প্রয়োজনসাধনের ব্যাপারটার মধ্যে প্রেমের খাদ মেশাতে চাই না।

বাঙলা-দেশের ছোট, পাড়াগেঁয়ে একটি শহর, রেল-লাইনের ধারেই রতিকান্তর বাসা।

বুড়ি সমস্ত দিন সংসারের কাজ-কর্ম করে, আর যখনই বাড়ির পাশ দিয়ে হুইস্‌ল্‌ দিয়ে ট্রেন যায়, হাতের কাজ ফেলে-ছড়িয়ে রেখেই সে এলো-আঁচলে জানলার কাছে ছুটে আসে। দিন-রাত্রির মধ্যে কতবার যে ট্রেন যাওয়া-আসা করে গুনে তা আর শেষ করা যায় না। কোনোটা দাঁড়ায় না, কোনোটা আবার দাঁড়ায়। যখন একবার দাঁড়ায়—

—বুড়ি!

নিশ্চিন্ত হয়ে ঠায় দু মিনিট দাঁড়িয়ে যদি কিছু তার দেখবার জো আছে!

রতিকান্ত বলে : কলকেটা ঢেলে সাজিয়ে নিয়ে আয় শিগগির। কী সারাক্ষণ ইস্টিশানের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকিস?

কলকেটা হাতে করে বুড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তখনো কান পড়ে আছে স্টেশনের টুকরো টুকরো শব্দের শিলাবৃষ্টিতে : এই ফের হুইস্‌ল্‌ দিল, রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট সে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে। আবার কোথায় না জানি গিয়ে ট্রেন থামবে। সেখানে হয়তো লাইনের ধারে কারো বাড়ি নেই, দুধারে হয়তো ফাঁকা, ঢালু মাঠ। স্টেশনের লাল সুরকির সরু রাস্তাটা কত দূর গিয়ে শাদা হয়ে গেছে।

বুড়ি রতিকান্তর প্রথম সন্তান,—পনেরোটি বছরে শরীর প্রায় ভরো-ভরো; মা মারা যাবার পর আড়াই বছর ধরে সে-ই সংসার তদারক করে বেড়াচ্ছে। কটি লোকেরই বা রান্না-খাওয়া, বুড়িই একহাতে সব দেয়া-থোয়া করে—হাতের-পাঁচ একটা ঝি আছে, বুড়িকে কিছু আর ভাবতে হয় না। এত খাটা-খাটনির পরেও হাতে তার অনেক সময়।

বুড়ির পর দু দুটি ভাইয়ের মৃত্যুর পর ঘেঁষাঘেঁষি করে সাবি আর ছনু। সাবির বয়েস আট আর ছনুর এই প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর হলো।

ভাতের ফেন গালতে-গালতে বুড়ি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে : সকাল থেকে উঠেই কী কতোগুলি মাটির হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসেছিস সাবি? ওদিকে ছেলেটা যে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে বাড়ি মাথায় করছে তোর কানে ঢুকছে না? যা শিগগির ওকে মুখ ধুইয়ে নিয়ে আয় এখানে। দেখছিস না আমার হাত জোড়া! ভারি উনি মেজ-দি হয়েছেন! যা, গেলি? বাবা এক্ষুনি তেড়ে আসবেন।

ছনু ছোট-ছোট হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে বুড়ির গলা জড়িয়ে ধরে : চলো দিদি, আমাকে গাড়ি দেখাবে চলো। আজ মা আসবে বলছিলে না?

হাতের কাছে ঘটির জলে তার চোখ ধুয়ে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছতে-মুছতে বুড়ি বলে : তুমি আগে খেয়ে নাও, পরে গাড়ি দেখাবো চলো।

ছনু দিদির কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরে জিগগেস করে : মা আজ আসবে?

—আসবে বৈ কি, তুমি আগে খেয়ে নাও। না-খেলে মা কখনো আসে নাকি?

রতিকান্ত ব্যস্ত পায়ে ভিতরে চলে আসে, গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ে : বুড়ি!

ভয়ে ভয়ে নিতান্ত নিরীহ গলায় বুড়ি সাড়া দেয় : আজ্ঞে।

—ছনু কাঁদছিল কেন? তোদের বলেছি না ওকে কখনো কাঁদাতে পারবি না। সাবিটা ফের ওর সংগে মারামারি করেছে বুঝি?

সাবি ভয়ে খুঁটির পেছনে লুকোয়, বুড়ি অপরাধীর মতো জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে।

ছনু প্রসন্ন গলায় বলে ওঠে : না বাবা, একটুও কাঁদছি না। দিদির কাছে বসে মুড়ি খাচ্ছি।

সে কাঁদলে যে দিদিদের উপর বাবা অসন্তুষ্ট হন এটুকু ছনু বুঝতে শিখেছে।

—ওর কান্না আমি কিছুতেই সইতে পারি না, রতিকান্তর গলা হাওয়ায় ভেসে আসে : ওর কান্না শুনলেই সব ছেড়ে-ছুড়ে কোথায় পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সারা দিনের মধ্যে ছনু বেশি আর কোনো গোলমাল করে না, নিজের খেলাধুলা নিয়েই সে মশগুল। বেতের মোড়াটাকে কখনো ঘোড়া বানায়, বাবার লাঠিটাকে দু'পায়ের মাঝখানে রেখে সমস্ত উঠোন সে ছুটোছুটি করে, থেকে-থেকে প্রায় গলা চিরে শব্দ করে ওঠে : পি—!

সাবি চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসে : বাবা এক্ষুনি মারতে আসবে, ছনু।

—বা, আমি কাঁদছি নাকি? আমি তো গাঁড়ি-গাড়ি খেলা করছি।

তারপর সন্ধ্যা হতে-না হতেই খাইয়ে-দাইয়ে বুড়ি যখন তাকে ঘুম পাড়াতে আসে, তখন তার বুকের কাছে রাশীভূত আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সজল-কণ্ঠে ছনু আরেকবার জিগগেস করে : কই, মা তো আজো এল না, দিদি? সেই গাড়ি কি এখনো আসে নি?

তার একরাশ অবিন্যস্ত চুলে চুলকে দিতে দিতে বুড়ি বলে : আসবে বৈ কি। তুমি আগে ঘুমোও, কাল ভোরে দেখবে মা এসেছেন। না-ঘুমোলে মা কখনো আসে নাকি?

ছনু জোরে-জোরে নিশ্বাস টানতে-টানতে ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়িকে এখন আবার রান্নাঘরে উঠে যেতে হবে। নিজের খাওয়া আছে, বাবার ভাত বেড়ে রাখতে হবে। রান্নাঘরে ঢেকে না রেখে নিয়ে আসতে হবে তাঁর শোবার ঘরে। কখন তিনি বাড়ি ফেরেন ঠিক কী! খান-না-খান, ভাত রাখতে হবে সাজিয়ে, পরিপাটি করে। তারপর ঝিয়ের সঙ্গে বসে ঘর নিকোও, কুপি নেবাও, দরজায় তালা দাও। সে অনেক রাত।

ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বুড়ি ওঠবার উদ্যোগ করে, ও-পাশ থেকে এবার সরে আসে সাবি। কেমন অস্পষ্ট, অচেনা গলায় সে হঠাৎ কথা কয়ে ওঠে : তুমি সেদিন বলছিলে না দিদি, মা ঐ তারার দেশে চলে গিয়েছে?

বুড়ি রুক্ষ গলায়, নিজেরই অজানতে, ধমক দিয়ে ওঠে : তুই এখনো ঘুমোসনি লক্ষ্মীছাড়ি? এত বড়ো বুড়ো মেয়ে, তুইও আমাকে জ্বালাবি?

—না, এই ঘুমুচ্ছি, দিদি। বালিশে মুখ ঢেকে ঘুমোবার চেষ্টা করতে-করতে সাবি বলে : কিন্তু অত দূর পর্যন্ত কি ট্রেনের লাইন আছে?

অগত্যা বুড়িকে আবার বসতে হয়। তার চুলে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বলে : মানুষে একদিন তা-ও করবে দেখিস।

—তারপর আমরা একদিন সেখানে বেড়াতে যাব? দিদির মুখে আর কথা নেই দেখে তার বিরক্তি অনুমান করে সাবি আবার তার দিনের গলায় বলে ওঠে : না, তুমি এবার যাও দিদি, খেয়ে এসো। আমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বো দেখো। শুধু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও, আলোর পলতেটা আরো একটুখানি উস্কে দাও। মা এলে আমার কিন্তু দিদি, সত্যি ভারি ভয় করবে। মনে হয় ঠিক যেন মাকে চিনতে পারব না।

তার গালে মৃদু-মৃদু চাপড় দিতে দিতে বুড়ি বলে : না. তুই আগে ঘুমো।

কাজ-কর্ম সেরে সব পাট করে বিছানায় ফিরতে-ফিরতে বুড়ির তখন অনেক রাত। সমস্ত স্টেশনটি নিঝুম, লাইনের ও-পারে ঘুমন্ত বিশাল শূন্যতা। কখন ফের ট্রেন আসবে তারই প্রতীক্ষায় লাইন দুটো যেন কঠিন হয়ে আছে। বুড়ির চোখে ঘুম আসে না, কখন ট্রেন আসবে তারই আশায় সে-ও যেন অন্ধকারে চুপ করে বসে মুহূর্ত গোনে।

তারপরে কত রাত করে না-জানি বাবা ফিরবেন। বুড়িকে উঠে দরজা খুলে দিতে হয়। ধাক্কা দিয়ে তক্ষুনি দরজা খোলা পেলে আর রক্ষে নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে-থাকতে বুড়ি কেবল তার বুকের মধ্যে ট্রেনের শব্দ শোনে—সে-ট্রেন শূন্যতার সমুদ্র পেরিয়ে অনবরত তার দিকে এগিয়ে আসছে।

একদিন বুড়ির সেই ট্রেন তাদের উঠোনের উপর এসে দাঁড়ায়।

ভর দুপুর বেলা রতিকান্ত তখন আপিসে, ঘরের দিকে লক্ষ্য রেখে কে ডেকে ওঠে : ঊষা।

ছোট্ট একটি নামের হাওয়ায় বুড়ির সমস্ত গা থেকে শিশির-বিন্দুর মতো যেন লাবণ্য ঝরে পড়তে থাকে। তাড়াতাড়ি গায়ের উপর আধময়লা শাড়ির খানিকটা ভাঁজ করতে-করতে বুড়ি বেরিয়ে আসে। তার নাম যে ঊষা সে যেন এই প্রথম শুনল! তার একটিমাত্র পোশাকি শাড়ির মতো এই নামটিও সে তার বিস্মৃতির কৌটোয় সযত্নে তুলে রেখেছে।

গলার আওয়াজেই সে চিনতে পেরেছিল—অপূর্ব।

কুড়ি থেকে বাইশের কোঠায় তার বয়েসটা এক টুকরো কঠিন হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে, যার সামনে সমস্ত পৃথিবীটা প্রায় একপাত কাঁচের মতোই ঠুনকো। জামায়-কাপড়ে দূর শহরের ঝাঁজালো একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত চেহারায় তারি যেন একটা গতির ঔজ্জ্বল্য। এইখানে, এই গেঁয়ো শহরে একটা দরিদ্রত্রাণ সমিতির পাণ্ডাগিরি করে তার খুব নাম-ডাক। বুড়ির মা যখন মরতে চলেছে তখন এর নেতৃত্বে দলের লোকেরা কী সেবাটাই না সেবার করেছিল! তখন থেকেই এ-বাড়িতে তার যাওয়া-আসা। তবে আসবার সময় অপূর্বকে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিতে হয় রতিকান্ত তাকে ঠিক দেখে ফেলছে কিনা, তার ঐ চাউনিটাকে সে বড়ো পছন্দ করে না।

হাতের থেকে ব্যাগটা দাওয়ার উপর নামিয়ে অপূর্ব চুলগুলি উলটো দিকে

ঠেলে দিয়ে বললে—কলকাতার সেই চাকরিটা হয়ে গেলো। আগস্ট মাস থেকে—তার এখনো দিন কয়েক দেরি আছে। ভাবলাম কদিন ফের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। কাল রাত্রের ট্রেনে এসেছি – সেই যেটা তিনটে পঞ্চান্নতে আসে। তোমাকে বলেছিলাম না, অপূর্ব দামী জামাকাপড়ে মাটির উপরেই বসে পড়ল : আবার আমি ফিরে আসব।

বুড়ি কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—একটা আসন এনে দিই।

—না, না, আসনে কী হবে? অপূর্ব তার ব্যাগের তালায় চাবি পরাতে লাগল : তুমি যে আমাকে একদম বিশ্বাস করো না তার একবার প্রমাণ দেখ। কী, ঠিক এলাম কিনা। তোমাকে বলে গিয়েছিলাম বলেই তো ফিরে এলাম, নইলে কাজ হয়ে যাবার পর কেউ বুঝি আবার আসে?

বুড়ির গলা বুজে এল : কিন্তু তেমনি তো তুমি আবার চলে যাবে।

—বেশ তো, তুমিও আমার সঙ্গে চলো না। অপূর্ব কথা একটা বলে ফেলে বাক্স থেকে কি-সব জিনিস-পত্র বার করতে লাগল।

মুহূর্তের জন্যে সমস্ত চেতনা স্তব্ধ করে বুড়ি তার শরীরে রক্তের একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য অনুভব করছিল—চোখের সামনে দিয়ে ঝাপসা করে দেখছিল দ্রুতরেখার অপসৃয়মান একটা প্রকাণ্ড ট্রেন। কিন্তু কথা একটা বলে ফেলার পর অপূর্বর মুখে এককণা আভা নেই যেন—ট্রেন চলে যাওয়ার পর স্টেশনের শুকনো শূন্যতা।

বুড়ি অবাক হয়ে বললে,—এত সব কিসের?

চোখ ভরে তাকে দেখতে-দেখতে অপূর্ব বললে,—তোমার জন্যে আনলাম।

—আমার জন্যে? আমি এ দিয়ে কী করবো?

—আলতা, এ দেবে পায়ে, মুখে মাখবে এ স্নো। কৌটোটা কেমন সুন্দর দেখেছ? আর এ তেলে চুল উঠবে তোমার ঘন হয়ে, পিঠ ভরে, তার ভার আর তুমি বইতে পারবে না। কথাকে কবিতা করে বলতে পারার নেশায় অপূর্ব বিহ্বল হয়ে উঠল : আর এ দেখ দু গজ দিশি ভয়েল, তোমার দুটো ব্লাউজ হবে। সেলাই করতে যাতে তোমার সুবিধে হয় তার জন্যে কাঁচি, ছুঁচ, সুতো—সব এনেছি। এই দু'পাত সেফ্‌টিপিন, চুলের কাঁটা—আর এই আরেকটা জিনিস—বলো তো কী?

বুড়ি গম্ভীর হয়ে বললে,—এ-সব দিয়ে আমার কী হবে?

—বা, তুমি সাজবে।

—যা একটা পেত্নির মতো চেহারা, তার আবার সাজ।

—বটেই তো। দেখ দেখি একবার মুখখানা। অপূর্ব শেষ সম্ভার—রঙিন-ফুল-তোলা আয়নাখানি এবার তুলে ধরল।

—সেজেগুজে আয়নায় বসে নিজের মুখই দেখি আর-কি। লজ্জায় বুড়ির লাবণ্য যেন আরো উথলে উঠল : বলে, বুড়ো হতে চললাম, তায় কত ঢং।

—তোমার আরেকটা নাম ঊষা, সে-কথা তুমি বারে-বারে ভুলে যাও কেন? অপূর্ব ফের ব্যাগ হাতে করে উঠে দাঁড়াল : ঊষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা—তুমি তা পড় নি?

ততক্ষণ ঘরের ভিতর থেকে সাবি আর ছনু এসে হাজির। জিনিসপত্রের বিশাল একটা পাহাড় দেখে সাবি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল : এ সব কার দিদি?

বুড়ি হেসে বললে,—আমার।

তার হাসির উত্তরে সাবির মুখে নেমে এলো গভীর ম্লানিমা। দেয়ালের ধারে সরে দাঁড়িয়ে সে শূন্য চোখে অপূর্বর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু ছনু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। এক হাতে স্নোর বাটিটা আঁকড়ে ধরে সে খুশি হয়ে বললে,—এটা আমার। তারপর ঝকঝকে কাঁচিটাও তার নজর এড়ায় নি, বাঁ হাতে নিলো সেটা কুড়িয়ে : এটাও।

ছুটেই হয়তো সে পালিয়ে যেত কিন্তু অপূর্ব তক্ষুনি তার মুঠি চেপে ধরেছে। নির্মম হাতে জিনিস দুটো ছাড়িয়ে নিতে-নিতে সে বললে—জিনিস-গুলো যত্ন করে তুলে রেখে দাও, নইলে এরা সব এক্ষুনি নষ্ট করে ফেলবে।

জিনিসদুটো হস্তচ্যুত হতেই ছনু মাটির উপর প্রবল কান্নায় গড়িয়ে পড়ল। সে-দিকে দৃকপাত না করে একটু সরে এসে বুড়ি বললে,—চললে?

—হ্যাঁ বেশিক্ষণ থাকবার কি জো আছে? অপূর্ব মুচকে একটু হাসল : তোমার বাবা আপিস থেকে—

—থাক, খুব বীরত্ব হয়েছে।

—বা, আমার কী! আমি যতক্ষণ না কেন বসি। তোমার জন্যেই তো তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়—

—থাক, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। যতটুকু এগিয়ে এসেছিল বুড়ি তার অনেক বেশি সরে গেল : কিন্তু আরেক দিন আসবে না?

চুলটা আরেকবার উলটো দিকে ঠেলে দিয়ে অপূর্ব বললে,—দেখি। তবে

যাবার আগে আরেকবার আসবো ঠিক। যেতে-যেতে অপূর্ব আবার ফিরে দাঁড়াল : তুলে রাখতে বললাম বলে জিনিসগুলো একবারে বাক্সে পচিয়ো না। ব্যবহার কোরো কিন্তু।

—কেন? বুড়ি অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠল : বাবাকে দেখাবার জন্যে?

—না, আমাকে দেখাবার জন্যে। সেজেগুজে আয়নাতে তুমি মুখ দেখলেই আমার দেখা হবে।

উঠোন পেরিয়ে অপূর্ব চলে যেতেই বুড়ি ছনুকে ধুলো থেকে তুলে নিলো। সাবি চোখ ছলছল করতে-করতে এগিয়ে এসে বললে,—সব, সমস্তই তোমার, দিদি?

—নে না, তোর যেটা ইচ্ছে।

ছনু লাফিয়ে উঠল : ওটা আমার, ওটা আমার।

জিনিসগুলো দু ভাই বোনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে শুধু আয়নাটি সে তার নিজের জন্যে তুলে রাখল।

সে-রাতে বুড়ির হয়তো গা ভরে গভীর ঘুম এসেছিল. রতিকান্ত কখন যে দরজায় ঠেলা মারছে তার কানেই ঢোকে নি।

নাম ধরে ডাক, কড়া-নাড়া, তারপর একেবারে পা দিয়ে জোরে-জোরে ধাক্কার পর ধাক্কা। বাড়ি-ঘর যেন এখুনি ভেঙে পড়বে।

বুড়ি ধড়মড় করে উঠে বসল। মুখ উঠল অন্ধকার করে। লণ্ঠনটা উস্কে দিয়ে ছুটে গেল সে দরজা খুলতে।

দরজার উপর রতিকান্তর শেষ যেই লাথিটা মুখিয়ে ছিল সেটা ছিটকে পড়ল এসে বুড়ির উপর। বাঁ হাতে তার খোঁপাটা টেনে প্রায় ছিঁড়ে ফেলে ডান হাতে রতিকান্ত তাকে বেদম মারতে সুরু করলে—কিল, চড়, ঘুষি,—হাতে যখন যেটা ভালো খেলে। জড়িত গলায় সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে নির্লজ্জ গালাগাল : এই বয়সে এত ঘুম কেন? আমি ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছি, আর উনি মৌরশি করে ঘুম মারছেন।

বুড়ি গুঙিয়ে উঠল। তার কান্না শুনে ছনু উঠল কেঁদে. সাবি ভয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

—একেবারে ঘুমিয়ে যেতে পারিস না হারামজাদি? মেঝের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রতিকান্ত টলতে-টলতে পাশের ঘরে চলে গেল।

নিজের কান্না ভুলে বুড়ি ছনুকে গেল শান্ত করতে। উঠে দরজায় খিল চাপিয়ে দিল।

কান্নায় বালিশের কানে সে বারে-বারে বলতে লাগল : এখানে সে কেন পড়ে আছে? তার মরে যেতে আর দোষ কী!

আরেক দিন বলতে ঠিক তার পরের দিনই যে অপূর্ব এসে হাজির হবে এতটা বুড়ি আশা করে নি। সকাল থেকেই তার জ্বর, তা নিয়ে সমস্ত সকালটা উনুনের পাশে কাটিয়ে শরীর এখন তার নেতিয়ে পড়েছে হঠাৎ জ্বরের উপর যেন ঘাম দিল। কিন্তু কে জানে, হয়তো আজ রাত্রেই তার ফিরে যাবার ট্রেন।

—ঊষা!

আজ আর বুড়ি দাওয়ায় ছুটে যেতে পারল না, অপূর্ব উঠে এলো ভিতরে।

—এ কী, শুয়ে আছ কেন? কী হয়েছে?

চোখের উপর থেকে রুক্ষ চুলের বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ ক'টি সরিয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ করে চেয়ে বুড়ি বললে,—জ্বর হয়েছে।

ছনু কোথায় বাবার লাঠি নিয়ে গাড়ি-গাড়ি খেলতে গেছে, সাবি ছিল কাছে। মুরুব্বিয়ানা করে বললে,—কাল রাতে বাবা দিদিকে ভীষণ মেরেছে। পিঠের ওপর চাপটা-চাপটা দাগ।

বুড়ি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : তোর আর পাকামো করতে হবে না তো।

সাবি ভারি গলায় বললে,—কিছু খায় নি, এতক্ষণে ঝি গেছে পালো কিনে আনতে।

তার গায়ে একটা ঠেলা মেরে বুড়ি বললে,—তুই এখন এখানে থেকে যা দেখি সর্দারনি, দেখতো ঝি ফিরল কি না।

ম্লানমুখে সাবি চলে গেলে বুড়ির জ্বরের উত্তাপ নিতে অপূর্ব তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর কোনো কথা নয়, তার শিথিল, শীর্ণ একখানি হাত চেপে ধরে অপূর্ব দীপ্ত গলায় বললে,—তুমিও চলো।

বুড়ি তো অবাক। হাসবে না ভয় পাবে কিছু বুঝতে না পেরে সে শুকনো গলায় বললে,—কোথায় যাব?

—কলকাতায়। আমার সঙ্গে। আমি কালকেই আবার চলে যাচ্ছি কিনা —রাত দশটার ট্রেনে। যেটা বরাবর এখান থেকে ছাড়ে।

—কালকেই?

—হ্যাঁ, এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম পেলাম—ভাঙা মাস থেকেই আমাকে কাজে

বসতে হবে। হাতে আরেকটু চাপ দিয়ে অপূর্ব বললে,—চলো. তোমাকে আমি নিয়ে যাব।

—তুমি পাগল হলে নাকি? আমি যাব কোথায়?

—তবে এইখানে পড়ে-পড়ে মার খাবে নাকি? অপূর্ব অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—শুধু কালকে নয়, প্রায়ই। এ নিয়ে পাড়ায় কান পাতা দায়—আমাকে তুমি কিছু লুকোতে পারবে নাকি ভেবেছ?

ফুলো-ফুলো চোখ তুলে বুড়ি বললে,—বাপ তার সন্তানকে মারবে এতে পাড়ার কার কী মাথা-ব্যথা শুনতে পাই? আমি কখনো কারু কাছে নালিশ করতে গেছি?

—এ নালিশ করতে হয় না. আপনা থেকেই সবাই বুঝতে পারে। তোমার বাবার কীর্তিকে তুমি ঢাকতে পারবে না, ঊষা। অপূর্ব ঈষৎ বিষণ্ণ আঙুলে তার চুলের জট ছাড়াতে লাগল : কিন্তু তোমার যদি বিয়ে হয়ে যেতো, তবে তোমার স্বামী চুপ করে তোমার ওপর এই অত্যাচার সহ্য করত নাকি ভেবেছ?

বুড়ির গলা প্রায় বুজে এল : তা. বিয়ে তো আর হয় নি।

—হয় নি, হবে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমার চাকরি হয়েছে, তুমি গেলে মেস্‌এ না উঠে আমি একটা বাড়ি-ভাড়া করব। তোমার একটুও কষ্ট হবে না।

ভীত, পাংশু মুখে বুড়ি অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল তুমি কী বলছ যা-তা?

—যা-তা নয়. স্পষ্ট সত্য কথা। এখানে থাকবার তোমার কী মানে আছে, সমস্ত জীবন তুমি এই ঘানি টানবে নাকি? তোমার জীবনের এইটুকু মাত্র পরিসর. তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার এইখানেই ইতি? গভীর মমতায় তার কপালের উপর অপূর্ব একখানি হাত রাখল : তোমার কিছু ভয় নেই, ঊষা! আমিই তোমার আছি।

—কিন্তু পালিয়ে যাবো কী বলছ?

—তা ছাড়া উপায় কী? বুদ্ধিমানরাই পালায়। জীবনের বড়ো একটা সার্থকতার কাছে এ-সব কিছুই চিন্তা করবার নয়। অপূর্ব গলায় জোর দিয়ে বললে,—আমাদের যখন বিয়েই হচ্ছে তখন পালানো না-পালানোয় কী এসে যায়!

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন বুড়ির প্রাঞ্জল বোধ হলো। গায়ে দিল যেন ঝিরঝিরে হাওয়া। শরীরের প্রতিটি রেখায় ফুটল ধার, রক্তে জাগল ঢেউ।

বেশিক্ষণ নয়, গলা এল ফের অবসন্ন হয়ে : কিন্তু ছন্ু, সাবি—ওদের ফেলে যাব কী করে? তুমি পাগল হলে নাকি?

—তোমার মা-ও ওদের স্বচ্ছন্দে ফেলে গেছেন। অপূর্ব যেন একটা ধমক দিয়ে উঠল : তোমার বাবাও ওদের ফেলে নিশ্চিন্তে নিশাচর হয়ে উঠেছেন। যত দায় পড়েছে তোমার! তুমি ওদের কে,—আজ তোমার বিয়ে হলে কাল তুমি ড্যাং-ড্যাং করতে-করতে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। তোমার কী! তুমি কি এ-সংসারের লোক নাকি? এইখানেই তোমার ভাত মাপা আছে নাকি চিরকালের?

আঘাতে বুড়ি যেন একেবারে অবশ হয়ে পড়ল : সেই জন্যেই তো বাবা বিয়ে দিচ্ছেন না।

—আর নিজে করে বেড়াচ্ছেন এই কেলেঙ্কারি। যেন তোমারই কেবল কিছু সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই। তোমার বাবার খেয়াল মেটাবার সুবিধে করবার জনেই যেন তুমি এখানে আছ। অপূর্ব তার হাত ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল : না, তুমি চলো। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ অনেক আসে না। ওদের জন্যে মিছিমিছি তুমি কেন ভাবতে যাচ্ছ? মাথার ওপরে ওদের বাবা নেই? নিজেকে এই ভাবে বঞ্চনা করা ভীষণ পাপ, ঊষা, তুমি চলো।

অপূর্বর হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বুড়ি ফুঁপিয়ে উঠল।

অপূর্ব একটু নুয়ে পড়ে বললে,—কাল রাত দশটায় ট্রেন, আমি সাড়ে ন'টা নাগাদ আসবো তোমাকে নিয়ে যেতে—এই তো এইটুকুন মোটে রাস্তা। কিছু ভয় নেই, তোমার বাবা তো তখন বাড়িতেই থাকে না, সাবি আর ছনুকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখো। বলো, যাবে তো?

এত সুখ যে, বুড়ির ভীষণ ভয় করতে লাগল, শূন্য চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললে,—তুমি যদি বলো যাব।

অপূর্ব দৃপ্ত একটা ভঙ্গি করে বললে,—সংসারে তোমার ওপর সবার চেয়ে আমার দাবি বেশি। আমি এখানে তোমাকে বাপের লাথি খাওয়ার জন্যে ফেলে রাখতে পারি না। দুটো দিন আগে বলেই আমার অধিকার আমি জাহির করবো না, তা নয় ঊষা। সংসারে মেয়েছেলের ভাই-বোন-বাপই বেশি নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু তার আছে।

বুড়ি গাঢ় গলায় বললে,—আমি বলেছি নেই? ছনু আর সাবি মাঝে-মাঝে

আমাদের কাছে কলকাতায় গিয়েও তো বেড়িয়ে আসতে পারবে। আমাদের তো তখন বাসাই হবে বললে।

—হ্যাঁ, অপূর্ব উঠে দাঁড়াল : কিছু তোমার জিনিস-পত্র নিতে হবে না। পৃথিবীতে জিনিস অনেক হয়, সুযোগই শুধু আসে না। তুমি কিন্তু তৈরি হয়ে থেকো, ঊষা, আমি ঠিক আসব। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ।

আশ্চর্য, বুড়ি কিন্তু সেই মুহূর্তেই তৈরি—কতো যুগ পরে যে কালকের দশটা-রাত এসে হাজির হবে তার ঠিকানা নেই। সত্যি তার মনের থেকে কে যেন বার-বার বলতে লাগল : মানুষের জীবনে এমন সুযোগ অনেক আসে না। না এই সুযোগের দরজা দিয়ে জীবনের এই জেলখানা থেকে সে পালিয়ে বাঁচবে! তার চোখের সামনে ছোট, পরিচ্ছন্ন একটি সংসার-নিকেতনের ছবি উঠল ভেসে। সেখানে সে সর্বময়ী কর্ত্রী, তার কিনা অপূর্বর মতো স্বামী। সত্যিই তো তার কোথায় আর কিছু ঋণ থাকতে পারে না। ছনু দেখতে-দেখতে কত বড় হয়ে উঠবে,—পুরুষমানুষ, কার কী সে তোয়াক্কা রাখে? আরো ভালো ঘর দেখে সাবির বিয়ে হয়ে যাবে—নদীতে-নদীতে দেখা হয়, তবু দুই বোনে দেখাই হবে না হয়তো কোনদিন। না, মানুষের জীবনের সুযোগ ঝাঁক বেঁধে আসে না। প্রচণ্ড শীতের রোদে সে কুড়িয়ে পেয়েছে একটি আগুনের কণা—তাকেই সে আঁচলের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখবে, জীবনে যা দেবে তাপ, আলো, আনন্দ। সমস্ত শরীর তার সেই আগুনে উঠল ঝলমল করে।

প্রথম রাতটা বুড়ির স্বপ্নে কাটল বিভোর হয়ে, কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই তার চারপাশে ঘনিয়ে উঠছে অজানার অন্ধকার। দিনের বেলায় দ্রুত, উচ্চকিত পদক্ষেপগুলি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেল কুণ্ঠার কুয়াশা। অন্ধকারে সত্য যে আরো স্পষ্ট, আরো উলঙ্গ হয়ে উঠল—দিনের আলোয় যা ছিল স্বপ্নে রঙিন. অনুভবে প্রচ্ছন্ন—এখন যেন সেই চেতনাটা তার বুকে এসে আঘাতের মতো লাগছে।

তা হলে অপূর্ব আর তাকে ডাকতে না আসুক, নিজেই একা চলে যাক ট্রেনে করে। ভাবতেও বুড়ির শরীরের সমস্ত স্নায়ু-শিরা চিৎকারে ছিঁড়ে পড়ে—অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে দুই হাত আঁকুপাঁকু করে ওঠে। আত্মহত্যার চাইতেও তা অসহ্য ব্যর্থতা।

আজকে সন্ধ্যার পরেই কাজকর্ম সব চুকে গেছে—তালা পড়েছে রান্নাঘরে।

রতিকান্ত সেই কখন বেরিয়ে গেছে। সাবিও পড়েছে ঘুমিয়ে। শুধু, কেন কে জানে, ছনুর চোখেই আজ ঘুম নেই।

এতদিন সে লাঠিকে রেলগাড়ি বানিয়েছে, আজ সত্যি-সত্যি পাশের বাড়ির সেকেন্ড মাস্টারের ছেলে বড়ো শহর থেকে কিনে এনেছে এক সত্যিকারের রেলগাড়ি। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কী খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেই গাড়িটা এঁকে-বেঁকে চলে, অনেকক্ষণ চলে। ছনুর আবদার অমনি তার একটা গাড়ি চাই।

বুড়ি তাকে কতো বুঝিয়ে বললে,—তোমার গাড়ি ওর চেয়ে কতো ভালো। ওর গাড়ি তো কতটুকু গিয়েই থেমে পড়ে—আর তুমি গাড়ি নিয়ে ঐ কতোদূরে অশথ গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারো। ওর গাড়ি তো শব্দ করতে পারে না, আর তুমি কেমন থেকে-থেকে হুইস্‌ল্‌ দিয়ে ওঠো. পি—!

ছনু দিদির হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বললে,—ও শব্দ আমার লাঠি করে নাকি? ও তো আমি করি।

তাকে বোঝানো বৃথা। কেঁদে কেটে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে সে একটা কাণ্ডই বাধালো যা-হোক। কাঁদতে-কাঁদতে যখন সে অবসন্ন হয়ে আসে তখন হঠাৎ তার মার কথা মনে পড়ে যায়, বা, মা বলে কাকে সে মনে-মনে দাঁড় করায়। মা থাকলে নিশ্চয় তার গাড়ি হতো।

আর, মা'র কথা উঠলেই সাবি আসে দিদির পাশ ঘেঁষে। দিদির মুখে মা'র সম্বন্ধে মিথ্যাকথাগুলি শুনতে সাবির খুব ভালো লাগে।

—কাল মা গাড়ি নিয়ে আসবেন, মুখে আর ছনুকে 'পি' বলতে হবে না—এই প্রতিজ্ঞা করাতে তবে ছনু চুপ করেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দিদির গলা জড়িয়ে। আর, দেখবো কেমন কাল মা আসেন, সঙ্গে আবার টিনের একটা দম-দেওয়া গাড়ি—মুখে এমন একটা অবিশ্বাসের ভাব মিশিয়ে সাবিও গেছে ঘুমের কোলে ডুবে।

কালকের কথা কাল, আজ তো ওরা ঘুমুক।

বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে অন্ধকারে, শোনা যাচ্ছে স্টেশনের টুকিটাকি শব্দ। কলকাতার গাড়িটা বুঝি এই ইন হলো—আস্তে আস্তে কামরায় জ্বলে উঠলো আলো; এক আধজন করে লোকও বুঝি উঠতে লেগেছে। অপূর্ব বুঝি তবে আর এলো না। এ-ও বুঝি তার আর-আর রাতের মতো একটা সাধারণ, সহজ রাত—যে রাতে বাবার জন্য উঠে দরজা খুলে দিতে হয়, ঘুমের মধ্যে ছনু

কেঁদে উঠলে গুন্‌গুন্‌ করে ছড়া কাটতে হয়! বুড়ি অসহায় আর্তকণ্ঠে একটা প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু না, ঐ বুঝি উঠোনে অপূর্বর পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি ছনুকে সে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল—কাল ভোরে উঠে দিদিকে সে আর দেখতে পাবে না। তাতে কী? বড়ো হলে দিদির তো সে ভারি তোয়াক্কা রাখবে!

না, অপূর্ব নয়, পাতা ফিসফিসিয়ে-তোলা একটা বুনো হাওয়া। এদিকে স্টেশন উঠেছে সরগরম হয়ে. গাড়ি ছাড়বার বুঝি আর বেশি দেরি নেই। এলো না তো এলোই না, মিছিমিছি তার আশায় সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে একটু খুশি করে তোলা। বুড়ি তো জানতো, অনেক আগে থেকেই জানতো। ছেলেরা ওরকমই বলে থাকে, যাবার ঠিকঠাক করে পরে আর আসে না। কেনই বা আসবে? শুধু নাম একটা ভালো থাকলেই তো হয় না।

বুড়ি ছনুকে আরো কাছে টেনে আনল, তার চোখের পাতা এল ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে!

ঊষা! ঊষা! দরজায় তক্ষুনি কে ধাক্কা দিতে সুরু করেছে।

বুড়ি হকচকিয়ে উঠে পড়লো। নিশি পাওয়ার মতো কি করছে কিছু বুঝতে না পেরে দরজা খুলে বাইরে এলো বেরিয়ে। বিকেলে চুল বাঁধবারো তার সময় হয়নি. পরনের শাড়িটায় নেই এতোটুকু ভদ্রতা। দাঁড়ালো এসে, যেন ফাঁসিকাঠে উঠছে।

অপূর্ব ঝাঁজিয়ে উঠলো : এ কী, একেবারে দোর দিয়ে বসে আছ যে। যাবে না?

ঘরের লণ্ঠনের আলোয় বাইরের বারান্দাটা আবছা করে আছে। সেই ঘোলাটে আভায় বুড়ি দেখলো অপূর্বর একেবারে বরের মতো রাঙা টুকটুকে চেহারা। খুশিতে ছলছল করতে-করতে বললে,—কিন্তু তুমি যে সত্যিই আসবে তা ভাবিনি।

ভাবো নি মানে? এ একটা ঠাট্টা করবার মতো কথা নাকি? তোমাকে আমি ভালোবাসি, এ একটা শুধু মুখের কথা মনে করলে?

বুড়ি সামান্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো : আস্তে। কথা শুনে ছনু আবার জেগে উঠতে পারে। আমি আসছি।

বুড়ি ঘরের দিকেই ফিরে যাচ্ছিল, অপূর্ব তার হাত চেপে ধরলো : না, তোমাকে সাজগোজ করতে হবে না, ট্রেনের আর সময় নেই, এঞ্জিন লেগে গেছে

টিকিট কেটে আমি একটা কামরায় জিনিস-পত্র চাপিয়ে, একটা লোকের জিম্মায় রেখে এসেছি। তুমি চলে এসো এক্ষুনি।

অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী যেন নিরাশ্রয় শূন্যচারী একটা বিন্দুর মতো দুলতে লাগলো। অপূর্বর আকর্ষণের মাঝে হাত শিথিলতরো করে দিয়ে ম্লান গলায় বুড়ি বললে,—কিন্তু দরজাটা যে খোলা রইলো—

—থাক খোলা, কয়েদি যখন পালায় তখন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পালায় না। তাড়াতাড়ি চলো, স্টেশনের এই এক পা পথ পেরিয়ে গেলেই আমরা নতুন মানুষ।

—কিন্তু, বুড়ির হাতের পাঁচটি আঙুল কাকুতি করে উঠলো : লণ্ঠনটা শুধু-শুধু জ্বলবে, ওটা নিবিয়ে দিয়ে আসি।

—জ্বলুক না। তুমি চলে এসো।

—এখুনি কী? আরেকটু দাঁড়াও। কী মনে করে বুড়ি মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালো : কাল সকালে উঠে ওরা কী খাবে কিছুই যে এখনো বন্দোবস্ত করে রাখি নি।

—কাল কোরো। এখন তুমি চলো।

—দাঁড়াও, আর এক সেকেণ্ড। ওদের মশারিটা একবারটি টাঙিয়ে দিয়ে আসি।

—কিন্তু ওদিকে গাড়ি যে ছাড়ে।

বুড়ির মুখ চুপসে গেলো। দু পা এগিয়ে এসে আবার থামল, করুণ গলায় বললে,—ওদের মুখ আর আমি একদম মনে করতে পারছি না। চুপি-চুপি একবারটি গিয়ে দেখে আসতে-আসতে তোমার ট্রেন কি ছেড়ে যাবে?

অপূর্বর মুখে আর কথা নেই। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামল, পিছনে এক-পা দু-পা করে বুড়ি এলো এগিয়ে। অথচ, এক হাতও নয়, ঘরের মধ্যে ছেলেরা শুয়ে আছে। আর পিছন ফেরবার পথ নেই, শুধু এগিয়ে চলো। উঠোন পেরিয়ে রাস্তাটা, আর রাস্তাটা না ফুরোতে-ফুরোতেই স্টেশন।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে এঞ্জিনের হুইসল্ বেজে উঠল।

অপূর্ব বললে,—সর্বনাশ।

বুড়ি পাংশু শুকনো মুখে জিগগেস করলে : কী ওটা?

—জানো না, কী? হুইসল্,—আমাদের যাবার বাঁশি। চলো পা চালিয়ে, ঠিক ধরে ফেলতে পারবো। ঐ দেখ অনেকে ছুটোছুটি করে উঠছে, এখনো

সময় আছে। দাঁড়িয়ে আছ কি হাঁ করে? চলে এসো বলছি। অপূর্ব তার হাত ধরে সজোরে একটা টান মারল।

বিমূঢ় চোখে চেয়ে থেকে বুড়ি নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—কে, ছনু কেঁদে উঠল না?

—তুমি থাকো তোমার ছনুর কান্না নিয়ে, আমি চললাম।

—দাঁড়াও।

—তবে এসো শিগগির। আমি আগে যাই, গার্ডকে বলে আর দু মিনিট ট্রেনটা দাঁড় করাই গে। একটু ছুটে এসো, মেয়ে হয়েছ বলে কি সব সময়েই গজেন্দ্রগমনে চলবে?

কিন্তু আবার হুইস্‌ল্‌।

অপূর্ব প্ল্যাটফর্মে পেঁছে গেছে, গাড়ি দাঁড় করিয়েছে হয়তো। অন্ধকারে এ-বাড়ির দিকে সঙ্কেত করে হাতছানি দিচ্ছে ঘন-ঘন।

কিন্তু সেই ডাক অনুসরণ করে পথ ভুলে বুড়ি চলে এসেছে ঘরের মধ্যে। তার ছনুর বিছানায়।

প্রাসাদশিখর

অনেক খুঁজে-পেতে বাড়ি বের করেছে। সে কি একটা গলির মধ্যে তেতলার ফ্ল্যাট। ঢুকতে যেমন মনে হয়েছিল উঠে এসে তত খারাপ লাগল না। বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। এমনি একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পরিবেশই সুপ্রিয়কে মানাবে বুঝেছিল গুরুদাস।

তিন রুমের ফ্ল্যাট।

প্রথমে ঢুকেই বসবার ঘর। সুপ্রিয় আছ?

চাকর এসে বললে, বাবু পুজোর ঘরে আছেন। বসুন।

দু'ঘণ্টার উপর বসে আছে গুরুদাস। উঠে যায়নি। বিরক্ত হয়নি। বই-পত্রিকা এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করেছে। এক সময় চা ও জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল চাকর, তাই খেয়েছে। সিগারেট পুড়িয়েছে গোটাকতক। এমনি বসতেই হবে দরকার হলে এমনি একটা সমর্পণের ভঙ্গি গুরুদাসের। কাজটা জরুরি।

চাকর এসে বললে, বাবু জিগগেস করলেন আপনার নাম কি?

নাম বললে।

চাকর ফিরে এল। আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।

ছোট একটা প্যাশেজ পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে যেতেই সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠল, জুতো খুলে এস।

জুতো খুলল গুরুদাস। খোলাই উচিত। যার যেমন শুচিতার রুচি তার মান রাখা দরকার।

পাশের ঘরেই সুপ্রিয়র শোবার ঘর। শোবার ঘর না শুভ্রতার মন্দির। একটি যুগল-শয্যার খাট, সামনে একটা ডিভান। গোটা দুই গদিমোড়া টুল। একপাশে টেবিলের উপর সুপ্রিয়র স্ত্রীর একটি বড় বাঁধানো ফোটো। একপাশে রুপোর সিঁদুরের কৌটো। ফোটোর ললাটে সিঁদুর পরানোর দাগ।

ওদিকের ঘরটা পুজোর ঘর। পুজোর ঘরই বটে। সবচেয়ে ভালো ঘর। পুব আর দক্ষিণ খোলা। ভালো ঘরটি নিজের শোবার জন্যে না রেখে দেবতার জন্যে রেখেছে এটা একটু অভিনব লাগল। তা সুপ্রিয়র অনেক কিছুই অভিনব।

পুজার ঘরের চারদিকের দেয়াল পটে-চিত্রে বোঝাই। মাঝখানে মেঝের

উপর একটি কম্বল পাতা। আসনে দৃঢ়ীভূত হয়ে জপসাধনই আমার পূজা।

কী হয় এতে?

আর কিছু নয়, সুখ হয়! বাঁধাবরাদ্দের উপর সকলেই একটু উপরি-পাওনা খোঁজে। সেই উপরি-পাওনার সুখ।

ঈশ্বরকে পাবার মানে কি? কত লোকে, কত রকম প্রশ্ন করে। চাকরি পাওয়া বুঝি, বাড়ি পাওয়া বুঝি, বিষয় পাওয়া বুঝি—

ঠিক ঠিক। ও সব তো আছেই, তার উপরে এই একটু সুর পাওয়া, স্পর্শ পাওয়া। সেই মা আছেন অনেক ছেলের সংসারে, অন্নজল পরিবেশন করছেন সবাইকে কে আর মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে সচেতন? এরই মধ্যে এক ছেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, মার মুখের কথা শুনল। অন্নজলের সংসারে একটু অতিরিক্ত সুর, অতিরিক্ত স্পর্শ আদায় কবে নিল। সেই অতিরিক্তটুকুই ঈশ্বর।

কিন্তু যখন অন্নজল নেই?

ঈশ্বরও নেই।

গুরুদাস এসব তার্কিকের দলে নয়; সন্দেহ করে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাও করে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সুপ্রিয় তাব বন্ধু, আলাদা বিভাগে হলেও একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, উঁচু ধাপের অফিসর সুপ্রিয়—এবং সর্বোপরি, আজকে তো তর্কের কথা উঠতেই পারে না।

কি খবর? বিশুদ্ধ চিন্তায় মনে যে লাবণ্য আসে সেইটিই কান্তি হযে ফুটেছে সুপ্রিয়র দেহে-মুখে।

তুমি ক্ষণু, ক্ষণিকাকে চেন?

কে ক্ষণিকা?

আমার ভাগ্নী -

চোখ বুজল সুপ্রিয়। চিনতে পারল। সেই যার ডাকনাম টেঁপী।

হ্যাঁ, তার খবর শুনেছ?

না।

তার স্বামীটি মারা গেছে।

কদ্দিন?

এই বছর খানেক।

কিসে?

য়্যাকসিডেণ্টে—

কি জাতীয় দুর্ঘটনা বিশদ করে বলতে চাইছিল গুরুদাস, সুপ্রিয় বাধা দিল। বললে, বুঝেছি। অপঘাত।

তুমি তার স্পিরিট—আত্মা আনতে পারো?

আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

ভীষণ দমে গেল গুরুদাস। গলার স্বর বেরুল কি বেরুল না : কেন?

প্রেতলোকের বাসিন্দেরা বারে বারে একটা খবরই দিয়ে গেছে, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ডাকো তাঁকে ধরো। আমাদের ডেকে আমাদের ধরে লাভ নেই।

সে খবরের জন্যে প্রেতলোকে যেতে হবে কেন?

না, ওরা বলে, আমরা রাজধানীর কাছাকাছি আছি, তোমরা আছ অজ পাড়াগাঁয়ে। আমাদের থেকে খবর নাও, লাটসাহেব আছেন। আমরাই নির্ভর-যোগ্য খবর দিতে পারি। আমাদের কেউ কেউ দেখেছে তাঁর মোটরগাড়ি তাঁর পাইকপেয়াদা। এই খবর পেয়ে এখন ওদিকে এগোও। তাই এখন সেই চেষ্টাই করছি। কিভাবে চেষ্টা করতে হবে তারও কিছু কিছু পাঠমালা পেঁচছে দিয়েছে দয়া করে—তা ছাড়া—

তা ছাড়া—কান খাড়া করল গুরুদাস।

তা ছাড়া, যাকে ধরবার জন্যে এই প্রেতচর্চা, তিনিই কখন-সখন দেখা দেন মূর্তি ধরে।

দেখা দেন? প্রায় লাফিয়ে উঠল গুরুদাস। কে, তোমার স্ত্রী?

হ্যাঁ। শাশ্বতী।

কদ্দিন মারা গেছেন?

দেহ রেখেছেন। এই দু'বছর।

দেখা দেন, কথা হয় তাঁর সঙ্গে?

কথা হয় বৈকি। শুধু ছুঁতে দেন না। ছুঁতে চাইলেই নিষেধ করেন। কতদিন সিঁদুর দিতে গিয়েছি, সরে গিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে এগোতে গেলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

কে জানে কাব্যকথা হয়তো। তবু দিনের বেলায়ই কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল গুরুদাসের। বললে, তুমি অনেক উঁচুয় উঠে গিয়েছ। কিন্তু মেয়েটার প্রতি যদি একটু কৃপা করো।

খুব কান্নাকাটি করছে? খুব কান্নাকাটি করলে আসতে চাইবে না আত্মা।

না, এতদিনে সে ঝড়ের অবস্থাটা গেছে। তবু শোকের তো আর শেষ নেই। শেষ সময়ে কাছে ছিল না, একটা কথা বলে যেতে পারল না, শুনে যেতে পারল না—তারই জন্যে একটু আনতে চায় শুনতে চায়। যদি একটু সান্ত্বনা দিতে পারো—পরোপকার—

এই স্পিরিট আনার ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ঠিক রেডিওর কাণ্ড। এক পারে একটা ট্র্যানসমিটিং স্টেশন, আরেক পারে একটা রিসিভিং সেট। একটা পাঠাবার যন্ত্র, আরেকটা ধরবার। দুটোই নিখুঁত হওয়া চাই। যে আসবে তারও চাই ব্যাকুলতা আর যে আনবে তারও চাই তেমনি সুরবাঁধা দেহ। এপারের দেহ যদি শুধু কাঠ হয় ধ্বনি শোনা যাবে না, তেমনি ওপারের বিদেহ যদি উৎসুক না হন তা হলে অবস্থা হবে বাজনা আছে বাজিয়ে নেই। সুতরাং দুয়ের যোগ হলেই শুভযোগ। যদি কোথাও দেখ ফল হয়নি, জানবে যন্ত্রের গোলমাল। যন্ত্র যত জোরালো ততই নির্ভুল সাড়াশব্দ।

তা হলে তুমি একদিন বসো।

আমি বসলে হবে কেন? ক্ষণিকার স্বামী কি আমাকে চেনে? আমার কাছে আসতে তার আগ্রহ হবে কেন? ক্ষণিকাকে বসতে হবে।

বা, ক্ষণু তো বসবেই। কখন বসতে হবে বলো, কবে?

প্রথম একবার বসলেই কি পাওয়া যাবে? তার জন্যে আগে একটু কাঠখড় পোড়ানো চাই।

যথা?

একজন গাইড ধরতে হয়। আমাদের বৈঠকে পরিচিত এমন কেউ। সে আগে খুঁজে বের করবে কোন ঠিকানায় রয়েছে ক্ষণিকার স্বামী। কি নাম বললে?

শমীন্দ্রনাথ--

ওতেই হবে। খুঁজে পেলে তারিখ ও সময় ঠিক করে যাবে কখন তাকে আনতে পারবে পৃথিবীতে। সেই অনুসারে বসলে পাওয়া যাবে শমীন্দ্রকে। নচেৎ নয়।

এমন গাইড হবে কে?

ফ্রেন্ডলি গাইড চাই। সে আমার স্ত্রীকে বলা যাবে'খন। সে আনতে পারবে খুঁজেপেতে। তুমি আগে শমীন্দ্রের বিবরণগুলো আমাকে দিয়ে যাবে। কবে কোথায় জন্ম, কবে কোথায় মৃত্যু, বাপ-ঠাকুরদার নাম কি, বাড়ি কোথায়,

কি কাজ করত, কত বয়স, যতদূর যা সম্ভব। এসব একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে বলে দেব। তিনি খুঁজে দেখবেন। কখনো-কখনো বের করতে দেরি হয় কখনো বা পাওয়াই যায় না, আবার কখনো বা চট করে পেয়ে যায় হাতের কাছে। খুঁজে পেলে তিনি জানাবেন কবে কখন বসতে হবে।

যে সব বিবরণ দরকার আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি।

লিখে দাও। সম্ভব হলে শমীন্দ্রের একটা ফোটোও দিয়ে যেও। লোকটিকে দেখে যেতে পারলে আমার স্ত্রীর পক্ষে সুবিধে হবে।

তারপর দিনক্ষণ ঠিক হলে কি করতে হবে?

হ্যাঁ, আগে থেকেই বলে রাখি, একটি ঠাকুরঘর চাই বাড়িতে। আছে?

তা কোন না আছে?

নিশ্চয়ই নিচের তলার কোণের ঘরটিতে, সিঁড়ির নিচে, তাই না? হাসল সুপ্রিয়। যে তলাতেই থাক সে তলাতেই বসতে হবে।

আবার পুজোর ঘর লাগবে কেন?

বলা মুশকিল। কোথাও একটু শুচিতার পরিবেশ চায় হয়তো।

আর?

সেদিন বলে দেব। বিশেষ হ্যাঙ্গাম নেই। এস কদিন পরে।

কদিন পরে খোঁজ নিতে এল গুরুদাস।

সব ঠিক আছে। শাশ্বতী দেখা পেয়েছে শমীন্দ্রের। আগামী বুধবার রাত নটার সময় আসবে।

আসবে?

তাইতো বলে গিয়েছে। ঘোরাঘুরি করতে হয়নি নাকি, সহজেই পেয়ে গেছে।

সত্যি? পাওয়া গেছে? ক্ষণিকার উৎসাহেরই যেন প্রতিধ্বনি করল গুরুদাস।

বসলেই বোঝা যাবে কতদূর কি হয়।

এখন কি করে বসতে হবে বলো।

কিছু নয়। এটা টেবিল যোগাড় করো। চারপেয়ে টেবিলেই চলবে। যে কোনো সাইজের যে কোনো ওজনের। বেশি বড় ও ভারি টেবিল নিলে বেশি শক্তিশালী রিসিভিং সেট দরকার। ওপারেও চাই বেশি স্পিরিটের জনতা। নইলে নড়বে কি করে? আর, না নড়লে স্থূলজ্ঞানে প্রমাণ হবে

কি করে যে তারা এসেছে? সুতরাং ছোট দেখেই টেবিল নিও। কিছু ধূপকাঠি, গঙ্গাজল, লেখবার কাগজ, পেন্সিল—এই আর কি।

শুধু এই?

হ্যাঁ, দেখো রাষ্ট্র করে যেন বেশি লোক জমায়েৎ কোরো না। কৌতূহলীকে প্রেতাত্মারা ভীষণ অপছন্দ করে, ভালোবাসে বিশ্বাসীদের। কৌতূহলীর ভিড়ে আসতে চায় না, বিশ্বাসীর দলে আরাম পায়। এ ঠিক আমার-তোমার মনোভাব। সেই আড্ডায় আমরা যেতে চাই না যেখানে আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে। সেই আড্ডায়ই আমরা যেতে চাই যেখানে আমরা সুস্বাগত। কোথায় বসবে?

ক্ষণু এখন বাপের বাড়িতে আছে সেইখানে। কিন্তু কে কে বসবে?

ক্ষণিকা আমি তুমি ও আরেকজন।

ওরে বাবা, আমি পারব না।

কেন, ভয় কি। নিজের হাতে দেখই না অনুভব করে ব্যাপার কি।

আচ্ছা, শুনতে পাই সবই নাকি অবচেতন মনের কাণ্ড?

বেশ তো, দেখই না পরীক্ষা করে। কতটুকু অবচেতন মন কতটুকুই বা অলৌকিক। কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকুই বা অবিজ্ঞেয়। তা ছাড়া মনের মত অলৌকিক আর কি আছে, তারই বা একটু হদিস নাও।

আর কিছু নির্দেশ আছে?

হ্যাঁ, তোমার ভাগ্নীকে বলবে সেদিন যেন উপোস করে থাকে। ঠিক নির্জলা নয় একটু লঘু আহার।

তা আর বলতে হবে না।

আর যেন খানিকক্ষণ হরিনাম করে। যতক্ষণ সম্ভব। বা যতক্ষণ ইচ্ছে।

আবার হরিনাম কেন?

এই একটা কিছু অনুরাগের ধ্বনি। ঈথরে একটু অনুকূল কম্পন। ভালো বেহালা বা বাঁশি বা শঙ্খধ্বনি করলেও হতে পারে! কিন্তু বলো তেমন করে ডাকতে পারলে হরিনামের মত প্রিয়নাম আর কি আছে?

বেশ, বলব।

এই শরীরটাকে একটু সুরে বেঁধে নেওয়া আর কি। একটা সূক্ষ্ম সুর ধরবে একটু তৈরি করে নেবে না যন্ত্রটাকে?

বরাদ্দ দিনে সুপ্রিয় গিয়ে দেখল আটদশজনের ভিড়। সবাই বললে,

আমরা বিশ্বাসী. সশ্রদ্ধ. কেউই কৌতূহলী নই।

চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না। কিন্তু সবাই কনিষ্ঠ আত্মীয়, কাকে ছেড়ে কাকে বারণ করবে। বসুক দূরে-দূরে, দেখুক, বুঝুক—

সমস্ত কিছুকে আড়াল করেছে ক্ষণিকা নিজে। এককথায় বলা যেতে পারে. শোকশ্রী। দুঃখ একটা আশ্চর্য শক্তি। আয়ত চোখে নিস্পৃহ স্নেহ, মুখমণ্ডলে অসঙ্কোচ ভক্তি। সমস্ত ভঙ্গিটিতে বিশ্বাসের নম্রতা। একেবারে যে নিরম্বু বিধবার সাজ পরে নি তাতে শান্তি পেল সুপ্রিয়। হাতে সোনার চুড়ি, ধোপ-ভাঙা শাড়ির পাড়টি ঢালা সবুজ। ঠিকই করেছে। মৃত্যু বলে কিছু নেই। এ ঘর আর ও ঘর। এখুনি প্রমাণ পাওয়া যাবে হয়তো।

বেশ বড় ঘর। জানলা-দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। পুড়ছে ধূপকাঠি। চারপেয়ে টেবিল পড়েছে মাঝখানে। চারদিকে চারখানা চেয়ার। কাছে একটা টুলের উপর কাগজ-পেন্সিল। গুরুদাসকে জোর করে রাজি করানো হয়েছে, যদিও সে বলতে চেয়েছিল উপোস-টুপোস ধাতে সয়না আর হরিনামের বানান শিখিনি এ পর্যন্ত।

আর চতুর্থ, ক্ষণিকার ছোট ভাই বিজন।

সুপ্রিয় বললে, আমাদের দুজনের উপোসেই হবে, আমার আর ক্ষণিকার। তোমরা শুধু পাশে বসে একটু হাত রাখো টেবিলে। অর্কেস্ট্রার হালকা বাজনা তোমাদের দিচ্ছি। পাশের ঘরে বা প্যাসেজে যারা বসেছে তাদের উদ্দেশ করে বললে, চুপচাপ থাকুন। আর যদি ভয় পাবার কারণ ঘটে দয়া করে ভয় পাবেন না।

লঘু উপেক্ষায় হাসল একটু সকলে।

গুরুদাস বললে, টেবিলের উপর হাত রেখে শমীনের কথা চিন্তা করতে হবে তো?

মোটেই না। নেমন্তন্নের কার্ড আগেই পাঠানো হয়েছে। তারা তৈরি। এখন গাড়ি পাঠালেই হয়।

গাড়ি?

হ্যাঁ. ধ্বনির গাড়ি, ধ্বনির গাড়ি পৌঁছুলেই রওনা হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, ক্ষণিকাকে লক্ষ্য করল, যদি আসে কাঁদতে পাবে না।

না।

কান্না বলে কিছু নেই। অনন্ত জীবন, অনন্ত যাত্রা।

আর দেরি করে লাভ কি? ব্যস্ত হয়েছে ক্ষণিকা। আলোটা নিভিয়ে দেব?

বড় ভালো লাগল। বুজরুকি কিছু আছে আলো জ্বালা থাকলেও লোকে ভাববে। তবু ঘর অন্ধকার করবে না বলেই ঠিক করেছিল সুপ্রিয়। ক্ষণিকার এই প্রশ্নে সাহস পেল। যেন মমতার গভীর স্পর্শ বেজে উঠল কণ্ঠস্বরে। যেন যারা আসবে তারাই বলল। প্রথমটা বেশি আলো ভালো লাগে না। বহুদিন পরে নতুন পরিচয় একটি ধূসরতাই আশা করে হয়তো।

দাও। তার আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও সকলের গায়ে।

এ আবার কেন? বলে উঠল গুরুদাস।

সংস্কার। বাতাসের সঙ্গে গন্ধ যায় তেমনি আত্মার সঙ্গে সংস্কার।

আলো নিভিয়ে দিল। এপাশে ওপাশে দু-একটা না-জ্বললে-নয় আলো জ্বলছে বাইরে। তবু যারা জমায়েৎ হয়েছিল জলের ছিটেয় কেমন একটু শিউরে উঠল। থমথমে হয়ে উঠল বাড়ির ভিতরটা। বোমা-পড়ো-পড়ো কলকাতার আকাশের মত।

টেবিলের উপর আলগোছে হাত রেখে বোস। যদি মন শূন্য করতে না পারো সমুদ্র ভাবো—

গাড়ি ছাড়ল সুপ্রিয়। অর্থাৎ দরাজ গলায় নামকীর্তন শুরু করল।

সভ্য সমাজে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না রেখে কেউ গলা ছেড়ে নাম করতে পারে এ একেবারে ভাবনার বাইরে। একটা বিলিতি অফিসে সাহেব সেজে কাজ করে তার এ কি দুর্গতি। ভাবতে না ভাবতেই কাজ হল। হাতের নিচে টেবিলটা নড়ে উঠল। শুধু নড়ে উঠল না, খরখর করে হাঁটতে লাগল ঘুরতে লাগল, দুলতে লাগল নৌকোর মত। গুরুদাসের মনে হল পা তুলে তার কোলের উপরেই উঠে আসে বুঝি!

ভূত, ভূত—লাফিয়ে উঠে আলো জেবলে দিল গুরুদাস।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হল টেবিল। কিন্তু আবার গুরুদাস স্থির হয়ে বসে টেবিলে হাত রাখতেই টেবিল ফের নড়া শুরু করলে।

আলো থাক। বললে সুপ্রিয়। আলো বরং ভালোই করবে। বলে আবার হরিনামের ঢেউ তুললে।

তাকাল একবার ক্ষণিকার মুখের দিকে। চোখদুটি বোজা, মুখ যেন পাষাণ। যেন কোন গভীরের প্রতিলিপি!

যেমন ছন্দে নাম করে তেমনি ছন্দে টেবিল নড়ে। টেনে-টেনে বললে

বিলম্বিত, তাড়াতাড়ি বললে দ্রুততাল।

সাবকনসাস মাইণ্ড—চেঁচিয়ে উঠল গুরুদাস।

অমনি হাত তুলে নিল সুপ্রিয়। যে-মন রয়েছে আঙুলের আগায় সে-মনকে সরিয়ে নিল। আর হাত তুলে নিতেই টেবিল হাঁটতে লাগল নিজের থেকে, এঁকে-বেঁকে ঘুরতে-ঘুরতে এগুতে লাগল প্যাসেজের দিকে।

প্যাসেজের লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু কথা রেখেছে, চেয়ার সরানোরই যা শব্দ করেছে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ করেনি। অজ্ঞান হয়ে পড়েনি।

কতদূর গিয়ে থেমে পড়েছে টেবিল। সুপ্রিয় উঠে গিয়ে তাতে আবার হাত রেখে নামের সঞ্চার করে দিল। আবার টেবিল শুরু করল চলতে।

ওদিকে যাচ্ছে কেন?

জিগগেস করো তো ওদিকেই ঠাকুরঘর কিনা।

ঠিক। প্যাসেজের পারেই ঠাকুরঘর। কি আশ্চর্য, কে সেটিকে বন্ধ করে রেখেছে বাইরে থেকে তালা দিয়ে। টেবিল নিজে থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে। একবার দুবার—শিগগির খুলে দাও দরজা।

দরজা খুলে দিল। আবার তাকে ছুঁয়ে দিল সুপ্রিয়। টেবিল ছুটে উঠল গিয়ে সিংহাসনে। বাসনকোসন সব তছনছ করে দিল। প্রণামের ভঙ্গিতে পড়ল নত হয়ে।

দু'বাহুর মধ্যে করে টেবিলকে তুলে নিয়ে এল আগের ঘরে। সুপ্রিয় বললে, ঠাকুর-প্রণাম হয়েছে, এখন শান্ত হও।

ডাক্তার, ডাক্তার--কে কোথায় শান্ত হবে! কে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। জল, জল, পাখা—

আবার আসন ছাড়ল সুপ্রিয়। কাছে গিয়ে বললে, কোনো ভয় নেই। ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি। এ অবস্থায় কি করতে হবে, তা আমাকে শেখানো আছে। কেন যে সব ভিড় করতে আসে! বলে, বিশ্বাসী! বিশ্বাসী কখনো অজ্ঞান হয়? বলে সংজ্ঞাহীনের কানে কি মন্ত্র পড়ল সুপ্রিয়। মুহূর্তমধ্যে লোকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। বললে, না, কিছু না।

আবার এসে বসল চেয়ারে। বললে, আর জ্বালিয়ো না, এবার দুটো মনের কথা খুলে বলো। কাকে দিয়ে লেখাবে? আমি এক, গুরুদাস দুই, বিজন তিন, ক্ষণিকা চার। টেবিলে শব্দ করে জানাও।

ঠক ঠক ঠক ঠক।

পর পর চারবার টেবিলটা নিজের থেকে বেঁকে গিয়ে পায়া ঠুকে শব্দ করলে।

এতটুকু ঘাবড়াল না ক্ষণিকা। কাগজ-পেন্সিল কুড়িয়ে নিল হাত বাড়িয়ে।

নিজের থেকে কিছু লিখো না। কেউ হাত ঘুরিয়ে লেখাতে চাইলেও বাধা দিও না।

তুমি কে? জিগগেস করলে ক্ষণিকা।

ক্ষণিকার হাতে লেখা হল : আমি।

আমি কে?

ক্ষণিকা আবার লিখলে : ও, গলার আওয়াজ তো তুমি শুনতে পাচ্ছ না। আমি—ইংরিজি-বাঙলায় বড় বড় হরফে ক্ষণিকা লিখলে : শমীন্দ্রনাথ—

তুমি যে সত্যি সেই, তা কি করে বুঝব?

নিজের হাতে লিখে যাচ্ছে ক্ষণিকা : আমার ম্যারেজ য়্যাণ্ড মর্যালস বইয়ের ফাঁকে দশ টাকার তিনখানা নোট গোঁজা আছে। দেখ, পাবে।

সে বই তো তোমাদের বাড়িতে। কি করে দেখব?

না। সে বই তুমি তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ পড়বার জন্যে। তোমার বাক্সেই সেটা আছে। দেখ খুলে।

বাক্স খোলা হল। পাওয়া গেল বই। বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে তিরিশ-তিরিশটা টাকা।

আরো অনেক সব প্রমাণ। চশমার খাপে সোনার বোতাম পড়ে আছে দেখ। ফাউণ্টেন পেনের কালির বাক্সের মধ্যে ডাইং-ক্লিনিংএর রসিদ। কার কাছে কটা টাকা পাবে। কোন ব্যাঙ্কে পড়ে আছে কিছু তলানি। অনেক সব অন্তরঙ্গ কথা। কেমন আছে? কোথায় আছে? ওটা কোনো রকম থাকা নাকি? কি করে? কি ভাবে? কেন চলে গেল অকালে?

আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।

টেবিলটা নিজের থেকে লাফিয়ে উঠল দুবার। লেখা বেরুল ক্ষণিকার হাতে : এই দুর্লভ জীবন স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে নষ্ট কোরো না। জীবনে-যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মত বয়ে যাও হু হু করে।

বেশ বলেছ। মুখে বলল ক্ষণিকা। কোথায় আমার শান্তি? আমার আশ্রয়!

স্পষ্ট লিখছে ক্ষণিকা নিজের হাতে : যে মহদাশয় এসেছেন তোমার ঘরে

তাঁকে ধরো, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নাও, নাম নাও, মন্ত্র নাও—সেইখানেই তোমার পরা-গতি, পরা-সিদ্ধি—

পেন্সিলটা থামাল জোর করে। বললে, আমাকে দেখা দিতে পারো?

লেখা হল : পারি।

পারো?

হ্যাঁ, তবে এ বাড়িতে নয়।

কোথায়?

সুপ্রিয়বাবুর বাড়িতে। সেখানে প্রেতাত্মারা আসে। তাঁর স্ত্রী আসেন। পুণ্যস্থান। সেখানে দেখা দেওয়াই সহজ। দিন-ক্ষণ আমি বলে দেব স্বপ্নে—

ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্ষণিকা। বললে, না, না, এখানে এ বাড়িতে দেখা দেবে। আমার নির্জন ঘরে। নয়তো ছাদের উপর। মধ্যরাতে শেষরাতে। স্বপ্নে নয়, স্বপ্নে দেখে শান্তি নেই। বাস্তব চোখে দেখতে চাই, ধরতে চাই—

হঠাৎ লেখা পড়ল : আমরা এবার যাব। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

আর কারু কথা। সুপ্রিয় বললে, শাশ্বতীর।

এবার ছেড়ে দিন। পড়ল শেষ লেখা।

হাত ছেড়ে দিল। পুরো কথাটা শেষ হতে পারল না।

হাত তুলে নিতেই টেবিল আবার ছুটল ঠাকুরঘরের দিকে। ঠাকুর-প্রণাম করে যাবে। এবার ঘর খোলা, লোকজনের মন বিগলিত, সহজেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল ভিতরে। নুয়ে পড়ে প্রণাম করল টেবিল।

গুরুদাস বললে, অপরিমেয় ব্যাপার।

ডিভানে বসে আছে শাশ্বতী।

আমি জানি আজ রাতে তুমি আসবে। দেখা দেবে। স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে কাল। পুজোর ঘর থেকে মাতালের মত বেরিয়ে এল সুপ্রিয়। গভীর ধ্যানের পর দেহে-মনে অপার্থিব মাদকতা আসে, পা টলে। দেয়াল ধরে ধরে এগুতে হয়।

ঘরে মৃদু নীল আলোটি জ্বলছে। চাঁদের আলোও মিশে গেছে নীল হয়ে।

এস, আজ দিনটি তো জানো, তোমাকে পরিয়ে দি সিঁদুর।

আর-আর দিন নড়ে-চড়ে ওঠে। আজ স্থির হয়ে বসে রইল। ছোঁয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়, আজ যেন ছায়ারই প্রাণ নেই।

রূপোর কৌটো খুলে আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল কপালে।

এ কি, স্পষ্ট ছোঁয়া যায় যে। কঠিন মাংসল কপাল। স্পষ্ট চুল, স্পষ্ট সিঁথি।

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঝাঁজালো আলোটা জ্বালাল সুপ্রিয়।

চেঁচিয়ে উঠল নারীমূর্তি : এ কি, স্বপ্ন তো আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো শাশ্বতী নই, আমি ক্ষণিকা।

কেন এ রকম হল কে জানে। আচ্ছন্নের মত বলল সুপ্রিয়, তবে, চিরকালই, আজ যা ক্ষণিকা, কাল তা শাশ্বতী।